সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা

বাংলা বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিল্পী খানম

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
বাংলাদেশ

নভেম্বর ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণালব্ধ রচনা। আমার জানামতে এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেন নি। বাংলা বিভাগের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান / সাময়িকীতে ডিগ্রি / প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয় নি।

শিল্পী খানম
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং: ৭৫/২০০৮-২০০৯
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, শিল্পী খানম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য আমার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছেন। অভিসন্দর্ভটি মৌলিক উপকরণ থেকে রচিত এবং তাঁর একক গবেষণার ফল, অন্য কেউ এর কোনো প্রকার অংশীদার নয়। আমার জানামতে গবেষক এই গবেষণাকর্ম পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেন নি।

আহমদ কবির
গবেষক তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমি যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আহমদ কবির। তাঁর গঠনমূলক পরামর্শ এবং নিবিড় তত্ত্বাবধানে আমি আমার অপরিপক্ব ও অবিন্যস্ত ভাবনাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার উপযোগী করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর সস্নেহ আন্তরিক তাগিদ আর নিরন্তর প্রেরণা আমার গবেষণার দুরূহ পথকে সহজ করে দিয়েছে। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সীমাহীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ আমাকে গবেষণা করার সুযোগ করে বাধিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকদের কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের সুপরামর্শের জন্য। বিশেষভাবে গবেষণাকর্মের জন্য আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীম আমাকে নানা তথ্য, উপাত্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অশেষ। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক খাইরুজ্জাহান মিতু এবং সেলিম আল দীনের সহধর্মিনী অধ্যাপিকা বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা সেলিম আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্ন সময়ে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার বর্তমান কর্মস্থল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকর্মীদের গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া আমার প্রাক্তন কর্মস্থল ঢাকা সিটি কলেজের সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অভিসন্দর্ভ রচনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মের এই শ্রমসাধ্য কাজটি সহজ হয়েছে আমার সহধর্মী কাজী শফিকের অনুপ্রেরণায়। তাঁর ঋণও শোধ করার নয়। সবচেয়ে বঞ্চিত হয়েছে আমার যমজ পুত্রদ্বয় কাজী আরমান ও কাজী সালমান। বারবার কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন আমার বাবা-মা, অনেক আত্মীয় স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের প্রতিও রইলো আমার কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে আমি নাট্যকার অধ্যাপক সেলিম আল দীনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করছি।

শিল্পী খানম

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) একটি বিশিষ্ট নাম। এই বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, সামাজিক জীবন ও আবহমান সংস্কৃতি-চেতনাকে অঙ্গীকৃত করে আশির দশকের বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন সেলিম আল দীন। ১৯৭২ সালে থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নিরলস ও নিয়মিতভাবে তিনি নাটক লিখে গেছেন। সেলিম আল দীন শুধু নাটক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, নাট্যবিষয়ক বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা, নাট্যবিষয়ক কোষগ্রন্থ প্রণয়ন ও সম্পাদনা, নাট্যনির্দেশনা প্রভৃতি গবেষণামূলক কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর নাট্যকর্ম নিয়ে এখন পর্যন্ত সামগ্রিক কোনো গবেষণা সম্পন্ন হয় নি। সেই কারণে সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিরীক্ষা শীর্ষক গবেষণার অবতারণা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে অনেক প্রতিভাধর নাট্যকারদের আগমন ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সেলিম আল দীন। তিনি তাঁর লেখায় গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলার লোকজ সংস্কৃতির নানা বৈচিত্র্যের বর্ণিল আলোকচ্ছটায় সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর নাট্যজগৎ। এর পাশাপাশি নাগরিক সমাজের মধ্যবিত্তের জীবনও তাঁর লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। তিনি কিভাবে জীবনকে দেখেছেন এবং রূপায়ণ করেছেন সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়। এখানে প্রাথমিক উৎস হিসেবে তাঁর রচিত নাটককে ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে অন্য লেখকদের লেখা, সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক লেখা এবং সেলিম আল দীনকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয় ও শৈলী নির্মাণ বিষয়টি গবেষণাকর্মে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সেলিম আল দীনের নাট্যকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্য নাট্যকারদের নাটকও তুলনামূলক আলোচনায় এসেছে।

সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক তুলে ধরতে অর্থাৎ আলোচনাকে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনে প্রথম অধ্যায়ে সেলিম আল দীনের সাহিত্যজীবন ও নাটক রচনার পটভূমি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রস্তুতি পর্যায়ের (১৯৭২-১৯৭৯) নাটকের বিষয়বিচার, তৃতীয় অধ্যায়ে বিকাশ পর্যায়ের (১৯৮০-১৯৯৪) নাটকের বিষয়বিচার, চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠা পর্যায়ের (১৯৯৫-২০০৭) নাটকের বিষয়বিচার, পঞ্চম অধ্যায়ে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রীতিবিচার ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে শেষ কথা অংশে সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছেছি। পরিশিষ্ট অংশে সেলিম আল দীনের নাটকের তালিকা ও মঞ্চায়নের তথ্য এবং সবশেষে গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবেশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
সেলিম আল দীনের সাহিত্যজীবন ও নাটক রচনার পটভূমি 1

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রস্তুতি পর্যায়ের (১৯৭২-১৯৭৯) নাটকের বিষয়বিচার 22

তৃতীয় অধ্যায়
বিকাশ পর্যায়ের (১৯৮০-১৯৯৪) নাটকের বিষয়বিচার 58

চতুর্থ অধ্যায়
প্রতিষ্ঠা পর্যায়ের (১৯৯৫-২০০৭) নাটকের বিষয়বিচার 128

পঞ্চম অধ্যায়
আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রীতিবিচার 154

ষষ্ঠ অধ্যায়
শেষ কথা 205

পরিশিষ্ট 223
গ্রন্থপঞ্জি 226

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সেলিম আল দীনের সাহিত্যজীবন ও নাটক রচনার পটভূমি

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ভুবনে অন্যতম সৃষ্টিশীল নাট্যকার সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)। তিনি তিন দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী নাট্যচর্চা করেছেন; নাটকের আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'গ্রাম থিয়েটার' সংগঠনের মাধ্যমে নাটককে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাজাত্যবোধের তীব্রবাসনা তাঁর নাট্য-ভাবনায় জারিত হয়েছে স্বমহিমায়। তাঁর নাটকের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্বদেশ ও সমকাল। নাটকের বিষয়বৈচিত্র্যে তিনি যেমন মেধা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি আঙ্গিক নিয়েও রয়েছে তাঁর নিজস্ব ভাবনা। উনিশ শতক থেকে পাশ্চাত্য নাটকের আদলে যে বাংলা নাটক নির্মিত হয়েছে, সেই ইউরোপীয় নাটকের কলাকৌশল থেকে তিনি তাঁর রচিত নাটককে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যকর্মের আঙ্গিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বীয় ঐতিহ্যের শস্যভূমিতে নিরন্তর গবেষণায় সেলিম আল দীন একের পর এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির নাটক লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্ত-সংস্কৃতি চর্চার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমাদের মঞ্চ নাটকেও দেখা দেয় বিপুল সম্ভাবনা। সেলিম আল দীন 'ঢাকা থিয়েটার'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি লিখেছেন মঞ্চসফল অনেক জনপ্রিয় নাটক। নাটক নিয়ে তাঁর গবেষণা করার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল মূলত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রান্তরে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৮৬ সালে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর তার প্রধান অভিভাবক হিসেবে নাটক নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি নাটক পরিচালনা করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়ে একধারে তিনি নাট্যকলার শিক্ষক, নাট্যনির্দেশক, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও গীতিকার। প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যের অন্বেষণ ও সংরক্ষণ করে বাংলা নাট্যরীতিকে সৃষ্টিশীল পন্থায় তিনি আধুনিক মঞ্চের উপযোগী করে তোলেন। বাংলা নাটকে তিনি নবতর অথচ ভূমিজ বা দেশীয় আঙ্গিক চেতনায় নিয়ে আসেন। এছাড়া চরিত্রকে ঘটনার সঙ্গে একীভূত করণের বা চরিত্রের নির্বিশেষ করণের বাড়তি প্রয়াসও তাঁর নাট্যচিন্তার অভিনবত্ব। 'সেলিম আল দীন আধুনিক বাংলা নাট্যকার। নাট্যতত্ত্ব-দর্শন, রীতির অভিনবত্বে তিনি আধুনিক। আধুনিক সৃজিত নাটকের চিত্রময়, দৃশ্যময় এবং চরিত্রের ভূমিজ অস্তিত্বের বলিষ্ঠ উদ্ভাসনের জন্য।'[১]

সেলিম আল দীনের জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৮ আগস্ট ফেনী জেলার অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী সোনাগাজী উপজেলার সেনেরখিল গ্রামে। তাঁর পিতামহ হাজী আফতাব উদ্দিন ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। পিতা মরহুম মফিজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব কাস্টমস্ এবং মাতা মরহুমা ফিরোজা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। তাঁদের সাত সন্তানের মধ্যে সেলিম আল দীন তৃতীয়। ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল মঈনউদ্দিন আহমেদ। তবে সেই নামটি ছাপিয়ে নাটকের অঙ্গনে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন নাট্যকার সেলিম আল দীন নামে। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৩ আগস্ট করটিয়া সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোকসেদ আলী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা বেগমজাদী মেহেরুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল এ্যান্ড কলেজের বাংলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান মঈনুল হাসান অকালপ্রয়াত হওয়ার পর থেকে এই দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর সৃষ্টি তাঁর কাছে সন্তান তুল্য ছিল নিঃসন্দেহে।

সেলিম আল দীনের লেখাপড়ার শুভসূচনা হয় ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারায় হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমেদের (রহঃ) কাছে। অতঃপর তিনি কুমিল্লা জেলার আখাউড়ায় গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষাজীবন শুরু করেন। এর কিছুদিন পর তিনি নিজ গ্রাম সেনেরখিল প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তাঁর বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন বিধায় তাঁর বদলির সুবাদে তাদের পরিবারকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। এরপর সেলিম আল দীন কুড়িগ্রামের উলিপুর মহারানী স্বর্ণময়ী প্রাইমারি ও পরে হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন স্কুল ব্যতিরেকে রংপুর, লালমনিরহাটে অবস্থান এবং অবশেষে নিজ গ্রাম সেনেরখিলে ফিরে আসেন। তিনি মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি. পাস করেন। এরপর ফেনী কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি. পাস করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর রাজনৈতিক কারণে তিনি টাঙ্গাইলের করটিয়া সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন তৎকালীন সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ. দলের দুর্দান্ত প্রতাপ। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার সাধ্য ছিল না কারো। তাদেরই কোপানলে পড়ে তাঁকে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় এখানে। প্রথমে ভর্তি হতে গিয়েছিলেন আনন্দমোহন কলেজে কিন্তু সাবসিডিয়ারি বিষয় এক না হওয়াতে শেষাবধি সা'দত কলেজে ভর্তি হন। সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর

পরীক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে আবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। অবশেষে তিনি ১৯৯৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ga¨h‡Mi ev0jv bvU¨ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

সেলিম আল দীনের নাট্যচর্চা ও কর্মজীবন পরস্পর পরিপূরক। তিনি চাকুরি জীবন শুরু করেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদারের বিজ্ঞাপনী সংস্থা বিটপীতে। এই সংস্থায় প্রথম কপিরাইটার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া থিয়েটার পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করার পর ১৯৮৬ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন এবং উক্ত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেলিম আল দীন 'ঢাকা থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি এদেশের মঞ্চ নাটকের জগতে তাঁর রয়েছে সৃষ্টিশীল অবদান। ১৯৮১-৮২ সালে তিনি এবং মুক্তিযোদ্ধা ও নাট্যনির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ দেশব্যাপী গড়ে তোলেন 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার'। তিনি উক্ত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু তিনি এই নাট্য সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।

সেলিম আল দীন তাঁর পিতার উৎসাহ উদ্দীপনায় সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন কৈশোরে। কিশোর বয়সে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ছোট ছোট দু একটি নাটক, ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায়। কৈশোর থেকে তাঁর লেখা শুরু হলেও ১৯৬৮ সালে ^'wbK cwK¯Ívb পত্রিকায় কবি আহসান হাবীব সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকীতে আমেরিকার কালো মানুষদের নিয়ে তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'নিগ্রো সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম রেডিও নাটক wecixZ Zgmvq ১৯৬৯ সালে এবং প্রথম টেলিভিশন নাটক আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় wjweqvg (পরবর্তীতে নাম Ng †bB) প্রচারিত হয় ১৯৭০ সালে। আমিরুল হক চৌধুরী নির্দেশিত এবং 'বহুবচন' কর্তৃক প্রযোজিত তাঁর প্রথম মঞ্চ নাটক mc welqK Mí এর মঞ্চায়ন হয় ১৯৭২ সালে। এভাবেই তাঁর মঞ্চ নাটকের যাত্রা শুরু হয়। এরপর তিনি ইতালি, ফ্রান্স, আমেরিকা ও স্প্যানিশ সাহিত্য থেকে গল্প, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক বহু প্রবন্ধের অনুবাদ করেন এবং সে সব প্রবন্ধ সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে একের পর এক নতুন নতুন বিষয় ও আঙ্গিকে তাঁর নাটক উচ্চারিত হয়ে আসছে বাংলা মঞ্চে ও টেলিভিশনে। নাটক রচনায় তাঁর অনুপ্রেরণা বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন:

> আমি শুরুতে কবিতা লেখায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম। পরে কবি আহসান হাবীবের পরামর্শে গদ্যে ফিরে আসি এবং রফিক আজাদ আমাকে শুধুমাত্র নাট্য রচনায় মনোনিবেশ করার উপদেশ দেন। আমার নাটক লেখার শুরুটা রেডিও এবং টেলিভিশনে এবং পরে মঞ্চ নাটকের সমস্ত সফলতার সমান অংশীদার নাসির উদ্দিন ইউসুফ। বস্তুত তার সঙ্গে আমার শিল্প সম্মিলন না ঘটলে আমি হয়তো উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করতাম। এই মানুষটির স্থিরতা, প্রজ্ঞা, গভীর শিল্পবোধ আমাকে এই এত দূর পথ টেনে এনেছে।[২]

সেলিম আল দীনের নাটক রচনার পটভূমি আলোচনার পূর্বে বাংলা নাট্য রচনার পরম্পরাটি অনুধাবন করলে অবশ্য আমরা বুঝতে পারি নাটকের উদ্ভব বা বিকাশের প্রথম যুগে সামাজিক বিষয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা প্রতিবাদী চেতনা নিয়ে খুব বেশি নাটক লেখা হয়নি। উনিশ শতকে আধুনিক নাটকের যাত্রা শুরু হয় সামাজিক নানা অসঙ্গতি, স্থূল কৌতুকরসের আধিক্যে ভরা ব্যঙ্গ প্রহসনমূলক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর Kjxb Kjme¯ (১৮৫৪) নাটকটি সমকালে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এরপরই মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) রচনা করেন প্রহসন e‡ov mvwj‡Ki Nv‡o †iv এবং সমকালের বাঙালি বাবুদের বিদ্রুপ করে লেখেন আরেক প্রহসন G‡KB wK e‡j mf¨Zv?। বাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) এর bxj-'cY (১৮৬০)। প্রকৃতপক্ষে, দীনবন্ধু মিত্রের bxj-'cY বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম শোষিত বঞ্চিত মানুষের নাটক। এ নাটকটি উনিশ শতকের গ্রামীণ অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক জীবনের এক প্রত্যক্ষ দলিল। এছাড়া তৎকালীন সমাজকে আক্রমণ করে লেখা maevi GKv'kx (১৮৬৬) ও বহুবিবাহকে ব্যঙ্গ করে লেখা we‡q cvMjv e‡ov (১৮৬৬) প্রহসন দুটিও সমকালের যুগ-যন্ত্রণার দর্পণ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২), ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯৩৭), শচীন সেনগুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ও শিশির ভাদুরীর হাত ধরে নানা রকমের নাটকের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় হয়। তাঁদের হাতে রচিত হয়েছে মূলত ধর্মীয়, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। এঁদের পর বাংলা নাট্যসাহিত্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর নাটকেই আমরা বিশেষ নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাজজীবনের অত্যাবশ্যকীয় রাজনীতি এবং মানুষের জীবনাচরণের অন্যতম উপাদান প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চেতনা উপলব্ধি করি। ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি-বৈষম্য ও শ্রেণি-শোষণের চিত্রসহ সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের কথা, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা এবং আগল ভাঙার মধ্য দিয়ে গণমানুষের প্রতিবাদী চেতনা তাঁর নাটকেই প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর

wemRb, ivRv I ivbx, i³Kiex, Kv‡ji hvÎv, g³aviv, Zv‡mi †'k, APjvqZb প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। তিনি প্রচলিত নাট্যধারা উপেক্ষা করে যে নাটক রচনা করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয় ও প্রকরণ নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম আধুনিক নাট্যকার। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, তাঁর বহুবিচিত্র নাট্যভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দিলে বিষয়ভাবনা, গঠনশৈলী ও প্রয়োগ কৌশলে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা নাটক উনিশ শতকীয়, প্রথাশ্রয়ী ও সনাতনপন্থী ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

ঔপনিবেশিক আমলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বীভৎসতা, শাসকগোষ্ঠীর খাদ্য সংগ্রহের নীতি, মজুতদারি ও কালো বাজারিদের সীমাহীন অর্থতৃষ্ণা, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদির প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ ১৯৪৩ সালে দেশব্যাপী মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। তৎকালে এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতি সমাজে-রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়েছে, যার বাস্তব ধাক্কা লেগে পুরাতন নাট্যচর্চার আদর্শ ভেঙে চুরমার হল। বাস্তবের তাড়নায় বাংলা নাটকে এল দুর্ভিক্ষে কংকালসার মানুষ থেকে শুরু করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ শ্রমজীবী নারী-পুরুষ। রোমান্টিক বা পারিবারিক নাটকের শৌখিনতা থেকে বাংলা নাটক সরে এল মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ও কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের কাতারে। নাটকের কেন্দ্রে এল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ও বঞ্চনার কথা। এসময় ১৯৪৩ সালে ভারতীয় 'গণনাট্য সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শুধু একটি নাট্যগোষ্ঠী ছিল না, ছিল একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনও। 'গণনাট্য সঙ্ঘে'-এর নাট্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলা নাটকের নতুন ধারাটির সূত্রপাত হয় পশ্চিম বাংলায়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে 'গণনাট্য সঙ্ঘ' এলো সাধারণ মানুষের মধ্যে নাটকের ভাব-ভাষা পৌঁছে দিতে। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্য bevb নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তখন 'গণনাট্য সঙ্ঘে'-এর প্রযোজনায় bevb অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অভিনীত হয়। বাংলা নাটকের আধুনিক ধারাটির সূত্রপাত হয় পূর্ববঙ্গে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি নূরুল মোমেনের †b‡gwmm (১৯৪৮) একাঙ্কিকা নাটকটির মাধ্যমে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বীভৎসতা, অমানবিকতা, দুর্বৃত্ত শোষক, চোরাকারবারি, মজুতদার ও মুনাফাখোর কর্তৃক সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মহামারিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে †b‡gwmm নাটকের অবয়ব।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয় এবং একই সঙ্গে দুইশত বছরের উপনিবেশ থেকে এদেশের মানুষ মুক্তি পেল। ব্রিটিশদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ

পাকিস্তান রাষ্ট্রে আবার নব্য উপনিবেশের শিকার হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের জনসাধারণ যে সুখ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল, শীঘ্রই তাদের সে মোহমুক্তি ঘটে। 'ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় লালিত পশ্চিমা সামরিক-বেসামরিক আমলা শ্রেণীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের এ অঞ্চলবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নানাভাবে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে।'[৩] পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে প্রথম থেকেই বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলাকে তারা অবজ্ঞা করে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে এদেশের ছাত্র-জনতা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করে প্রাণ দেন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিক প্রমুখ নাম না জানা আরও অনেকে। ১৯৫৩ সালে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) ভাষা-আন্দোলনকে নিয়ে জেলে বসে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক Kei। মঞ্চায়নের সীমাবদ্ধতা থেকে যে আঙ্গিকের সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত Kei নাটক। মুনীর চৌধুরী এদেশে আধুনিক নাটকের জনক। আধুনিকতার ধ্যান ধারণা তাঁর বিভিন্ন নাটকে যেমন পরিস্ফুটিত, তেমনি আধুনিক বিশ্ব নাটকের সাথে পরিচয়ও আমাদের ঘটেছে তাঁর মাধ্যমে। ৪৭-এর দেশবিভাগের পর নব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের নয়া ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ এবং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয়। এ সময় পূর্ব-পাকিস্তানে এক ভিন্ন মাত্রার নাটকের ধারা তৈরিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁরা হলেন নূরুল মোমেন, (১৯০৮-৯০), শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১), আসকার ইবনে শাইখ (জ. ১৯২৫), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯১), আলী মনসুর (জ. ১৯২৫), জিয়া হায়দার (১৯৩৬-২০০৮), কল্যাণ মিত্র (জ. ১৯৩৯) প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট মানবতাবাদী নাট্যকার। যে কোন উপনিবেশবাদী সরকারের শাসনামলে কোনো শিল্পকর্মই তার সহজাত গতি প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে পারে না। নাটক তো নয়ই। জীবনের দৃশ্যমান রূপায়ণই নাটক। সে কারণেই একেক যুগে নাটকের একেক রূপ, কেননা জীবনতো অতীত থেকে আজ অবধি ক্রমাগত প্রবহমান। নানা রকম চড়াই-উৎরাই, ঘাত-প্রতিঘাত, নানা রকম বিপর্যয় আর সংঘাতের ভেতর দিয়ে জীবনের ধারা তার স্বরূপ বদলে এগিয়ে যায়। জীবন যত এগিয়েছে, তার রূপায়ণে নাটকও বদলে গেছে। রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া এবং অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলাদেশে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, মুনীর চৌধুরী তারই প্রতিনিধি। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে তৎকালীন সরকারের কঠোর চোখ রাঙানি সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ এবং চট্টগ্রামে কয়েকটি

নাট্যগোষ্ঠী নাট্য-আন্দোলনের নিজস্ব বক্তব্য ও চেতনাসমৃদ্ধ কিছু নাটক মঞ্চায়ন করেছে। এমনি পরিস্থিতিতে একদল নাট্যমনস্ক ছাত্র নাট্যচর্চার মাধ্যমে দেশে একটি সুষ্ঠু নাট্য-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বার্ষিক নাট্যাভিনয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) উদ্যোগে মঞ্চস্থ হলো বেশকিছু নাটক। তাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ের হলেও এমন কিছু দেখাতে চাইলেন যা ছিল একেবারেই নতুন। এটা ছিল দিগন্ত উন্মোচনের একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা। নাট্যকর্মের নব প্রয়াসের প্রতি নাট্যমনস্ক ব্যক্তিদের বিপুল সাড়া এবং এই আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্মলাভ করে 'ড্রামা সার্কল'। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সাল অবধি 'ড্রামা সার্কল' যে সব নাটক মঞ্চায়ন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Kei, gvbwPÎ (১৯৬৩), i³Kiex, ewncxi (১৯৬০), ivRv I ivbx, Zv‡mi †'k, অনুবাদ নাটক- BwWcvm, বার্নাডশর BD †bfvi K¨vb ‡Uj- এর বাংলা রূপান্তর মুনীর চৌধুরীর †KD wKQ ej‡Z cv‡i bv। সে সময়ে সাধারণত যে ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হতো তা থেকে এসব নাটক বক্তব্যে ও আঙ্গিকে আলাদা ধরনের। তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে আধুনিক ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত গোষ্ঠীবদ্ধ নাট্যচর্চার একটি যথার্থ ধারা শুধু সেই ড্রামা সার্কলের কার্যক্রমে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৩ সালের পর এর কর্মীরা জীবন ও জীবিকার আয়োজনে বিচ্ছিন্ন ও দলছুট হয়ে পড়লেন। সমকালে পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালি জাতিকে, তার মূল্যবোধকে, তার সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তারপরও স্বাধীনতা পূর্ব নাটকে মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-৭১) অবদান অপরিসীম। 'স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে যে আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির স্ফুরণ ঘটেছে তা একান্তভাবেই বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নাট্যচর্চার অনিবার্য ফলশ্রুতি।'[৪]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে এই ভূখণ্ডে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, কিন্তু নিয়মিত নাট্যচর্চার কোনো ধারা সৃষ্টি হয় নি। টিকেট বিক্রি করে নাটক অভিনীত হয়েছে শতবর্ষেরও আগে, পেশাদার থিয়েটারও চালু হয়েছিল। তবে রাজনৈতিক-সামাজিক পট পরিবর্তনে তার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব থিয়েটার গোষ্ঠীর নাট্যগুরু হিসেবে আবির্ভূত হলেন মুনীর চৌধুরী। তাঁর রচিত Kei রাজনৈতিক সচেতনায় উদ্দীপ্ত এই নাটকটি জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। Kei একটি দৃষ্টি উন্মোচনকারী ও পালাবদলকারী নাটক। তবে সে সময়ে Kei নাটকের মতো আরও

দু একটি দুঃসাহসিক, অচলায়তনভেদকারী নাটক রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র Zi½f½ (১৯৬২) ও DRv‡b gZ¨ (১৯৬৩), এম.এ আজমের GB kZvãx I Zvici, আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) এর gi‡°vi hv‘Ki (১৯৫৯) প্রভৃতি নাটক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এক্ষেত্রে শক্তিধর নাট্যকার। গ্রামীণ জীবনের ধর্মীয় অনুশাসন, বিশ্বাস, কুসংস্কার, আধ্যাত্মিকতার নামে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে মুক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকে। তাঁদের উত্তরসূরি সেলিম আল দীন। তিনি অবশ্য নাটকের আঙ্গিক নিয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। বাংলাদেশে নিয়মিত শিল্প মাধ্যম হিসেবে নাটককে প্রতিষ্ঠিত করবার যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় স্বাধীনতার পরই। আর এ সময় নাট্যকারগণ ব্যাপকভাবে নাট্যকর্মে মনোনিবেশ করেন এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অধ্যুষিত বাংলার অনগ্রসর সমাজের মানুষ হলেও সেলিম আল দীন সমসাময়িক অন্যান্য শিল্পী সাহিত্যিক কবি গীতিকার-নাট্যকারদের মতোই অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রতিটি বাঁকের প্রতি তীক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। সেই সঙ্গে তিনি দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগ্রাম মুখর পরিবেশ এবং বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের প্রত্যক্ষদর্শী।[৫]

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান হয়। এরপর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালির বিজয় হয় এবং তারপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ফিরে পেল তার আপনসত্তা, তার স্বাধীনতা। এদেশে রচিত হলো War Literature, War Theatre, War Art তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল সুদৃঢ়ভাবে। স্বাধীনতার পরে মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অবদান। স্বাধীনতার পর ঢাকায় নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন হতে শুরু করে। ‘অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি’– এই মন্ত্রে উজ্জীবিত তরুণ সমাজ মঞ্চকে স্বাধীন সত্তার মুক্ত অভিব্যক্তিতে পরিণত করেন। স্বাধীনতা এদেশের মানুষকে দিয়েছে বৃহত্তর শিল্পবোধ ও জীবনবোধ, যে বোধের বাস্তবায়ন মঞ্চে দেখা যায়। নাটক সমাজ ও জীবনঘনিষ্ঠ এক যৌথ শিল্পকর্ম। এছাড়া নাটক দ্বিজ শিল্পকর্ম। রচনায় যার শুরু, অভিনয়ে যার সম্পূর্ণতা। মঞ্চ প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে নাট্যকার পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবীর সর্বত্রই মঞ্চের অঙ্গন থেকেই বেরিয়ে এসেছে সব সফল নাট্যকার। স্বাধীনতার পর নাট্যচর্চায় যারা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মমতাজ উদদীন আহমদ (জ. ১৯৩৫), আবদুল্লাহ আল-মামুন

(১৯৪২-২০০৮), সেলিম আল দীন, রশীদ হায়দার (জ. ১৯৪১), আল মনসুর, হাবিবুল হাসান, মামুনুর রশীদ (জ. ১৯৪৮), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬), কাজী জাকির হাসান প্রমুখ নাট্যকার। নাটকের আঙিনায় দেশের বৃহত্তর জীবনধারাকে মুক্তি দেবার মানসে দেখা দিল নাট্য-আন্দোলন। নাটক শুধু মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নয়, সাহিত্য হিসেবেও পাঠের জন্য। দর্শক যেমন নাটকের অভিনয় উপভোগ করেন, তেমনি পাঠক সেই একই নাটক পাঠ করে আনন্দ পান। নাটকের তাই দুটি ভূমিকা আছে। একটি মঞ্চের যূথবদ্ধ দর্শকের সামনে, আরেকটি পাঠকক্ষে নির্জন মুহূর্তের উপভোগ। মঞ্চের অভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেলেও তাই নাটকের ভূমিকা সমাপ্ত হয় না। একজন নাট্যকারের সময়ে এবং পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ সাহিত্যানুরাগীরা তাই তাঁর নাটক পড়ে আনন্দ পান। সেলিম আল দীন নাটককে সাহিত্য হিসেবে নিয়েছেন। বলা যায়, শেষ পর্যায়ের নাটকে বিবেচনা করেন নি মঞ্চায়নের বিষয়গুলো। তিনি চেষ্টা চালিয়েছেন নাটকের বক্তব্য যেন দেশের সাধারণ মানুষের চিরপরিচিত হয়, আর তাদেরকে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থবহ ফলপ্রসূ নতুন জীবনের জন্য প্রেরণা যোগাতে পারে।

১৯৭১ সালে রক্তাক্ত ও অগ্নিগর্ভ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই স্বাধীন দেশের প্রথম ডাকসু (১৯৭২-৭৩) তখন সর্ব বিষয়ে একটি গঠনশীল প্রত্যয় নিয়ে দেশ গড়ায় অগ্রসর হয়। রাষ্ট্রীয় দর্শন আর ছাত্রদের প্রত্যয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এসেছে নবজীবনের গান। এ প্রত্যয় বুকে করে স্বাধীনতা উত্তরকালীন প্রথম 'ডাকসু' সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হলো। 'ডাকসু'র সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াবিষয়ক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো 'ডাকসু সাহিত্য চক্র', 'ডাকসু নাট্যচক্র', 'ডাকসু ক্রীড়াচক্র', ইত্যাদি। 'ডাকসু' ১৯৭২ সালে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া 'পঁচিশ বছরের বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৯)। সেমিনারে কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক পৃথক মূল প্রবন্ধ পাঠ ও তার ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধগুলোতে উপস্থাপিত হয় পঁচিশ বছরের অর্জন, তার সংকট, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ রচনার বিষয় ও আঙ্গিক। উৎকর্ষের দিগদর্শনও তুলে ধরেন প্রবন্ধকার ও আলোচকবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে। এই সেমিনারে নাটকবিষয়ক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। তার একটি উপস্থাপন করেন সেলিম আল দীন, অপরটি উপস্থাপন করেন শাহনূর

খান। এ অনুষ্ঠানের প্রবন্ধকার, আলোচক এবং সভাপতি সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রধান অতিথির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যিক সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত। নাটক বিষয়ক মূল প্রবন্ধটিতে সেলিম আল দীন তখন তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই নিজস্ব ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৭ সালে তিনি চেখভের গল্পের নাট্যরূপ দেন। পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য 'ডাকসু' নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। নিয়মিত সাহিত্যবাসর করে ছাত্রদের রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ ও তার আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে 'ডাকসু নাট্যচক্র' নতুন ধারার নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়। শুরু হয় একটি নতুন নাট্য-আন্দোলন। সে সময়ে অনেক শিক্ষার্থী নাট্যচক্রে যোগ দেন। তাদের লক্ষ্য ছিল বিষয় ও শৈলীর দিক থেকে গতানুগতিকতা পরিহার করে নাটক রচনা করা এবং তা মঞ্চায়নে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারায় সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী রচনা করেন A¯i m¯wZ নামের একটি নাটক। এটি 'ডাকসু নাট্যচক্রে' মঞ্চস্থ হয়। এ কর্মধারার সঙ্গে নাট্যকার রূপে নিজেকে যুক্ত করেন সেলিম আল দীন। তাঁর রচিত G·‡cøwmf I gj mgm¨v নাটকটি এ সময় 'ডাকসু নাট্যচক্র' কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। এভাবে কিছু নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর একটি আন্তঃহল নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি তখন গ্রহণ করা হয়। সেই প্রতিযোগিতার নিয়মাবলির মধ্যে ছিল—নাটকটি হলের কোনো ছাত্র নাট্যকারের রচনা হতে হবে, সময়সীমা হবে পঁয়ত্রিশ মিনিট এবং নাটকটির নির্দেশনাও দেবেন হলের কোনো ছাত্র। এ প্রতিযোগিতায় নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর নির্দেশনায় সেলিম আল দীনের লেখা RwÛm I wewea †ejb নাটকটি পরিবেশিত হয়। নাটকটি মুহসিন হলের পক্ষ থেকে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে। ১৯৭৩ সালে নাট্যচক্র টি.এস.সি. মঞ্চে উপস্থাপন করেন Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gL †'Lv নামে সেলিম আল দীনের একটি সমাজসচেতন নাটক। ১৯৭৩ সালে তাঁর রচিত msev' KvUb নাটকটি ডি.ডি.এস. মঞ্চে অভিনীত হয়ে ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। এভাবে সেলিম আল দীনের নাটকের জগতে পদার্পণ হয়। 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে যে আন্দোলন বাংলাদেশে নাট্যচর্চায় নতুন গতি সঞ্চারিত করে, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যচর্চায় নিমগ্ন এসব তরুণদের মেধা ও শ্রমের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা নাটক নানা পদে পদে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বাংলার নাটককে আঘাত করেছে। মঞ্চের অভাবে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলার নাটক দিশেহারা হয়ে

ঘুরেছে দীর্ঘকাল। আশ্রয়হীন ও উৎসাহহীন বাংলার নাট্যচেতনা একটি সর্বদিক ব্যাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের সন্ধান করেছিল অনেক কাল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

> ১৮৭৬ সালে জারিকৃত ব্রিটিশ সরকারের 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' শীর্ষক কালাকানুন যথেচ্ছ ব্যবহার করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি নাটক রচনা ও নাট্যচর্চার পথে একটা প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছিলো। নাটকের সঙ্গে মঞ্চের যেহেতু রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, তাই এ বাধাটা সহজে অতিক্রম করা যায় নি। কেননা, ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো নাটক মঞ্চায়নের অনুমতি দিতো না। স্বাধীনতা উত্তরকালে এক্ষেত্রে এলো যুগান্তকারী পরিবর্তন। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সরকার শতাব্দী প্রাচীন অভিনয় আইন সংশোধন করে নতুন আদেশ জারি করেন ১৯৭৫ সালের জুন মাসে, খুলে গেল দীর্ঘদিনের বদ্ধ অর্গল।[৬]

স্বাধীনতার পর নাটক তার শক্তি ও স্বরূপকে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলার নাটক দশদিক বিস্তার করে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ছেড়েছে। এমন অবাধ সুযোগ, অকাতর পৃষ্ঠপোষকতা এবং উদার প্রশাসনিক সহিষ্ণুতা বাংলার নাটক আগে কখনো পায় নি। এ সময়ে রচিত হয়েছে বহু রকমের নাটক। বিভিন্ন নাটকের সমারোহে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চ জমজমাট হয়ে ওঠে। মঞ্চস্থ হয় অনেক নাট্যকর্ম। রেডিও, টেলিভিশনেও প্রচারিত হয়েছে বহু নাটক। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে রচিত হল বেশ কিছু নাটক। 'বাঙালির দুর্বার সংগ্রাম ও স্বদেশচেতনা মুক্তিযুদ্ধের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।'[৭] যুদ্ধের ফলে প্রত্যক্ষ দুটি বিজয় ঘটেছে বাংলাদেশের নাট্যকর্মে। প্রথমটি হল, নাটকের টিকেট থেকে প্রমোদ কর রহিতকরণ আর দ্বিতীয়টি হল নাটকের ওপর আরোপিত ১৮৭৬ সালের সেন্সরশীপ প্রথা বাতিল করার জন্য একতাবদ্ধ আন্দোলন। প্রমোদকর রহিত করার এবং সেন্সরশীপ প্রথা বাতিলের ফলে নাট্যকর্ম উদার পৃষ্ঠপোষকতার স্বাদ পেয়েছে। রাজধানী ঢাকা অথবা বড় শহরে কোথাও যথার্থ অর্থে আধুনিক একটি মঞ্চ ছিল না। তবে স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে শুধু রাজধানী নয়, সবখানে নাট্যমঞ্চ গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছে। নাটক আবহমান বাংলার জনপদের ইচ্ছা, বাসনা ও বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। বাংলার দর্শক মঞ্চে উদ্ভাসিত হতে দেখেছে তার নিজের বাসনা ও জীবন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত প্রত্যাশার আলোকে নির্মিত হয়েছে নাটক। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন বাংলাদেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের মাঝে সঞ্চার করেছে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর শক্তি। ফলে সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক একজন নাট্যকার হয়ে উঠলেন এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা, সুষম

বণ্টনভিত্তিক সমাজ গড়ার কারিকর। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমি আর বিনোদনধর্মী নাট্যধারার পরিবর্তে বাংলাদেশের সাহিত্যে দেখা দিলো বক্তব্যমুখ্য সমাজসচেতন নাট্যধারা। এই চেতনার বাহক নাট্যকার সেলিম আল দীন। স্বাধীনতার পর তিনি টেলিভিশন, মঞ্চ ও বেতারের জন্য নাটক রচনা করেছেন। বাংলার সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে লোকজ উপাদান নির্ভর বাংলা নাটকের সার্থক রূপকার সেলিম আল দীন। মুক্তিযুদ্ধের পর নতুনধারায় নাটক রচনায় নিমগ্ন হন তরুণ নাট্যকারগণ। সেলিম আল দীন এক্ষেত্রে স্বীয় সাধনায় হয়ে ওঠেন ব্যতিক্রম। তাঁর নাটকের মৌলচেতনা প্রসঙ্গে নাট্যকার সাঈদ আহমদের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> ১৯৭৩ সালে যে ক' জন নাট্যকারের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে সেলিম আল দীন তাঁদের একজন। তাঁর 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' সে সময়কার ব্যতিক্রমধর্মী একটি অ্যাবসার্ড নাটক। এই দেশে ধারাটি প্রায় অজানা ছিল। সেলিম এই ধারার নাটক লিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে আমাদের নাট্যাঙ্গনে সেলিম আল দীন অতি পরিচিত নাম। তাঁর প্রায় সব নাটকই আমার খুব প্রিয়। কারণ একমাত্র সেলিমের নাটকেই প্রত্যক্ষ করা যায় আমাদের দেশ ও দেশের মানুষগুলোকে। তাঁর প্রায় নাটকেই উঠে এসেছে একটি জাতি, একটি ভূখণ্ড এবং পুরো সংস্কৃতি।[৮]

সেলিম আল দীন শুধু নাটক রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি, নাট্যবিষয়ক বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাপূর্বক বাংলা নাটকের সহস্র বছরের ইতিহাস এবং তার একটি সুস্পষ্ট আঙ্গিক অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বাংলা ভাষার একমাত্র নাট্যবিষয়ক কোষগ্রন্থ evOjv bvU¨‡Kvl সংগ্রহ, সংকলন, প্রণয়ন ও সম্পাদনা করেন। নাট্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা w_‡qUvi ÷wWR এর সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্যও তিনি ছিলেন। তাঁর অনেক গবেষণাধর্মী নির্দেশনাকর্ম রয়েছে। সেগুলো হলো "মহুয়া" (^ggbwmsn MxwZKv অবলম্বনে) ১৯৯০, "দেওয়ানা মদিনা" (^ggbwmsn MxwZKv অবলম্বনে) ১৯৯২, GKwU gvigv i¡cK_v (মারমা রূপকথা gbwigvsrmgB অবলম্বনে) ১৯৯৩, Kv‡'v b'x Kv‡'v, ‡gNbv' ea (অভিষেক নামপর্ব) প্রভৃতি। সেলিম আল দীনের PvKv নাটক অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে, যার পরিচালক ছিলেন মোর্শেদুল ইসলাম। এছাড়া তিনি GKvË‡ii hxï নামে একটি চলচ্চিত্রের সংলাপ রচয়িতা, যার পরিচালক ছিলেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ। তাছাড়া তাঁর রচিত wKËb‡Lvjv নাটক ২০০১ সালে চলচ্চিত্রায়ণ করেন পরিচালক আবু সাইয়িদ। তাঁর রচিত niMR নাটকটি সুইডিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এ নাটকটি ভারতের রঙ্গকর্মী নাট্যদল কর্তৃক হিন্দি ভাষায় মঞ্চস্থ হয়েছে। সেলিম আল দীন রচিত নাটক ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী

বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্জন করেন জাতীয় পুরস্কার ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মাননা। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪)
২. ঋষিজ কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা (১৯৮৫)
৩. কথক সাহিত্য পুরস্কার (আব্দুল বাকী নাট্য পদক ১৩৯০ বঙ্গাব্দ)
৪. জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩)
৫. নান্দীকার পুরস্কার (আকাদেমি মঞ্চ কলকাতা) (১৯৯৪)
৬. শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার (১৯৯৪)
৭. খালেকদাদ সাহিত্য পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (একাত্তরের যীশু, শ্রেষ্ঠ সংলাপ) (১৯৯৪)
৮. থিয়েটার প্রদত্ত 'মুনীর চৌধুরী সম্মাননা' (২০০৫)
৯. একুশে পদক (২০০৭)
১০. অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭)

সেলিম আল দীনের নাট্য সাহিত্যজগৎ বিপুল ও বিস্তারিত। তিনি বিষয়বস্তু কিংবা আঙ্গিকগত দিক থেকে প্রতিনিয়তই নাটক নিয়ে বিচিত্রতর চিন্তাভাবনায়, নতুন নতুন পরিকল্পনায় মগ্ন থেকেছেন। তাঁর পরিকল্পনায় 'ঢাকা থিয়েটার' প্রথম 'পথনাটক' মঞ্চায়নের সূত্রপাত করেন। তখন তাঁদের শ্লোগান ছিল 'নাচাও রাস্তা নাচাও'। সেলিম আল দীনের বাসনা ছিল নাটক শুধু মঞ্চের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভেতর নয়, আপামর জনতার মাঝে বিস্তৃত হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় থিয়েটারের মঞ্চপ্রথা ভেঙে বেরিয়ে এসে নাটককে জনতার মাঝে– রাজপথে, ফুটপাতে, পথে-ঘাটে, মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। খোলা মঞ্চে সবার জন্যই উপভোগ্য হয়ে উঠবে নাটক। শুধু তাই নয়, নাটক মঞ্চস্থ হবে সূর্যের উদ্ভাসিত আলোয় মাঠে ময়দানে যত্রতত্র। এ লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে তিনি রচনা করেন বাংলাদেশের প্রথম পথনাটক Pi KvKovi WK‡g›Uwi। এর প্রথম প্রদর্শনী হয় শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। সেলিম আল দীনের নাটক তাঁর গভীর চিন্তা ও পরিশ্রমের ফসল। নাটক রচনায় তাঁর একাগ্রতা ও প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহে শ্রম সাধনার কথা তাঁরই সহধর্মিনীর কাছ থেকে জানা যায় :

> এক একটি লেখার পেছনে রয়েছে তাঁর অপরিসীম শ্রম ও অনুশীলন। এই ব্যাপারটিতে এতটুকু ত্রুটি এতটুকু বিচ্যুতিকে সে মেনে নেয়নি। কঠোরভাবে অনমনীয়। নতি স্বীকার করে না কোনো মতেই। এই একটি ক্ষেত্রে তার কোনো আলস্য নেই। লেখায় কোনো ক্রমে গতিসঞ্চার হলে বিরামহীন লিখতে পারে সে। রাতদিন অবিরাম। রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ এবং প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ফসল তার এক একটি লেখা। এই শ্রম, এই রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, শুধু সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বর জানেন আর জানেন শিল্পের স্রষ্টা। কোনো লেখা মনমতো না হলে বার বার কেটেছে, লিখেছে, আবার কেটেছে আবার লিখেছে। এমনি কতবার তার হিসেব নেই। দিস্তার পর দিস্তা, রিমের পর রিম কাগজ শেষ হয়েছে।[৯]

তিনি নাটকের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড় বেশি পরিশ্রমী ও কঠোর অধ্যবসায়ী ছিলেন। wKËb‡Lvjv থেকে শুরু করে ebcvsïj ও cvP¨ প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রেই উপাত্ত সংগ্রহের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সেখানকার মানুষের সাথে মিশেছেন, থেকেছেন, খেয়েছেন। বিশেষ করে উপজাতিদের জীবনাচরণ, সামাজিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত ব্যাপারগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি নাটকের পেছনেই রয়েছে নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি। তাঁর সৃজনশীলতা, নান্দনিক ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনা, মননশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনাতেই তাঁর নাটকে পরিব্যাপ্তি পেয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে এতটা পরিশ্রমী বলেই হয়তো তিনি বিষয় নির্বাচনে, নতুন আঙ্গিক নির্মাণে, চরিত্রচিত্রণে, বাক্যবিন্যাসে, অনুপুঙ্খ বর্ণনায়, পরিমিতিবোধে, শিল্পসৌকর্যে, চিত্রকল্পে সুনিপুণ ও দক্ষ। যদিও নাটককে বলা হয় দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য, কিন্তু তাঁর নাটকগুলো শুধু মঞ্চ বা অভিনয়নির্ভর নয়, পাঠনির্ভরও বটে। তিনি নাটকে জীবনের অনেক গভীরে গিয়ে দিগন্তের রেখা ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর নাটকের সংলাপে যেমন ছন্দধর্মিতা আছে তেমনি চিত্রগত ও ভাবগত বিন্যাস মাধুর্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। শেকড়সন্ধানী হয়েও সেলিম আল দীনের নাটক তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক ভাবনায় ঋদ্ধ। তাঁর নাটক সংগীতের মতো অতলস্পর্শী গভীরতার আবেশ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রাক্তন প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরী বলেন :

> সেলিম আল দীনের নাটকে পুরাণের স্পর্শ আছে। লোকজ ভাষার শিল্পিত ব্যবহার তাঁর নাট্যকর্মকে উজ্জ্বল করেছে। পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর নাটক। সেলিম নাটক লেখেন। নাটক শোনান। দেখান। সেলিমের নাটক ছবি আঁকে। চলমান

> ছবি যেন। সেলিমের নাটক মাঝে মধ্যে কবিতার মতো মনে হয়। গদ্য কবিতার ধরন। তাঁর নাটক সঙ্গীতের মতো অপূর্ব সুর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলে।[১০]

আবহমান বাংলার জীবনানুরাগী নাট্যকার সেলিম আল দীন। সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসা একজন শিল্পীকে মহত্তর করে তোলে, তাঁকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। নাট্যকারের সবচেয়ে বড় প্রত্যয় ছিল পাশ্চাত্যের নাট্যধারাকে পরিহার করার বাসনা। প্রাচ্যের লোকায়ত আখ্যানকে আধুনিকতার ছাঁচে ফেলে বাংলা নাটককে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত সাধনায় তিনি ছিলেন মহাসাধক। অনুসন্ধিৎসু নাট্যচিন্তা থেকে নাটক যে এক রকম নয়, বহু রকম; বাংলা নাটকের বহুর সেই বিচিত্রতায় তিনি নিজেকে যুক্ত করেছেন। বাংলার প্রাচীন লোকগাথা পুরাণকে আপন সৃজন ক্ষমতায় আধুনিক নাটকে উন্নীত করে অসংখ্য মৌলিক নাটক লিখেছেন। তিনি বাংলা মঞ্চ নাটকের ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণার মঞ্চপ্রথা ভেঙে বেরিয়ে আশার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর অনুধ্যান ও অন্বেষণ তৃষ্ণা ছিল প্রবল। একই সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর দেশপ্রেমও। তিনি ছাত্রাবস্থায় পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, চেখভ, টলেস্টয়, দস্তয়ভস্কি, শেক্সপিয়ার, হোমার, দান্তে, গ্যেটে, সফোক্লিস, এসকিলাস, ইউরিপিডিস। এছাড়া ivgvqY ও gnvfviZ অধ্যয়নে লাভ করেছেন গভীর জীবনবোধ। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই জীবনের গভীর দর্শনের একটি ছোঁয়া পাওয়া যায়। হাজার বছরের বাংলা নাটকের উৎস সন্ধান করেছেন তিনি। বাংলা নাটকের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি এই মত দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ইতিহাসটা পাশ্চাত্যের চেয়েও অগ্রবর্তী। এই গবেষণার জন্য তিনি নেপালি, মৈথিলি ও অসমিয়া ভাষাও শিখেছিলেন। সেলিম আল দীন বেড়ে উঠেছেন গ্রামে, ফলে গ্রামীণ সমাজ ও মানুষের সাংস্কৃতিক নানা রীতি-নীতি এগুলো খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাঁর নিজ গ্রাম সেনেরখিল গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর শৈশব-কৈশোর থেকেই গড়ে ওঠে।

সেলিম আল দীন মনে করতেন যাত্রাপালা দিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলা নাটক। আর যাত্রা মানেই উন্মুক্ত মঞ্চ ব্যবস্থা। মঞ্চ জুড়ে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেন যাত্রাশিল্পীরা। যাত্রা আমাদের বিলুপ্ত প্রায় এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ২০০৪ সালের মে মাসে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করেন সপ্তাহব্যাপী এক যাত্রা কর্মশালার। 'পালা রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়' শিরোনামে কর্মশালাটি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে। যাত্রাপালার প্রতি নাট্যকারের আগ্রহ ছিল অসীম, যার কারণে তিনি এই কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে যাত্রার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। তাঁর জন্মস্থান বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় এক সময় বিখ্যাত যাত্রা শিল্পীদের বসবাস ছিল। শৈশবে

যাত্রা দেখার সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে নাট্যকার সেলিম আল দীনকে লোকজ আঙ্গিকে নাটক নির্মাণ ও আধুনিক নাটকে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো নিঃসন্দেহে। তাঁর নাট্যরচনার প্রেরণা ছিল এই বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা লোকরীতি, পাঁচালি, রূপকথা, মনসার পালা ও যাত্রাগান। বিশাল লোকজ ভাণ্ডার থেকে একটু একটু করে রস নিংড়ে তিনি তৈরি করেন তাঁর নাট্যপ্রতিমা। একই সঙ্গে তিনি বাংলার লোকজীবনকে নাটকের আঙিনায় নানা রঙে ও রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের কঠিন দিনগুলো তাঁর শিল্পিমানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাকিস্তানিদের সামরিক শাসনের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করে একটি শোষণহীন-বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই এদেশের মানুষের উদ্দেশ্য ছিল। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনের নানা সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। সেলিম আল দীনের সত্তর দশকের নাটকে রাজনীতি ও রাজনীতি আশ্রিত সমাজের ছবি একই বাস্তবতায় এসেছে। 'সেলিম আল দীনের নাটকে চিত্রিত হয়েছে শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ছবি।'[১১] কিন্তু তা এসেছে অন্য রূপে, অন্য আঙ্গিকে, অন্য শিল্প ভাবনায়।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ ও সেলিম আল দীন এই চার নাট্যকার আমাদের নবনাট্যের ভিতকে মজবুত করেছেন। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে সৈয়দ শামসুল হক বিলেতে বসে রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক cv‡qi AvIqvR cvIqv hvq (১৯৭৬)। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই কাব্যনাট্যে তিনি নিপুণভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানাদিক উন্মোচন করেছেন। সদ্য-স্বাধীন দেশে চারদিকে বিরাজ করছিল চরম হতাশা, নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। এসব বিষয় উপজীব্য করে আবদুল্লাহ আল মামুন mePb wbewm‡b নাটকটি রচনা করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মামুনুর রশীদ সমাজবাস্তবতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকে শ্রেণি সংগ্রাম বারবার এসেছে। তাঁর রচিত Iiv K'g Avjx নাটকটি বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে এবং ব্যাপক দর্শক নন্দিত হয়েছে। সেলিম আল দীন এঁদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে তরুণ। নাটকের বিষয়ভাবনায় তিনি তাঁদের অনুসারী হলেও অগ্রজ নাট্যকারদের চেয়ে তিনি অনেক শেকড়সন্ধানী। msev' KvUb নাটকটি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম স্বাধীনতা উত্তর সমাজের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা তুলে ধরেন। তবে তাঁর উপস্থাপন কৌশল ছিল ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক। সচেতন বিবেক সম্পন্ন লেখকগণ সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়কে উপজীব্য করে নাট্যরচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। মানুষের অন্ন-বস্ত্র আর বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁদের কলম সক্রিয় হয়ে ওঠে।

সমাজ ও জীবনের রূঢ় বাস্তবতা উপস্থাপনে সেলিম আল দীন এক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাঁর রচিত gbZwmi নাটকে সমকালীন জীবনের যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ নাটকটিতে মিউজিক্যাল কমিডির মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে, তা একটা নতুন আস্বাদ নিয়ে আসে। wKËb‡Lvjv নাটকে তিনিই প্রথম বিশাল গ্রামীণ জীবন নাটকের পটভূমিতে তুলে ধরেন। আর ‡KivgZg½j বিশাল জীবন ও ইতিহাসের পরিক্রমায় রচিত বাঙালির রাজনৈতিক-সামাজিক পট পরিবর্তনের আখ্যান। এভাবে নাটকের ভুবনে সেলিম আল দীন স্বতন্ত্র জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। এছাড়া আরও যাঁদের নাটকে এদেশের মানুষের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের দিনলিপি বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা হলেন সাঈদ আহমেদ, আনিস চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, জিয়া হায়দার, আবদুল মতিন খান, শেখ আকরাম আলী, মমতাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

স্বাধীনতার পর প্রযোজনায় গুণগত পরিবর্তন এসেছে, এসেছে বৈচিত্র্য, এসেছে বাংলাদেশের নাটকের আপন মুখ নির্মাণের প্রয়াস। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে ‘ঢাকা থিয়েটার’ তারুণ্যে উজ্জ্বল একটি নাম। msev‘ KvUb নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে প্রথম দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সংগঠনটি। ‘ঢাকা থিয়েটার’ নাটক মঞ্চায়নে দেশজ অনুষদ ও প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছে। এই কারণে লোকজ উপাদান নিয়ে অর্থাৎ শেকড়ের সন্ধানে এই সংগঠনটির নিয়ত শ্রমসাধনা ছিল। সেলিম আল দীন তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও তাদের প্রিয় সংগঠন ‘ঢাকা থিয়েটার’কে সঙ্গে নিয়ে মৌলিক নাট্যযাত্রা শুরু করেন। ‘চলো চলো গ্রামে চলো’ এ শ্লোগান দিয়ে তাদের ‘গ্রাম থিয়েটার’-এর পথচলা। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় ‘গ্রাম থিয়েটার’-এর জাতীয় সম্মেলন। এই থিয়েটারের উদ্যোগে বের হয় শোভাযাত্রা। তখন তারা নিম্নোক্ত শ্লোগান ধারণ করেছে প্রচার চালিয়েছে :

নাটক, জারি, বিচার গান
মন জমিনে সোনার ধান
চলো চলো গ্রামে চলো
গ্রাম থিয়েটার গড়ে তোলো।

বাংলাদেশের যখন নব নাট্যচর্চার মহাবিপ্লবের শিল্পচিন্তা চলছিল, ঠিক তখনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংস্কৃতি অঙ্গনে দেশজ শিল্পরীতির প্রতিফলনের অঙ্গীকারে জন্ম নিলো ‘বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার’। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ‘বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার’-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য ‘গ্রাম থিয়েটার’। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি অবক্ষয়ের হাত

থেকে রক্ষা করা। মানিকগঞ্জের তালুকনগর থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুস সাত্তারকে মূল গায়েন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'তালুকনগর লোক-সংস্কৃতি গবেষণা স্কুল।' 'গ্রাম থিয়েটার' আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, সারাদেশ ঘুরে বেড়ান, এই দেশের মাটি-মানুষ, শিল্প-সাহিত্য, দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন সকলই নাট্যকার আপন হৃদয়ে গ্রহণ করলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে তিনি দেখলেন কৃষ্ণলীলা, নৌকা বিলাস, বিচার গান, ঘেটু যাত্রা, রাখালের পিঠাগাছ, বেদেনীর পালা, হাতিখেদার গান, কেয়াগান, করম রাজার পালা, যোগীগান, আলকাব, গম্ভিরা, জাগের গান, পুতুল নাচ, পান্তা মোড়ল, শিবের গাজন, নছিমন মাদার, ঝুমুর যাত্রা, একদেল যাত্রা, চণ্ডীমঙ্গল অসংখ্য পালা। এসময় তিনি গায়েনের সঙ্গে কথা বলেছেন, চারণগণের কাছে গেছেন। তিনি জাতীয় লোকনাট্য উৎসবের আয়োজনও করেছেন। তিনি লোকসংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং গবেষণা করেছেন। তিনি সাগ্রহে লোকসংস্কৃতি উপভোগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> বাংলার বৃহৎ জনজীবনকে তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধসহ তুলে আনার শ্রম সম্ভব প্রচেষ্টায় 'ঢাকা থিয়েটার' নাট্যদলের অমিত শক্তিধর নাট্যকার সেলিম আল দীন মনোনিবেশ করেন। ইউরোপীয় নাট্য আঙ্গিক এবং হতাশা ক্লান্ত মধ্যবিত্তের নিষ্ক্রিয় স্বপ্নমোক্ষণের বাইরে গিয়ে, নিজস্ব নন্দন প্রকরণে বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অকুতোভয় সংগ্রামী জীবনকে 'বর্ণন' এর ঐকান্তিকতায় অনুপ্রাণিত হন তিনি। এ প্রচেষ্টায় সরাসরি কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য পাওয়া গেল না সত্য, কিন্তু স্বাধীনতার মুক্তিস্বাদ আস্বাদের আগেই সমাজ দেহ হতে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর সময়ের দূরত্ব চিহ্ন মুছে গিয়ে আত্মপরিচয় সঙ্কটটি যে গভীরতা নিয়ে উপস্থিত হয় সেই দুর্বিনীত কালে 'ঢাকা থিয়েটার' বাংলার নিজস্ব নাট্য-প্রকৌশল অন্বেষণে নেমে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার মৌল প্রেরণাটিকে সামনে নিয়ে আত্মপরিচয় আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হলো এবং নির্মাণে প্রযত্ন হলো দেশজ নাট্য আঙ্গিক– যা সরাসরি নয়, কিন্তু গভীরতর এক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দায়বোধ জাত।[১২]

সেলিম আল দীনের 'ঢাকা থিয়েটার' তাদের ঘোষণাপত্রে শুরু থেকেই এই একটি বক্তব্য ধারণ করে বলেছে, বাংলাদেশ একটি সংগ্রাম ক্ষুব্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম। যুদ্ধ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই জনপদ সমুন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করেছে। এই দেশ, তার ইতিহাস, সংগ্রাম, সংস্কৃতি, তার সবকিছু তাদের সম্মান ও অহংকারের বস্তু। এ কারণে তারা নাটকের বিষয়বস্তুরূপে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলার কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষের সংগ্রামী জীবন বেছে নিয়েছে। 'ঢাকা থিয়েটার' ও 'গ্রাম থিয়েটার' এর ভাবনায় গড়ে ওঠে সেলিম আল দীনের নাট্যভুবন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্য স্মরণীয়: 'বস্তুতপক্ষে নাসির উদ্দিন ইউসুফের যুগন্ধর প্রতিভা

আমার চলার পথের পূর্ণাঙ্গ সম্বল। এর সঙ্গে আছে আমাদের নিজেদের গড়া দল ঢাকা থিয়েটার এবং বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কর্মীবৃন্দ।'[১৩] বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে উপকূল অঞ্চল। প্রতিনিয়ত ঝড়-ঝঞ্ঝা-বন্যা-অভাব-অনটন- চর দখলসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করে উপকূল অঞ্চলের মানুষেরা। তাঁর nwZ n'vB নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে সমুদ্র তীরবর্তী মানুষের সংগ্রামী জীবন। গারো-চাকমা-মারমা-টিপরাসহ নানা নৃগোষ্ঠী ছাড়াও আছে সমুদ্রজয় করা জেলেরা। আছে হাজং সম্প্রদায়ের লড়াই করবার ঐতিহ্য। উপকূলের তীর ঘেঁষে আছে অসংখ্য নদী-উপনদী, যা প্রাকৃতিক লীলামঞ্চে নৃত্যের উন্মাদনায় সৃষ্টি ও ধ্বংসে মেতে ওঠে। সেলিম আল দীনের নাটকে তারই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তিনি নিজস্ব একটি চেতনায় নাটককে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। যে ঐতিহ্য ছড়িয়ে আছে আমাদের কবিগানে, মহররমের শোকগাঁথায়, পুঁথি পাঠে, মিলাদ শরিফে, কীর্তনে। এই ঐতিহ্যকে কেবল অভিনয়ের দিক থেকে নয়, সেই সঙ্গে এই সব ক্ষেত্রে যেভাবে একটি কাহিনিকে উপস্থাপিত করা যায়, যেভাবে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেগুলোকে থিয়েটারে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে নাট্যকার সচেষ্ট ছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিচিত্র শিল্পরীতির গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি পেয়েছেন হাস্তর, গাজীর গান, মনসামঙ্গল, গীতিকা, লীলা, যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, মাদার, আলকাপসহ অজস্র নাট্যরীতির। শতবর্ষের ঔপনিবেশিক ঝড়ে হাজার বছরের শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিলীন হয়ে যায়। তিনি সেই বিশাল শিল্পভাণ্ডার বিশ্লেষণপূর্বক নির্মাণ করেন বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, কথানাট্য ও পাঁচালিরীতির নাটক।

সেলিম আল দীনের নাটকের আঙ্গিক সমকালে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। নাটক বলতে তিনি কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা মেনে নেন নি। কারণ wKËb‡Lvjv থেকেই তিনি নাটকের মধ্যে মহাকাব্যের সর্গ বিভাগ দিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে তিনি কোনো বিভাজন স্বীকার করতেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক এ ধরনের বিভাজনকে তিনি বলেছেন– এই বিভাজনগুলো পাশ্চাত্যের দেওয়া। নাট্যকার নিজেই বলেছেন, 'আমার মনে হয় পাশ্চাত্যের সংজ্ঞায় আমি নাটক লিখি নি।'[১৪] আসলে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটি আসলো কি না, সেটাই বিবেচ্য বিষয় ছিলো তাঁর কাছে। তিনি নাটকের মধ্যে বহুকে একের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী-শিল্পতত্ত্ব'-এর আলোকে। তাঁর বিশেষ ধরনের লেখাগুলো পুরোটাই পড়া যেতে পারে আবার কবিতা আকারেও সাজানো যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> ভারতীয় ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্র কথিত অমর উক্তি 'নাটক দৃশ্যকাব্য' সেলিম আল দীন সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করেন। নাটকের অঙ্গ-উপাঙ্গ গড়ন পরিকল্পনাকালে তাই দৃশ্যকে কাব্যের ছন্দে গেঁথে শিল্পিতভাবে নাট্যক্রিয়ার অনুগামী করেন। কর্মটি দুরূহ কিন্তু অসাধ্য নয়। একে অনায়াস সাধ্য করবার জন্য তিনি যে নাট্যিক কৌশল অবলম্বন করেন তাতে পরিবেশ, প্রতিবেশ মুখ্য হয়ে ওঠে। সে পরিবেশ কখনও কোনো একটি বিশেষ স্থান, কখনও কখনও বা বিশ্বজাগতিক পরিমণ্ডল সমেত উপস্থাপিত হয়। ব্যক্তি নয় সমষ্টির সমস্যা, ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক সমস্যা রূপ তাঁর নাটকে চিহ্নিত।[১৫]

বাংলা নাটকের নতুন শিল্পদর্শন আবিষ্কার করতে গিয়ে সেলিম আল দীন প্রচলিত কাঠামোগুলোকে কঠোরভাবে বর্জন করার চেষ্টা করেছেন। নতুন এক শিল্পভাবনায় নিমগ্ন থেকে এর নাম দিয়েছেন তিনি 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব'। ফলে তাঁর লেখাকে হঠাৎ করে নাটক মনে হয় না। নাটক নির্মাণে তিনি একই বৃত্তে আবদ্ধ থাকেন নি। তিনি ক্রমান্বয়ে নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন, অন্বেষণ করেছেন নিজস্ব শিল্পদর্শন। সঙ্গত কারণে তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ ছিল। তাঁর লেখনীর দ্বারা তিনি প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাট্যকার নিজেই বলেছেন :

> আমি মূলত রবীন্দ্রনাথের পথেই চলেছি বলে মনে করি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনার যে ক্রমস্তরগুলো এবং শিল্পের মধ্য দিয়ে রিচ্যুয়ালের জায়গাটায় পৌঁছানোর, শিল্পকে রিচ্যুয়াল করে জীবনের একেবারে অন্তিমপর্বে পৌঁছানোর যে চেষ্টাটা, একবারে হুবহু এই বিষয়টিই আমি অনুকরণের চেষ্টা করেছি আমার লেখার মধ্য দিয়ে। আমার লেখায় সব সময় যে ঝোঁকটা থাকে, মহাজাগতিক যে অন্বেষণটা আমি করি, সেখানে মানুষের এক অবস্থান দেখার পর আবার নতুন অবস্থান অন্বেষণে বেড়িয়েছি।[১৬]

সুতরাং এভাবেই সেলিম আল দীনের সাহিত্যজীবন গড়ে ওঠে এবং নাটক রচনার পটভূমি তৈরি হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK (ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২), পৃ. ১৫৮

২. সেলিম আল দীন, “বাংলা নাটকের বিশ্বযাত্রা অপ্রতিরোধ্য”, আমিরুল ইসলাম আমির গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সংকলন ও গ্রন্থন, Knb K_v (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০০৮), পৃ. ৪৪

৩. সৈয়দা খালেদা জাহান, evsjv‡‘‡ki bvU‡K ivRbxwZ I mgvR m‡PZbZv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩), পৃ. ১৫

৪. Z‡‘e, পৃ. ২৪৯

৫. লুৎফর রহমান, পৃ. ১১

৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨ (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫২

৭. সৈয়দা খালেদা জাহান, পৃ. ২৪৮

৮. সাঈদ আহমদ, “গৌড়জনের সেলিম আল দীন”, মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ mI‘v (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১৮০

৯. মেহেরুন্নেসা সেলিম, “নাটকের সাথে বসবাস”, mvZ mI‘v, পৃ. ১১১

১০. আতিকুল হক চৌধুরী, “গৌড়জনের সেলিম আল দীন”, mvZ mI‘v, পৃ. ১৮৩

১১. সৈয়দা খালেদা জাহান, পৃ. ২৪৯

১২. সেলিম মোজাহার, ¯vaxbZv-DËi XvKv‡Kw›‘K gÂbvU‡K ivRbxwZ I mgvRev¯ÍeZv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৬৮-৬৯

১৩. রণজিৎ সিংহ, “সেলিম আল দীনের নাটক: আঞ্চলিক মহাকাব্য”, mvZ mI‘v, পৃ. ৪৪

১৪. সেলিম আল দীন, “আলাপনে সেলিম আল দীন”, হাসান শাহরিয়ার গৃহীত সাক্ষাৎকার, Knb K_v, পৃ. ১৬৪

১৫. লুৎফর রহমান, পৃ. ২৫৮

১৬. সেলিম আল দীন, “আলাপনে সেলিম আল দীন”, হাসান শাহরিয়ার গৃহীত সাক্ষাৎকার, Knb K_v, পৃ. ১৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তুতি পর্যায়ের নাটকের বিষয়বিচার (১৯৭২-১৯৭৯)

সেলিম আল দীনের প্রস্তুতি পর্যায়ের নাটকের রচনাকাল বিবেচনা করা হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল। এই সময়ের মধ্যে রচিত নাটকগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়। উল্লিখিত আট বছর বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালে নয় মাস পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এদেশের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। সশস্ত্র সংগ্রাম আর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙালিরা অর্জন করে তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বাধীন একটি ভূখণ্ড, একটি সংবিধান ও একটি মানচিত্র। অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার, মুক্ত চিন্তার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখেছে তা এবার বাস্তবায়নের পালা। সদ্য স্বাধীন দেশে সকল বিষয়ে একটি গঠনশীল প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হয় এদেশের তরুণ নাট্যকার ও নাট্য সংগঠনগুলোও। স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের নাটকে সত্যিকারের পালাবদল ঘটল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলের মৌসুমি নাট্যাভিনয়ের পরিবর্তে নাট্যকার ও নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত নাট্যকারগণ নাটককে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিলেন। সেলিম আল দীন যুদ্ধ ফেরত তরুণ নাট্যকার। সদ্য স্বাধীন দেশের নানা ঘটনা তাঁকে আন্দোলিত করেছে, ফলে সঙ্গত কারণেই সমকালকে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি সদা তৎপর হন। অবশ্য পাকিস্তান আমলে সমকালীন সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ ছিল অসম্ভব। স্বাধীন বাংলায় সেখানে সঞ্চারিত হলো নতুন মাত্রা, প্রতিভা বিকাশের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। সেলিম আল দীনের প্রস্তুতি পর্বের নাটক স্বদেশ ও স্বকালের ভাবনাজাত সৃষ্টি। তাঁর এ পর্যায়ে রচিত বেশির ভাগ নাটকে নব্য জন্মলাভকারী বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকট ব্যঙ্গাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি এ পর্বের নাটকে স্বাধীনদেশের দুরবস্থায় স্বপ্নভঙ্গের বেদনাজাত হতাশা থেকে নাটকে প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রস্তুতি পর্যায়ে রচিত নাটকগুলো হলো– RwÛm I wewea †ejb, msev‘ KvUb, G·‡cøvwmf I gj mgm¨v, gbZvwmi, Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gL †‘Lv, mc welqK Mí, AvZi Avjx‡‘i bxjvf cvU,

wjweqvg, kKšÍjv, Awb‡KZ A‡šlY, †'qvj, bxj kqZvb: ZwnwZ BZ¨w', i‡³i Av½ijZv, k¨vgj Qvqvq, AkæZ MvÜvi, gwbqv gd¯‡j, ‡kl eskai, Pi KvKov ইত্যাদি।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করে দেশ চালাতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের মানুষ একাত্তরে বিদ্রোহ করেছিল পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে। কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই সমাজ ব্যবস্থায় দেখা দেয় চরম অরাজকতা। স্বাধীনতা-বিরোধীরা হঠাৎ দেশপ্রেমিক সেজে মুক্তিযোদ্ধার মুখোশ পড়ে সামাজিক অনাচারে মেতে ওঠে। আবার একদল মুক্তিযোদ্ধা সরকার দলীয় পরিচয়ে লুটপাটে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরদিকে তখন প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা চরম অবহেলায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এরূপ পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, প্রতিশোধ পরায়ণতা, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, চোরাকারবারি, মজুতদারি, যুব সমাজের হতাশা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সংকট বাংলাদেশকে গ্রাস করে। সমকালীন সমাজজীবনের দুর্বিষহ প্রতিচ্ছবি সেলিম আল দীনের এ পর্বের নাটকে খুব নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে। স্বাধীনদেশে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নাট্যকার নিয়েছিলেন এক ধরনের প্রতিবাদী ভূমিকা। RwÛm I wewea †ejb (১৯৭২) নাটকে নাট্যকারের সামাজিক ও রাজনৈতিক মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে খুব শীঘ্রই দেশ নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হয়। মুজিব সরকার বাহাত্তর সালেই রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। বাহাত্তর সালে রচিত সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু করা হয়। সে সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু সারাদেশের বিশৃঙ্খল অবস্থায় জাসদ, ন্যাপসহ অন্যান্য বিরোধীদলগুলো সরকারের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। ক্ষমতাসীন সরকার এই সময়ে বারবার দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে থাকে। তবে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে তার প্রতিফলন দেখা যায় নি। RwÛm I wewea †ejb নাটকে সমকালে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ব্যর্থতায় জনমনে যে ক্ষোভ, হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই নাট্যরূপ দৃশ্যমান হয়েছে। এ নাটকে ফকিরের কান্না, বেকারের চিৎকার, ক্ষুধার্তের মিছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থিক দুর্দশার চিত্রই বর্ণিত হয়েছে। অ্যাবসার্ডরীতির এ নাটকে

নাট্যকার চরিত্রের কোনো নাম ব্যবহার করেন নি। নাটকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুবক এরা হচ্ছে সমকালের বিরুদ্ধ পরিবেশে নৈরাজ্য রোগে আক্রান্ত। এরা হতাশ এই জন্য যে, বিরুদ্ধ পরিবেশে জন্ডিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, বেলুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এরা শান্তিতে বাঁচতে চায়, কিন্তু পারে না। তারা অসুস্থ জীবনের বিরুদ্ধে চিৎকার করে, সমগ্র পৃথিবীর অসুখের বিরুদ্ধে তারা শ্লোগান দেয়। তাদের রঙিন স্বপ্ন ধূসর হয়ে গেছে। এসব যুবকেরা শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারে না, বরং পরিণামে নিজেরাই হয় সময়ের অনিবার্য শিকার :

যুবক : এক অমোঘ জন্ডিসের বীজ এই শহরের মানুষদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বন্ধুগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চাই। ওষুধের দাবী।

সঙ্গী : ওটা একটা রোগ নাকি। জন্ডিস কমবেশি সকলের রক্তে আছে।

সমবেত : প্রথম জন সে তো বটেই।

রোগী : বরং জন্ডিস নিয়ে আমরা যখন ভাবনায় পড়ছি তখন বেলুন হাতে পেয়ে বেঁচে গেছি।

সমবেত : দ্বিতীয় জন হ্যাঁ-বেঁচে গেছি।

যুবক : কিন্তু আপনারা কি সুস্থ?

রোগী : এর বিকল্প কোনো পথ নেই।

সঙ্গী : বলছেন টাউন হলে না গিয়ে জনসভা করবেন। কিন্তু আজকাল বেলুন ছাড়া এই শহরে কোনো জনসভাই হয় না। কাজেই।

যুবক : চুপ করুন। দেখতে পান না রাস্তায় ভিখেরী-বেকার-বস্তিতে ক্ষুধার আগুন। সহস্র সহস্র মানুষের রক্ত শূন্যতা।[১]

উপর্যুক্ত সংলাপে এখানে অনেকটা রূপক-প্রতীকের আড়ালে নাট্যকার সমকালকে চিত্রায়িত করেছেন। 'নাট্যকার এই নাটকে জন্ডিসকে একটি মৌসুমী রোগ এবং বেলুনকে ধূসর জীবনের প্রতীক হিসেবে বোঝাতে চেয়েছেন।'[২] RwÛm I wewea †ejb নাটকে যুব সমাজের মধ্যে হতাশা, ব্যর্থতার পাশাপাশি তাদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবও প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বাধীনতাযুদ্ধে মার্কিনীদের স্বাধীনতা-বিরোধী ভূমিকার জন্য যুবকেরা শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের আগ্রাসী ও দখলদারিত্ব থেকে মুক্তির কথা বলেছে। নাটকে প্রতিবাদী যুবকেরা ভিয়েতনামে আমেরিকানদের বোমা বর্ষণ বন্ধ হলে বিশ্ব শান্তির পথ প্রশস্ত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে :

তৃতীয় যুবক : বন্ধুগণ। বৃহৎ শক্তিবর্গ আজ জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পর্কে আবার বৈঠকে

> বসেছে। আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। আমরা জানি ইউরোপের ক্ষুধিত হাত আফ্রিকার কালো মানুষের রক্তে এক গভীর অসুখ ঢেলেছে। সেখানে সমস্ত সংগ্রামকে রঙিন বেলুন দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। কালো মানুষের কাছে এই সব বেলুনগুলো ইউরোপের মতো লোভনীয়।[৩]

সেলিম আল দীন RwÛm I wewea †ejb নাটকে সমাজ ও রাষ্ট্রের দেহে যে নৈরাজ্য, সেই অবস্থা আড়াল করার সরকারের ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য— 'এখানে বেলুনকে কথার ফানুস বলা হচ্ছে। আর রাষ্ট্রের চারটি সমকালীন মূলনীতিকে চারটি বেলুনের কারখানার রূপকে তুলে ধরা হয়েছে।'[৪] তাঁর এই নাটকটি সমসাময়িক রাজনৈতিক বক্তব্যসমৃদ্ধ। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা যখন অস্ত্র জমা দিয়েছে, তখন অন্যদের হাতে ছিল অস্ত্র। সেই সকল অস্ত্রধারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে গণপিটুনিতে হত্যা করে। এ রকম একটি কঠিন সময়ে নাট্যকার RwÛm I wewea †ejb নাটকটি লিখেছেন। দেশের বাইরে তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। তাই নাটকের মূল কাহিনি সবার জন্ডিস হয়েছে এবং তাদের চিকিৎসার বদলে দেওয়া হচ্ছে বেলুন– এ বিষয়টি বিদ্রুপের মাধ্যমে অ্যাবসার্ডের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়। এখানে নাট্যকারের গভীর সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> RwÛm I wewea †ejb নাটকে দেশব্যাপী সেই অস্থিরতার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের অসহায়ত্ব এবং ব্যর্থতাজাত বর্ণিল, শূন্য, মিথ্যে আশ্বাসকে নাট্যকার রূপক-প্রতীক ও অ্যাবসার্ডের বিভিন্ন গড়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। একদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বোত্থিত নখরে জনজীবন জন্ডিস বিবর্ণতা অন্যদিকে চারটি পবিত্র ইন্ডাস্ট্রি এবং তার প্রোডাকশন নামক রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের অকার্যকর আশ্বাস। নাটকে স্বাধীনতার অব্যবহিত কালের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি সমকালীন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের রাজনৈতিক ভ্রান্তিবিলাসও একই বেলুন বিদ্রুপ-এ বিদ্ধ করেন নাট্যকার।[৫]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক ব্যতিরেকেও সমকালের বিপর্যস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বহু নাটক রচিত হলো। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটল। সাধারণ মানুষ প্রথমেই পড়েছে অর্থ-সংকটে। ফলে দেশে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ। কালো টাকা, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি এবং সামাজিক নৈরাজ্য মানুষকে বিচলিত করে তোলে। মানুষের মধ্যে দেখা দেয় অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, শূন্যতা আর আশাহীনতা। এরই প্রেক্ষাপটে সেলিম আল দীন লেখেন msev' KvUb (১৯৭৩)। সংবাদপত্রের রিপোর্ট নির্ভর msev' KvUb মূলত সাম্প্রতিক সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন

সমসাময়িক ঘটনা– আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালো টাকার দৌরাত্ম্য, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে ভেজাল, রাজনৈতিক নেতাদের গুপ্ত হত্যা, শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণহীনতা এ সবের উপর ভিত্তি করে রচিত। 'ঢাকা থিয়েটারের msev' KvUb ছিলো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রযোজনা।'[৬] জনপ্রিয় এই নাটকটি সমকালে অসংখ্যবার মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার নাটকের শুরু করেন একটি বিরাট আকারের কার্টুন দ্বারা। প্রথমে প্লাকার্ড হাতে একটি লোক প্রবেশ করে, তাতে ছিল ঢাকা শহরের মানচিত্র। এরপর মঞ্চে আসে একজন ঘোষক। সে এসে জানায় ঢাকা শহরের মানচিত্র নিজেই একটি শ্লোগান। ঘোষক ঘোষণা দেয় :

> ঢাকা শহর। জ্বি হ্যাঁ- কালোবাজারী চোরাকারবারীর শহর- মুনাফাখোর-মজুতদারের শহর- হাইজ্যাকের-ব্যাঙ্কলুটেরা নকলবাজের শহর। ঢাকা শহর। ঢাক ঢাক গুড় গুড় কি। এতো সত্যি কথা। অবশ্য আমার মত নিরীহ মানুষেরাও এ শহরে থাকে। তাছাড়াও আছে বেচারি মধ্যবিত্ত ব্যর্থ প্রেমিক– হতাশ রাজনীতিক-গ্যাস্ট্রিকে ভোগা বুদ্ধিজীবী– জন্ডিসে ভোগা কবিকুল। আয়তন পনেরো বর্গমাইল– লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ। বিশ হাজার কেরানী– ছশ হাইজ্যাকার– পাঁচশ নকলবাজ– তিনশ কালো বাজারী- ছয় হাজার ব্যবসায়ী-ছয় হাজার কসাই– জ্বি। জ্বি– কসাই এবং ব্যবসায়ী। দৈনিক তিনটি খুন চারটি ধর্ষণ। পাঁচটি অপহরণ।[৭]

বাংলাদেশে বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালে পথে-ঘাটে হত্যা এবং গুপ্তহত্যার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। আর ব্যাপকভাবে বেড়ে ছিল সন্ত্রাস, রাহাজানি, কালোবাজারি ও দুর্নীতি। নাট্যকার যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিশেষভাবে ঢাকা শহরের বাস্তবচিত্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেন। মূলত পুরো দেশটাই যেন ক্রমে হত্যা, সন্ত্রাস, নকলবাজ, মুনাফাখোর ও লোভী দুর্বৃত্তের দখলে ছিল। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের এমন দুর্দশা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। দেশকে পুনর্গঠনে দায়িত্ব যাদের কাঁধে, তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। এসবের যেন কোনো শেষ নেই, কোনো প্রতিকার নেই। নাটকে দেখা যায়, নিরীহ ঢাকাবাসী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় হতাশ; চরম আতঙ্কে কাটে তাদের দিন। যেমন :

> আরও একটা পত্রিকার খবর। ১৭ই সেপ্টেম্বর। ডাকাত সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা। স্থানীয় ব্যাংকে দুপুর বেলা– ইত্যাদি ইত্যাদি– খবর শেষে নিহত ব্যক্তির কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায় নি। বেচারি পুলিশ কাকে এ্যারেস্ট করবে। থাক এসব তেতো কথা। ৭৩-এর বাংলাদেশের ঢাকা নামক শহরে যে নির্ভয়ে রাস্তায় চলবেন সে অসম্ভব। পুলিশ আছে- হাইজ্যাকারও আছে। আজকাল এমন সব

> ঘটনা ঘটছে– দেশে আপনি আদৌ অবাক হবেন না যদি হাইজ্যাকারদের একটা দল রাস্তায় প্রসেশন করতে করতে বেরিয়ে পড়ে– এই যে দেখুন আসছে।[৮]

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তাদের বিরুদ্ধে দেশি-বিদেশি নানা চক্রান্ত চলতে থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে পুনর্গঠনে প্রয়োজন ছিল সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। স্বাধীনতার বছর খানেকের মধ্যেই ভূলুণ্ঠিত হয় স্বাধীনতা চেতনা। বিরোধী বামপন্থী দলগুলোর ওপর চলছিলো নানারকম নিপীড়ন। তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতায় বিরোধীদলগুলো ও সাধারণ জনতা সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। সরকার ও বিরোধীদের প্রতি মারমুখী আচরণ করে। নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যেন শহরের সমস্ত সংকট, সমস্যা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলার জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলগুলি পরস্পরকে দায়ী করছে। তাই সরকারি দলের মুখপাত্রের দ্বিতীয় বক্তার কণ্ঠে শোনা যায় স্বপক্ষে বড় বড় বক্তৃতা :

> বন্ধুগণ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদেশ অমান্য করে যারা এখনও অস্ত্র জমা দেয়নি তারা দেশদ্রোহী। অতি বামপন্থীরা অবস্থাকে কেবল ধূমায়িত করে তুলছে। বন্ধুগণ। কালোবাজারী– চোরাকারবারীদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে– আর এই ব্যাপারে আমরা সফলও হচ্ছি। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কার্যকরী হলে– বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– সোনার বাংলায় পরিণত হবে। বন্ধুগণ। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশকে তার সুনামকে কোনো অবস্থাতেই বিপর্যস্ত করা যাবে না। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা।[৯]

স্বাধীনতার পর রাজাকাররা সেজেছে মুক্তিযোদ্ধা। কে আসল মুক্তিযোদ্ধা আর কে নকল মুক্তিযোদ্ধা তখন চেনা কঠিন হয়ে পড়ে। সমকালের এই জটিল সামাজিক পরিস্থিতি নাটকে উপস্থাপন করে নাট্যকার সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার বলে উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে, এমনি অরাজক অবস্থায় ঘোষকের ভাষ্য: 'পালিয়ে বাঁচলাম বাবা। কারণ আমি ঠিক নিশ্চিত ছিলাম না যে আল-বদর রাজাকার আমি নই। ৭৩-এর বাংলাদেশে কে যে রাজাকার আর কে যে নয় সে কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। আপনি যে–ই হোন যে কেউ বলে দিক এইতো বাস– ইহলীলা।'[১০]

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দেশ পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা নাটকে মুখ্য হয়ে ওঠে। তৎকালে দেশে বিরাজ করছিল হত্যা আর সন্ত্রাসের রাজনীতি। এজন্য নাট্যকার মুনাফাখোর আর চোরাকারবারিদের দায়ী

করে এদের নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে স্পষ্টভাবে অভিযোগ এনেছেন। প্রতিবাদী নাট্যকার তাই ব্যর্থ সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন :

> বন্ধুগণ-আজ জাতির এই ক্রান্তিকালে হত্যা যেখানে কথায় কথায়– উচ্ছৃঙ্খলতা যেখানে চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে– চোরাকারবারী মুনাফাখোরের কবলে সমগ্র বাংলাদেশ যেখানে নিমজ্জিত সেখানে আমরা বিপ্লবের লাল লেলিহান শিখার মশাল নিয়ে এগিয়ে যাবো। আমরা এই অযোগ্য সরকারের পতন চাই। অদূরদর্শী সরকার পরোক্ষভাবে কালোবাজারীদের হাতই শক্ত করছে। প্রায় চব্বিশ কোটি টাকার করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর উটকো স্বপ্ন দেখছে বৈদেশিক সাহায্যের। আমরা চাই– যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কর থেকে জনতাকে রেহাই দাও– দেশদ্রোহী বলে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের হত্যা করা চলবে না– বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করো– নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কমাও– সীমান্তে আরও কড়া প্রহরা মোতায়েন করো। জয় মেহনতী জনতা– জয় বাংলা।[১১]

সেলিম আল দীনের মিউজিক্যাল কমেডি msev' KvUb নাটকে সরকারের এবং তৎকালীন বামপন্থী বিরোধী দলের মুখপাত্রের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার বাস্তবচিত্র শ্লেষের মাধ্যমে নাটকে তুলে আনেন। সরকার ও বিরোধী দলের এই মুখোমুখি অবস্থানের ফলে উভয়দলের নেতাই গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে। জনতা এই গুপ্তহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্বৃত্ত শোষক লুটেরাদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধের সংকল্প নাটকটিতে অনুপস্থিত। 'নাটকে গুপ্ত হত্যা, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদী শ্লোগান উচ্চারিত হলেও সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যস্ত অবস্থা সর্বোপরি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ সোচ্চার প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটেনি।'[১২] সেলিম আল দীনের শিল্পসফল নাট্যকর্মের একটি msev' KvUb। সমকালীন রাজনীতির চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনে নাটকটি পেয়েছে প্রতিবাদী নাটকের অভিধা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> ঢাকা থিয়েটার এর প্রথম প্রযোজনা 'সংবাদ কার্টুন' স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জনজীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা, নৈরাজ্য, অন্তর্কলহ, হিংসার অবাধ বিচরণ, নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং এর ফলে সমাজ মানসে হতাশা ও বিভ্রান্তকে তুলে ধরেছেন। শোষণহীন সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখা যুদ্ধফেরত তরুণ মেধাবী নাট্যকার সেলিম আল দীনের এই নাটক প্রতিবাদী চেতনায় ঋদ্ধ। প্রহসন জাতীয় এই নাটকটিতে সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে শ্লেষের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।[১৩]

একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যকাররা বিষয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন মুক্তিযুদ্ধকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্য বিকশিত হয়েছে অমিত সম্ভাবনায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের নাট্যকারদের পুর্নগঠন করেছে নতুন মূল্যবোধে। জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের চেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের নাট্যকের অঙ্গনও হয়েছে সমৃদ্ধ। এর ফলে অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধের নাটক রচিত হয়েছে। সেলিম আল দীনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক †'qvj (১৯৭২)। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস পাক হানাদার বাহিনী এদেশের সাধারণ মানুষের উপর যে বর্বর নির্যাতন চালিয়েছে, তারই নিখুঁত ছবি আলোচ্য নাটকে পাওয়া যায়। নাট্যকাহিনিতে প্রত্যক্ষ করা যায় যুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনী প্রধান শহর ছেড়ে মফস্বল শহরে আস্তানা গেড়েছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে স্বাধীনতা-বিরোধী রাজাকার শক্তি। পিস কমিটির চেয়ারম্যান আশরাফ খান সাপ্তাহিক ইনসাফ পত্রিকার সম্পাদক। ক্যাপ্টেন কিশলু খান ও আশরাফ খান মিলে এই বর্বরতায় নেতৃত্ব দেয়। তারা এদেশে অধ্যাপক, উকিল, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ নিরীহ নর-নারীদের ধরে এনে নিমর্ম নির্যাতন চালিয়েছে। যুদ্ধের সময় দখলদার পাকিস্তানিরা নির্মম গণহত্যা চালিয়েছে, তারই বর্ণনা রয়েছে নাটকে :

রমণী : আমি আমি মরে যাবো। দস্যুগুলো আমার ছেলেকে আছড়ে মেরেছে। স্বামীকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে।

অধ্যাপক : অসহ্য। অসহ্য। মৃত্যুর আদেশ চাই। আর কি। গেরিলা। একটা গ্রেনেড থাকতো। একটা স্টেন।

উকিল : আসুন পেছনে। আমরা আড়াল করে রাখবো। কি হবে আর। রমণী আড়ালে আত্মগোপন করে। একাকী মৃত্যু কষ্টকর। কী ভালো ধারণা নিয়ে এখন মরবো। আমরা একা নই।[১৪]

স্বাধীনতার পর বিনোদনের একটা নতুন মাধ্যম হিসেবে নাটককে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। নাটককে ঘিরে শুরু হয় সাংস্কৃতিক তৎপরতা। আর সে ক্ষেত্রে সমাজসচেতন নাটকই দর্শক চিত্তে বেশি নাড়া দিতে পেরেছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এদেশের নাট্য সংগঠনগুলো সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক রচনার মাধ্যমে নাটককে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরপর দেশে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, হত্যা, অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর জনজীবনের সেই সংকট নিয়ে সমকালে প্রচুর নাটক রচিত হয়েছে। '১৯৭২ সালে সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচনা করেন রূপক নাটক mc welqK Mí।'[১৫] নাটকে দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার এবং অস্থিরতার চিত্র নাট্যকার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন।

তৎকালে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিয়েও সংশয় জেগেছিল। নাটকে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়, দেশে একজন খুব জনপ্রিয় নেতা ও শাসক ছিলেন যাকে হঠাৎ করেই রাতের অন্ধকারে সামরিক বাহিনীর লোকজন খুন করেছে। তার মৃত্যুর পর শহরে মিছিল মিটিং যেমন বন্ধ তেমনি লুটপাটের ভয়ও অনেকটা কমেছে।

সেলিম আল দীন সচেতন নাগরিক হিসেবে এ নাটকে দেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেন। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এই নেতা যখন মিছিলে যেতেন, পেছনে হাজার হাজার লোক থাকত; অথচ তার জানাযা পড়তে গিয়েছিল মাত্র ছয়জন। কেউ শোকসভা পর্যন্ত করে নি। জীবিত অবস্থায় লোকটাকে অনেকেই সমীহ করতো, অনেকেই খুশি মনে নেতার ছবিও টাঙিয়েছিল। দেশের এক অস্থিতিশীল সামাজিক অবস্থায় বিদেশি পণ্য বর্জন করার নির্দেশ দেবার পর ব্রাশ ফায়ারে নেতা নিহত হয়েছেন। অতঃপর শহরময় এক ভূতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করছে। চারিদিকে সর্পাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, পার্কে সর্পদংশনে দুজন লোকের মৃত্যু ঘটেছে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফর্হাদের ঘরেও সে আতঙ্ক এসে পৌঁছায়। চোরাকারবারি, অবৈধ বিদেশি মালের ব্যবসায়ী ফর্হাদ। সে সুবিধাবাদী লোক। মূলত নেতার মৃত্যুর পর দেয়াল থেকে ছবিটি নামিয়ে রাখেন। এখন তো আর ভয় নেই, সব ঠাণ্ডা। নেতার মৃত্যুতে লাভবান হন ব্যবসায়ীরা। তাই ফর্হাদ বলেছে: 'আপনারাই বলুন। দেশী মালের কারখানা বন্ধ। অথচ বিদেশী মাল বয়কট। নেতার কথা মতো চললে ব্যবসা চলে না। রাজনীতি দিয়ে আমাদের কী।'[১৬]

ফর্হাদের মধ্যে সবসময় একটি আতঙ্ক বিরাজ করে। এমন কি নিজের ঘরেও তিনি সর্পাতঙ্কে থাকেন। অথচ 'লোকটা মরলো ভাবলাম এবার একটু শান্তি স্বস্তি পাবো।'[১৭] লোকটি অর্থাৎ নেতা যখন সত্যি কথা বলতো তখন সেগুলো আবার ব্যবসায়ীদের পক্ষে যেত না। স্ত্রীর সঙ্গে ফর্হাদের কথোপকথনে বেরিয়ে আসে নিরাপরাধ নেতাকে মিছেমিছে খুনের প্রসঙ্গ :

স্ত্রী : লোকটাকে মিছেমিছি কারা যে খুন করলো।

ফর্হাদ : মিছেমিছি খুন করবে কেনো। কোনো একটা কারণ ছিল। এদিকে শহরের লোকজন যেভাবে ক্ষেপে উঠছিল। ব্যবসা মাটি হয় আর কি। এখন তবু চলছে ভালো।

স্ত্রী : যাই বলো না কেনো। ঘুমের মধ্যে ওভাবে কাউকে মেরে ফেলা।

ফর্হাদ : তা অবশ্য ঠিক।—লোকটা একদিক থেকে তো সত্যি কথাই বলতো। অবশ্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে নয়।[১৮]

mc welqK Mí নাটকে ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি চরিত্র ফর্হাদ, কলিম, শরীফ রকীব প্রমুখ। তারা দেখছেন তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ। নেতার মৃতুতে তাদের বরং লাভই হয়েছে, তাদের ব্যবসার রাস্তা পরিষ্কার। কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আর কেউ মিছিল করতে পারবে না। দেশপ্রেমিক এক নেতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। দেশীয় কারখানা চালু করা এবং বিদেশি পণ্য বর্জন ছিল তাঁর নীতি। এই অন্যায় হত্যা ব্যবসায়ীগণ সমর্থন করেন। ফর্হাদের ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

শরীফ : সিজন পাল্টেছে। এ সময় সাপ খোপ বেরুবে– এমন কি।

ফর্হাদ : কিন্তু বাসার মধ্যে দেখা যাবার পরও নিশ্চিত বসে থাকি কী করে।

রকীব : এ শহরের সব ব্যাপার ভূতুড়ে। সেই যে মিছিল মিটিং এর দিনগুলো থেকে ভাবুন। –কদিন তো ব্যবসা গুটিয়ে প্রায় শিকেয় উঠছিলাম। –হুঁহ– বিদেশী– পণ্য চাই না।

শরীফ : পারলো। বিদেশী পণ্য বিদেয় করো। শেষটায় নিজেই বিদেয় হলেন।

ফর্হাদ : অতোটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়। আমি বলছি– ঠিক এভাবে বলা।

রকীব : বলেন কি। লাইফটা প্রায় হেল করে দিচ্ছিল লোকটা। একদল লোকের হাতে লাঠি সোঁটা দিয়ে জঙ্গি মিছিল করলেই দেশোদ্ধার হয় নাকি।

শরীফ : দেশোদ্ধার লুটপাট নয়। নিজের দেশের কারখানাগুলোর প্রোডাকশন কী কোয়ালিটির সে তো সবারই জানা। –শহরে তো আর সবাই নন এলিট নয় যে বাজে মাল কিনে সন্তুষ্ট হবে। এ্যান্ড উই হ্যাভ এন ওয়েস্টার্ন ক্যাচআপ ট্রেন্ড।[১৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও mc welqK Mí নাটকটি ১৯৭৩ সালে রচিত, কিন্তু এর কাহিনির সঙ্গে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা এবং পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে মিলে যায়। তবে এ নাটকে নাট্যকারের কৃতিত্ব ব্যবসায়ী চরিত্র অঙ্কনে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> সেলিমের সেই রাজনৈতিক সচেতনতা যেমন এ নাটকে ধরা পড়ে, তেমনি ব্যবসায়ীদের শ্রেণী চরিত্র ফুটে ওঠে। নেতার প্রতি যার বিদ্বেষ এবং যার ভালোবাসা রয়েছে, দুজনের কাছে প্রথম কথা হলো বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ। নেতার ভালো মন্দ দুটো দিক, সাধারণ মানুষদের চরিত্রের দোদুল্যমানতা ব্যবসায়ীদের শ্রেণী চরিত্র সবকিছুই খুব সংযত ও সহজভাবে ফুটে উঠেছে নাটকটিতে।[২০]

সেলিম আল দীনের bxj kqZvb: ZwnwZ BZ¨w‘ (১৯৭২) নাটকে একঘেয়ে দীর্ঘ পারিবারিক ও পেশাগত জীবনের ক্লান্তি ও শূন্যতাবোধে আক্রান্ত মিঃ বুর্হনের নৈঃসঙ্গ্য চেতনা রূপায়িত হয়েছে। নাট্যকার সমুদ্রের প্রতীক ব্যবহার করে তার একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে তাকে রক্ষা করেন। জনৈক বৃদ্ধ নাবিকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে, তার কাছ থেকে সমুদ্রভ্রমণ বিষয়ক বইপত্র পড়ে ও আড্ডা দিয়ে মিঃ বুর্হান আক্রান্ত হন সমুদ্রের নেশায়। এক সময় বয়স ভুলে, পেশাগত দায়িত্ব ভুলে তিনি পাড়ি জমাতে চান নীল সমুদ্রে। অতল সমুদ্রের নেশায় তলিয়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করতে আসে নাবিক কন্যা সমীরা। সে ঠাট্টার ছলে মিঃ বুর্হানকে সচেতন করতে চায়। এক সময় মিঃ বুর্হানকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয় সমীরা। অপরদিকে মিঃ বুর্হান সমুদ্রবিষয়ক সব বই সমীরাকে ফেরত দিয়ে কর্পোরেশনের উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করছিল আরেক সমুদ্র ব্লুডেভিল। নাবিক বলেন, সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে ব্লুডেভিল খাওয়ার মতো মজার কিছুই নেই। মিঃ বুর্হান জানতে চান, যারা সমুদ্রে ভাসতে পারে না তাদের কী হবে। নাবিক বলেন, যারা জাহাজ ভাসাতে পারে না তাদেরও খাওয়া উচিত। তাদের গ্লাস ভর্তি হতে থাকে একটু পরপর। সমুদ্রে জাহাজ না ভাসিয়েও যেন নেশার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে যান। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে আকাশের ওপরে ভেসে উঠে শহরের দালানগুলোর ওপর বিশ মন থুতু ছিটাতে চান মিঃ বুর্হান। মূলত একজন কেরানি ছাড়া তিনি আর কিছুই নন। কেরানির জীবন তাকে নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছুই দেয় নি।

সেলিম আল দীন রচিত G·‡cøvwmf I gj mgm¨v (১৯৭৩) নাটকে বলতে গেলে স্বাধীনতা-পরবর্তী সমগ্র বাংলাদেশের নৈরাজ্যের ছবি যেন ভেসে উঠেছে। এখানে নাট্যকার সমকালীন ব্যবসায়ী মহলের নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে কালোবাজারি, খাদ্যে ভেজাল, সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড পর্যন্ত নাট্যঘটনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। একাত্তর-পরবর্তী স্বাধীন দেশে দেশি ও বিদেশি শত্রুদের নানা চক্রান্তে জাতি এক বিভীষিকাময় সময়ের মুখোমুখি হয়। দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা হয়– ‘দিনে-দুপুরে সশস্ত্র ডাকাতি, একই রাতে সত্তর বাড়িতে ডাকাতি, থানা থেকে অস্ত্রলুট, হত্যা, গুপ্তহত্যা, ধর্ষণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পণ্যে ভেজাল, অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল।’[২১] এসব কারণে দেশে যখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি, তখন দেশের মানুষের মনে সঞ্চিত হতাশা ও ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয় প্রতিবাদ। দিনে দিনে এদেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য তৈরি হয়। সমাজের নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত ও হতাশায়

নিমজ্জিত হয়। দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও নৈতিক স্খলন। G·‡cøwmf I gj mgm¨v নাটকের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণহীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, হত্যা, মজুদদারি, চুয়াত্তরের বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকাররা নাটক রচনায় মনোযোগী হন। এ পর্যায়ে সমকালীন নাগরিক সমাজের কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য ও ভেজালকে ব্যঙ্গ করে সেলিম আল দীন রচনা করেন 'এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা'।[২২]

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নাগরিক জীবনের সমস্যা তৎকালীন নাটকগুলিতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সেলিম আল দীনের G·‡Kwmf I gj mgm¨v নাটকটি বাহাত্তরের কালোবাজারি আর ভেজালকে ব্যঙ্গ করে রচিত। নাটকের কাহিনি বেশ হাস্যকর। কয়েকজন পুরুষ মিলে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনায় বিশাল একটি বিস্ফোরণ ঘটাতে চায় ক্ষমতাধরের প্রতীক এক মহিলাকে ধ্বংস করার জন্য। তাদের পরিকল্পনা ও পরিশ্রম বিস্ফোরণ ঘটবার আগ মুহূর্তে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। কেননা শেষে দেখা গেল এক্সক্লোসিভগুলো খাঁটি নয়। দোকানদার বা কালোবাজারি এক্সপ্লোসিভের পরিবর্তে কতকগুলো মিল্ক পাউডার দিয়েছিল। বাহাত্তরে এভাবেই বাজারে সবাই ঠকেছিল আর কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল। নাটকে তারই চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। G·‡cøwmf I gj mgm¨v নাটকে মূলত ব্যঙ্গ করেছেন ভেজালকারীদের। তাদের দৌরাত্ম্য ও লোভ এতই বেশি যে, খাদ্যসহ সকল পণ্যে এমন কি বোমা তৈরির এক্সপ্লোসিভে পর্যন্ত তারা ভেজাল দিচ্ছে। যেমন :

মুনির	:	সেই কালোবাজারির কাছে আমি গিয়েছিলাম। সে জন্যে দেরি হয়ে গেলো। আর তাড়াতাড়ি এলেই বা কি।
হামিদ	:	আপনি পাগল হয়ে গেছেন। সরে আসুন।
মুনির	:	না বোমা কখনো ব্লাস্ট হবে না।
রকিব	:	সেকি?
নবী	:	সেকি?
মুনির	:	আন্ডার গ্রাউন্ডের লোকটা বললো– এক্সপ্লোসিভগুলো খাঁটি নয়। ড্যাম্প।
ফারুক	:	তীব্র চিৎকার করে মুনিরের কলার ধরে– মুনির।
হামিদ	:	সেকি?
মুনির	:	এই মাত্র পরীক্ষা করে দেখলাম।

রফিক : কাঁধে ঝাঁকুনী দিয়ে- ঠাট্টা করছিস।

মুনির : সহসা তীব্র কণ্ঠে বিশ্বাস হয় না। সে দ্রুত বোমার খোল খুলে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো পাউডার বের করে আনে দেখতে চাস। যেনো আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। যেনো– আমি চিৎকার করে উঠিনি। ঠাট্টা করছি আমি।[২৩]

সুন্দরবন বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের দক্ষিণে রয়েছে সুবিশাল বনভূমি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়াও সুন্দরবন হাজার হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস। সেলিম আল দীনের Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gL †'Lv নাটকের পটভূমি সুন্দরবনের মৌয়ালদের জীবনের দুঃখগাঁথা। এই নাটকে প্রথম নাট্যকার গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের চিত্র রূপায়িত করেছেন। নাটকের মৌয়াল করিম বাওয়ালী ও তার স্ত্রী পাবদা হতদরিদ্র, অভাব অনটনে কেটে যায় তাদের দিন। মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে চলে তার সংসার। দিনমজুর বাওয়ালীর জীবিকা নির্বাহের উপায় ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কারণ এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তি সুন্দরবনের বৃক্ষ নিধন করছে। বনে গাছ-পালা না থাকলে প্রান্তিক বাওয়ালীর বেঁচে থাকার অবলম্বন শেষ হয়ে যাবে, অন্য দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হারিয়ে পরিবেশও হুমকির সম্মুখীন হবে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ ও জাতি। সহায়-সম্বলহীন করিম ও তার পরিবার বেঁচে ছিল প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। যখন প্রকৃতি উজাড় হচ্ছে তখন প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। সেলিম আল দীন Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gL †'Lv নাটকে জীবনবাস্তবতার এক কঠিন রূপ বিনির্মাণ করেন। সুন্দরবনের বাওয়ালীদের নিরন্ন জীবনের লড়াই-সংগ্রাম চলে অবিরত। তাদের অস্ত্র-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোনো সুযোগ নেই। দুঃসাহসী এসব বাওয়ালীরা সুন্দরবনের গহিনে প্রবেশ করে বাঘের ভয় উপেক্ষা করে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে প্রতিটি মুহূর্ত তাদের জন্য ভয়ঙ্কর ঝুঁকিপূর্ণ। অনেকে এই পেশা ছেড়ে শহরে চলে গেছে, কিন্তু করিম বাওয়ালী যায় নি, পৈতৃক পেশাকে ঐতিহ্যরূপে ধরে রাখতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বপুরুষের পেশা সংরক্ষণ করাকে নৈতিক দায়িত্ব মনে করে বলেই গাঁয়ের অন্যান্য বাওয়ালীদের মতো কারখানায় শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার দারিদ্র্যদশার সঙ্গে আছে জীবিকার অনিশ্চয়তা। তবুও সে বাপ-দাদার চৌদ্দ পুরুষের এই পেশা না ছাড়ার অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। করিম বাওয়ালী ও মনু বাওয়ালীর আলাপে ফুটে ওঠে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্টির কারণ :

মনু : সায়েবরা। হরিণ মারতি আইছিল।

করিম : ই শালারাই খাইলো। –ই শালাদের জন্যি। বও বও। কই যে ই শালাদের জন্যি বনে অলক্ষি।

মনু : খাঁটি কথা।

করিম : সোন্দরিগাছ মরে-মানুষ মরে-হরিণ মরে।

মনু : কিছুই না জোয়ান জোয়ান পোলাগুলীন বন ছাড়ে। –শহরে যায়। থাকে কি।

করিম : থু শহরের মুখে। বনবিবির ভরসা পাই মনে। গাছ মরে য্যান মনের সুখে।[২৪]

নাট্যকার নাটকে বাওয়ালী সম্প্রদায়ের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার তুলে ধরেছেন। এছাড়া বাওয়ালীদের মহাজন কর্তৃক শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন। করিম বাওয়ালীর দৈনিক যা উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার নির্বাহ হয় না, ফলে জঠরজ্বালা নিভাতে সে মহাজনের নিকট পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত এক বিঘা জমি বন্ধক রাখে। মহাজনের ঋণে জর্জরিত বাওয়ালী দিশেহারা। মহাজন যখন তার শেষ সম্বল পৈতৃক এক বিঘা জমি কেড়ে নিতে চায়, তখন বাওয়ালী ক্ষেপে ওঠে :

মহাজন : দরকারের সাঁঝ নাই সকালও নাই। পাওনা মিটাও।

করিম : দ্যাখো মহাজন– তোমার টাকার লাইগ্যা বহুত পেরেশান আছি। আইজ সারাদিন কাম মেলে নাই।

মহাজন : চিৎকার ছো ছো। ইসব গীত গল্প ছাড়– কদ্দিন ঘুরতিছি মনে লয় না। আইজ ইটা কাইল উইটা টাকা ফালা। না অয় যা মনে লয় তাই করমু।

করিম : খ্যাপো ক্যান মহাজন। উদিককার আবাদী জমিটাতো তোমার লাইগা রাখছি- একবিঘা বাপের দিন্যা জমি।

মহাজন : নিয়া নেও। তোমার লাইগ্যা রাখছি। ই কইলে তো সব চুকে না। সাফ কবলা কর।

করিম : কর– যেদিন তোমার খুশী।

মহাজন : আমার খুশী হুঁহ।

করিম : তোমার পাওনা শোধ হলি রূপসার পানিতে গোসল করমু। বুঝছো। বোঝো নাই। রূপসার পানিতে।

মহাজন : রাগ দেখাস বাওয়ালী আমি রহমত মহাজন। তুই রাগ দেখাস। আমার নাম।

করিম : হ হ। তোমার নাম। তোমার নাম শুনলি মানুষ খোদার নাম ভুলে।

মহাজন : থাক– থাক। অতো খিতাব গাতি হবি না। কাইল শেষ দিন মনে থাকে য্যান।

করিম : এখন যাও– কাইলের কথা কাইল। যাও।

মহাজন : ইজ্জত রাইখ্যা কথা ক।

করিম : কইতাছি এখন যাও– ভাইগ্যা যাও। নইলে। যাও। যাও জানোয়ারের জন্ম।[২৫]

করিম সুদখোর মহাজনকে বল্লম হাতে নিয়ে তাড়া করে আর মহাজন হতভম্ব ও ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। করিম তার শত্রুকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু কিছু করতে পারে নি। নাট্যকার সমাজের শ্রেণিশত্রুকে চিহ্নিত করেছেন। জীবনের নির্মম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিকারগ্রস্ত বাওয়ালীও এক পর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। স্বাধীনতার পর শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের যে অঙ্গীকার জনগণের মধ্যে বিরাজমান ছিল মূলত তারই আন্তর্গরজে নাট্যকার নির্মাণ করেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার উপাখ্যান। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> সেলিম আল দীনের একাধিক নাটকে চিত্রিত হয়েছে শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের ছবি। তাঁর নাটকে প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছে শ্রমজীবী আতর আলী আর করিম বাওয়ালীরা। 'করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা' (১৯৭৩) একাঙ্কিকায় সুন্দরবনের করিম বাওয়ালী শ্রেণীচেতনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে মহাজনের বিরুদ্ধে।[২৬]

সেলিম আল দীনের gbZvwmi (১৯৭৪) নাটকটির নাম প্রথম ছিল–gbZvwmi d"v›Uvwm। তিনি পরবর্তীতে ইংরেজি 'ফ্যান্টাসি' শব্দটি বাদ দিয়ে এর নামকরণ করেন gbZvwmi। গান ও হাস্য-কৌতুকনির্ভর মিউজিক্যাল কমেডি gbZvwmi নাট্যকারের অন্যতম একটি শিল্পসফল সৃষ্টি। বক্তব্যের গভীরতায় নাটকটি ব্যাপকভাবে দর্শকনন্দিত হয়। তাঁর msev' KvUb নাটকের মতো এ নাটকের পটভূমি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ। এর নায়ক চরিত্র মুনতাসির। মুনতাসির মস্ত বড় শিল্পপতি। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে তিনি দুটি ছোটখাট লজেন্স ও শিশুতোষ খেলনা তৈরির কারখানার মালিক ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি অতি অল্পদিনে বিশাল শিল্পপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। স্বাধীনতার পর প্রায় সকল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। এই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতই এই বিত্তবান তৈরির অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হলো। দ্রুত সম্পদ অর্জনের পথ ছিল তখন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা, ব্যাংক-বীমা থেকে লুটপাট, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যের পারমিট লাইসেন্স জোগাড় এবং অবৈধ বাণিজ্য-চোরাচালান, কালোবাজারির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। অথচ একাত্তরে এদেশের মানুষ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এই ধরনের শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক

হলেও সত্য যে, সেই স্বাধীন দেশে কলকারখানায় শোষণের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণ। বুর্জোয়াগোষ্ঠী মালিকশ্রেণি শোষণ আর লুণ্ঠন করে সমগ্র দেশকে গিলে খেতে চায়। এদের অন্তহীন ক্ষুধা। ফলে স্বাধীন দেশের কলকারখানায় আবার শুরু হয় শ্রমিক অসন্তোষ। বাংলাদেশে তখন বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক-আন্দোলন প্রকট আকার ধারণ করে। নাটকের শুরুতে নৃত্যের তালে তালে তিনজন প্লাকার্ডধারী সঙ নিম্নোক্ত কথাগুলি বহন করে নিয়ে যায়:

১. তুমুল শ্রমিক আন্দোলনের মুখে
   পাঁচদিন উন্নিদ্র থেকে
২. ক্রুদ্ধ শিল্পপতি জনাব মুনতাসির
   খুব ভোরে চিৎকার করে বললেন
৩. ইতিহাস ও হাঙরের
   দাঁতে শপথ
   আমি আজ সব কিছু খাবো।[২৭]

মুনতাসিরের খাই খাই রোগ হয়েছে। তিনি একের পর এক সব কিছুই খেতে থাকেন। তার এক হাতে থাকে খাবারের থালা অন্য হাতে ফাইল। তিনি ফল ও চকলেটের সঙ্গে জরুরি লেখা ফাইলকেও সুস্বাদু বলে ছিঁড়ে খেতে থাকেন। টেবিল ভর্তি খাবার মাটন, সাগর কলা সব খেয়ে ফেলেন। খাওয়ার রোগ সারাতে ডাক্তার এলে তিনি চিবিয়ে ফেলেন থার্মোমিটার। ডাক্তার জানান, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। তিনি একা পেলে তার কর্মচারীকেও কামড়ে ধরেন, মহিলা স্টেনোকে একা পেয়ে তার মনে হয় সুগন্ধি বাদামী রঙের ব্রেড। তার সব কিছুকেই সুস্বাদু খাবার মনে হয়। এমন কি মুনতাসির স্টেনোর হাত থেকে দশহাতি লম্বা একটি জামদানি ছিনিয়ে নিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। তার স্ত্রী জানান, মুনতাসির খায় কিন্তু হজম করতে পারে না। তার স্বভাব খাওয়া ও নাক ডেকে ঘুমানো। এদিকে কারখানার শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনার দাবিতে আন্দোলন করছে। তাদের মজুরি না দিয়ে বরং মুনতাসির তাদের ছাঁটাই করছেন। ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ঘেরাও কর্মসূচি দিলে পরিবেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। মুনতাসিরের অফিসের কর্মচারীরাও আর্থিক দীনতায় বিপর্যস্ত, কিন্তু তারা চাকরি হারানোর ভয়ে কিছু বলে না। তারপরও দরিদ্র ও বঞ্চিত টাইপিস্টের কণ্ঠে হাস্য-কৌতুক উচ্চারিত হয় :

আহা হা কি কথা–
আমরা আর্ত-বড় ক্ষুধার্ত
দেব হুজুর কি জয়– বোল।

মেলে যদি মুরগীর ঝোল–
সখা হে মুরগী খাব না ॥[২৮]

মুনতাসিরের কারখানার শোষিত বঞ্চিত শ্রমিকরা তাদের দাবি পূরণ করতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। বেগবান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানায়, আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে :

হাহ হা হাহ হা হাহ হা
কারখানার আজ বারোটা।
বেতন বাড়াও সরে দাঁড়াও
সক্কলে চাই ডিম পরোটা।[২৯]

শ্রমিক আন্দোলন থেকে পুলিশ তিরিশজন শ্রমিককে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ে শ্রমিকরা। তাদের আক্রমণের ভয়ে ভীত শিল্পপতির বিশ্বস্ত প্রতিনিধি প্রোডাকশন ম্যানেজার। এদিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত সর্বভুক মুনতাসির যেভাবে সব কিছু খাওয়া শুরু করেছে আর তার শরীর বাড়ছে ফলে কোনো জামাই আর গায়ে লাগছে না। ফলে আসে দুজন দর্জি। আশ্চর্য ব্যাপার হলো দর্জিরা মুনতাসিরের পেট মাপে আর ধীরে ধীরে তার পেট বাড়তে থাকে। দর্জি পেটের পরিধির মাপতে গেলে মুনতাসির তার হাত থেকে গজ ফিতাটি কেড়ে নেয় এবং চিবুতে থাকে। এরপর শোকেস থেকে একটি এন্টিক বা পেইন্টিং তুলে নিয়ে একটু চেখে সেটিও খেতে শুরু করে। এ পর্যায়ে তার মহিলা সহকারী বলছে :

হাজার টাকার দামি এন্টিক
খেয়ে ফেলেন যেমন বিস্কিট
এমনি করে খেতে থাকলে
কি হবে উপায় রে– কি হবে উপায়।
না খেয়ে লোক মরে শুনি–
খেয়েও প্রাণ যার রে।[৩০]

মুনতাসির এন্টিক খাওয়া শুরু করলে কারখানার কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। তারপর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার জন্য স্পেশাল মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। রোগীর পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করা জরুরি কেননা মিঃ মুনতাসির মাল্টিমিলিওনার। তাছাড়া তিনি একজন জাতীয়তাবাদী নেতা, এ শহরের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। ফলে ডাক্তার শিল্পপতি মুনতাসিরের

মুক্তিযুদ্ধোত্তর অসুখের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধপূর্ব ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস জেনে মেডিক্যাল বোর্ডকে অবহিত করেন– 'বাঙালি জাতির ইতিহাসে ইনিই সেই বিশ্রুত ব্যক্তি যাঁর রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁর ব্যাংক ব্যালেন্সের অঙ্কের মতই বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পরিপূর্ণ।'[৩১] ডাক্তার আরও জানতে পারেন যে, স্বাধীনতার সামান্য কয়েকদিন পূর্বে পয়লা ডিসেম্বর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হন এবং একটানা ষোলো দিন বন্দি ছিলেন। তাই ডাক্তার মনে করেন, 'তার এই যেমন– এপেটাইট অসুখটির সূত্রপাত তখন থেকে। কারণ এই ষোল দিন তিনি খাদ্যদ্রব্য বলতে আমরা যা বুঝি তার কিছুই পাননি খেতে।'[৩২] অবশেষে মুনতাসিরের অপারেশন করেন ডাক্তার। যদিও অপারেশন শেষে তার মৃত্যু হয়। তবে তার ম্যানেজারের ভাষণ থেকে জানা যায়, মুনতাসিরের পেট থেকে পাওয়া যায় নি এমন প্রায় কিছুই নেই। নাট্যকার ব্যঙ্গ কৌতুকের মধ্য দিয়ে এখানে মূলত বুর্জোয়া চরিত্রের ক্ষুধার চিত্র মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

> বন্ধুগণ– জনাব মুনতাসিরের পেট থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য দ্রব্য সরকারি ট্রাকে বোঝাই করে আমরা জাতীয় যাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিছু কিছু মূল্যবান জিনিস– যেমন পুঁথি সাহিত্য- শাসনতন্ত্র– এন্টিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে পাঠানো হয়েছে। সত্যি বলতে কি আজ বাংলা ইংরেজি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ফিজিক্স ইতিহাস– বিভাগে এসেছে গবেষণার তুমুল জোয়ার। হয়তো এতে এক ঘেঁয়ে বিষয়ের ওপর গজিয়ে উঠবে অসংখ্য ডক্টরেট- তবুও এটা আশার কথা। অন্তত এই একটি বিষয়ে জাতি হবে স্বনির্ভর।[৩৩]

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এমন এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দেশের মানুষের মনে সঞ্চিত হতাশা ও ক্রোধ পরিণত হয় প্রতিবাদে। তারা শোষক শ্রেণির শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নব্য বুর্জোয়া গোষ্ঠীর শোষণ ও লুণ্ঠনের চিত্র gbZwmi নাটক। এ নাটকে মুনতাসিরের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে। শুধু মুনতাসিরই নয়, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে ও পরে এমন অনেক ব্যক্তিই আছে যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফায়দা লুটেছে এবং শোষণের মাধ্যমে অল্প সময়ে বড় শিল্পপতি বনে গেছে। 'বুর্জোয়া রাজ্যের খিদে তো মুনাফার খিদে যা কখনো মেটে না। নাট্যকার এ নাটকের মধ্য দিয়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন কিনা, নাটকে সেটা পুরোপুরি বর্ণিত না হলেও মানুষের লোভ, অফুরন্ত চাহিদার ছবিটা নাটকের মধ্য দিয়ে ঠিকই ধরা পড়ে।'[৩৪] নাট্যকার মূলত রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে যারা রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, তাদের ব্যঙ্গ কার্টুন এঁকেছেন। gbZwmi নাটকের বিষয়ভাবনায়

ও পরিবেশনরীতিতে অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব রয়েছে। "বিচ্ছেদের শোক, উচ্ছেদের কষ্ট ও সংস্কৃতির কাজ"– শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী gbZwmi প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন এভাবে :

> 'মুনতাসির' নাটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ যেমন তীব্র তেমনি উপভোগ্য মুনতাসিরের অসম্ভব ক্ষুধা। তার চরিত্র জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের। মুনতাসিরের পেটের ভিতর রয়েছে মেয়েদের অন্তর্বাস থেকে শুরু করে পাহাড়পুরের এন্টিক, পুঁথি সাহিত্য, শাসনতন্ত্র সবকিছু। এটা একটা পর্যায় ছিল কিন্তু সেলিমের তো এখানে সীমাবদ্ধ থাকবার কথা নয়। তিনি আরো বড় জীবনের কাছে যাবেন এবং যাবার প্রয়োজনে নাটকের প্রচলিত ফর্ম ভেঙে ফেলবেন, নাটকের ভেতর উপন্যাসকে নিয়ে আসবেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে নাটক হচ্ছে গণতান্ত্রিক, কিন্তু উপন্যাস তার চেয়েও অধিক, উপন্যাস সমাজতান্ত্রিক। এক্ষেত্রে উপন্যাস ও মহাকাব্য সমগোত্রীয়। সমাজতান্ত্রিকতাটা সত্য এই দিক থেকে যে সেখানে গোটা সমাজ চলে আসে, নাটকের ফর্মের ভেতর যার স্থান সঙ্কুলান সহজ নয়। সেলিমের পক্ষে এই অগ্রগমনটা অনিবার্য ছিল, কেননা নাটক তাঁর কাছে জীবনের বিকল্প ছিল না ঠিকই, কিন্তু অবশ্যই জীবনের অংশ ছিল এবং বড় একটা সামাজিক জীবনের দিকে তিনি যাচ্ছিলেন। এই যে ফর্ম ভেঙে ফেলা এটা অপরিহার্য ছিল, ওই জীবনের দিকে যাবার প্রয়োজনেই।[৩৫]

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নাটক হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ। স্বাধীনতার মূলচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তরগরজে নাট্যকাররা নতুন উদ্যমে এগিয়ে এলেন। এরই ফলে নাটকে এলো এদেশের মানুষের সুখ-দঃখ, হাসি-কান্না আর পাওয়া না পাওয়া ইতিবৃত্ত। সমাজসচেতন নাট্যকাররা নাটকে সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ঘটনাবলিকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে নানা সমস্যা ও সংকট আর যাঁদের নাটকে ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮)। তাঁর mePb wbevm‡b (১৯৭৪) নাটকটি সমকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত বিপন্ন সমাজ ব্যবস্থার পটভূমিতে নির্মিত। ১৯৭৪ সালের বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় শেখ আকরাম আলী রচনা করেন j\k ÒÕ74 (১৯৭৪)। নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ থেকে এ নাটকের চরিত্র সংগ্রহ করেছেন। এর নাট্যকাহিনিতে প্রাধান্য পেয়েছে বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধার অর্থ আত্মসাৎ করে রাতারাতি ধনের পাহাড় গড়ে তোলার প্রসঙ্গ। অসৎ অভিপ্রায়ে তারা হাত মেলায় স্বাধীনতা-বিরোধী দুর্বৃত্তের সঙ্গে। আবদুল্লাহ আল মামুনের আরেকটি নাটক Pvi‡'K h× স্বাধীনতা-উত্তরকালে সর্বব্যাপ্ত সামাজিক নৈরাজ্যের পটভূমিতে রচিত। স্বাধীনতার পর বিপন্ন সমাজে তরুণদের মধ্যে দেখা দেয় হতাশা এবং সৃষ্টি হয় ক্ষোভ, প্রতিবাদ আর সংগ্রাম। এবার শুরু হয় তাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধ, টিকে থাকার যুদ্ধ। সকল প্রকার অনিয়ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, লোভ-প্রতারণা ও

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ লিপ্সার বিরুদ্ধে যুদ্ধ Pvi‡K h× নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। ১৯৭৫ সালে মমতাজ উদ্দিন আহমদ (জ. ১৯৩৫) লিখলেন nwiY wPZv wPj নাটকটি। হত্যা, ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার পালাবদলের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী বিরাজ করছিল এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। তৎকালের রাজনীতির অবক্ষয়িত ছবিটি নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় বীরাঙ্গনাদের দুর্দশার চিত্র নিয়ে তাঁর Kx Pvn k•Lwj (১৯৭৯) নাটক। নাট্যকার মামুনুর রশীদ (জ. ১৯১৮) রচিত Iiv K‘g Avjx (১৯৭৯) নাটকে শোষকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী শোষিত মানুষের ঐক্য ও প্রতিরোধ চিত্র গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রেণি-সংগ্রামের চেতনানির্ভর তাঁর আরেকটি নাটক Iiv Av‡Q e‡jB (১৯৭৯)। স্বাধীনতা-পরবর্তী একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার জীবন-যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ রচনা করেন wKsïK †h gi‰Z (১৯৭৪)। আল মনসুরের †n RbZv Avi GKevi (১৯৭৩) নাটকে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরের সময়টা চিহ্নিত হয়েছে। এ নাটকের মূল বিষয় স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ব্যবহার করে এক শ্রেণির দুর্বৃত্ত যুবক মুক্তিযুদ্ধের নকল সনদ সংগ্রহ করে অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী এক চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে মারাত্মক ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়। নাট্যকার সাঈদ আহমদের cwZ‘b GKw‘b (১৯৭৮) নাটকে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলার সর্বব্যাপ্ত সামাজিক সংকট; দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা ও কতিপয় বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধার বিপথগামিতা ও স্বার্থপরতার চিত্র নাট্যকার অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। উল্লিখিত নাটকগুলিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানান ছবি উদ্ভাসিত। তাই স্পষ্টতই বলা যায়, স্বাধীনতার পর সমাজবাস্তবতা বিহীন বিষয়বস্তু নাটক থেকে নির্বাসিত হলো। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাটক বিষয়-গৌরবে দীপ্যমান। এ প্রসঙ্গ সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> যে বিষয়বস্তু নিয়ে আগেকার নাটকগুলো রচিত হতো, সে সব বিষয় ৭১-পরবর্তী নাট্যকর্মী দর্শকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হলো না। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল নতুন নাট্য রচনার। আগেকার নাটকের সাথে এই নাটকের প্রধান পার্থক্য হল— নাটকে এখন একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য এল। বক্তব্য ছাড়া কোন নাটক আজকের নাট্যকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হলো না। বেশির ভাগ নাটক রচিত হলো সমকালীন সমাজ নিয়ে। সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা-বঞ্চনা, আনন্দ-উল্লাসকে উপজীব্য করে নাটক রচিত হলো। নাট্যকাররা তাদের রচনার সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিলেন।[৩৬]

বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল পাট। পাট চাষি কৃষক সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ও তাদের ওপর মহাজনের শোষণ বঞ্চনার কাহিনি নিয়ে সেলিম আল দীন রচনা করেন AvZi Avjx‡'i bxjvf cvU (১৯৭৫)। বাংলার জনপদের কৃষকেরা মহাজন, ফড়িয়া, মধ্যস্বত্বভোগী দালাল দ্বারা চিরকাল শোষণের শিকার হয়েছে। দরিদ্র কৃষকেরা জীবন-জীবিকার স্বার্থে মহাজনের কাছ থেকে দাদন গ্রহণ করে। ফলে মহাজনের ঋণের টাকা সুদসহ পরিশোধ করতে হয় মহাজনেরই নির্ধারিত মূল্যে পাট বিক্রি করে। এছাড়া দরিদ্র নিম্নবর্গের চাষিরা বাধ্য হয় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে মহাজনের কাছে পাট বিক্রি করতে। ফলে প্রান্তিক চাষিরা তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আতর আলীর মতো বহু কৃষক এভাবে বঞ্চিত হয় আর লাভবান হয় মধ্যস্বত্বভোগীরা। পাট বিক্রিকে কেন্দ্র করে আতর আলীর সঙ্গে নীলগঞ্জের মহাজনের কর্মচারী মুনশীর বিবাদ ঘটে। পাট কাটতে গিয়ে আতর আলীর ডান হাতের আঙ্গুল কেটে যায়। বিনা চিকিৎসায় তার আঙ্গুলে পচন ধরে, খাদ্য ও পথ্যের অভাবে ক্রমে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবুও আতর আলী শেষপর্যন্ত মহাজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যায়।

AvZi Avjx‡'i bxjvf cvU নাটকের প্রেক্ষাপট কৃষক শ্রেণির প্রতি মধ্যস্বত্বভোগীদের পীড়ন, জুলুম ও অত্যাচার। এক কালে বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল সোনালি আঁশ পাট নিয়েও চলত নানান ষড়যন্ত্র। মুনাফা অর্জনের জন্য মহাজন ফড়িয়া বা মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি কৃষকদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়াও জোরজুলুম, বল প্রয়োগ করত। নাটকে শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণির শ্রমে উৎপন্ন পাট মহাজনের নিকট কম মূল্যে বিক্রির জন্য মহাজন নির্ধারিত মধ্যস্বত্বভোগী মুনশী গ্রামে আসে। সকল কৃষককে সে নানা ছলনায় ভোলায়, গ্রামের মাতব্বর তার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। চাষিরা সরকারি নির্ধারিত মূল্যে খোলাবাজারে পাট বিক্রি করতে চায়। অপরদিকে মুনশী তার নির্ধারিত মূল্যে মহাজনের গদিতে পাট বিক্রির জন্য অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ করতে থাকে। যেমন :

মুনশী : সকালে গেলে নাই– বিকালে গেলে নাই এতো ভেলকী জানো। এখন কও দিকি– কাইল সকালে মালটা দিবা কি না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : মহাজনের কাছে পাট বেচুম না।

মুনশী : গোস্বা করতিছো। হে হে ভালো মহাজনেরে না দেও– কারে দিবা।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ : সরকারের কাছে বেচুম।

মুনশী : বেচো বেচো– পারলে বেচো না। তয় পাট হতিছে তোমার– তুমি যেমন

বেচো– যখন বেচো কিন্তুক তোমার সব পাট মহাজনেরে কাইলই যে বেচতি হবি। হে হে আতর– আতর।[৩৭]

আতর আলী মরণব্যাধিতে আক্রান্ত। মৃত্যুপথযাত্রী আতর আলীর প্রতি তার স্ত্রীর অবহেলা সকলকে তার প্রতি সহমর্মী করে তোলে। তার চিকিৎসা ও পথ্যের যেমন অভাব তেমনি তার স্ত্রীর পরিচর্যাটুকু পর্যন্ত ভাগ্যে জোটে নি। প্রতিবেশী তার গরু বিক্রির জন্য পীড়াপীড়ি করে। দাওয়ায় সাদা ধবধবে স্তূপীকৃত পাট আতর আলীর চোখে নীলাভ স্বপ্ন হয়ে দোলে। মৃত্যুশয্যায় মুনশী আসে মহাজনের নিকট পাট বিক্রির করতে বাধ্য করার জন্য; কিন্তু আতর রাজি হয় না। মুনশীকে সে বলে পাট না দিলে যদি না খেয়ে মরতে হয় মরবে–তবু মহাজনকে পাট দিবে না। তার অন্তরের আকুতি বেরিয়ে আসে– 'পাট দিতি মন চায় না। তবু পাট নিয়ে যায় মহাজন।'[৩৮] গ্রামের কৃষকগণ সংগঠিত হয়ে মহাজনের নিকট কম মূল্যে পাট বিক্রি না করার জন্য অঙ্গীকার করে। এ সময় গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বর মুনশীর সঙ্গে যোগ দেয়। গ্রামের কৃষকরা শ্রেণিশত্রু খতম করার পরিকল্পনা করে :

প্রথম পৌঢ় : মুনশী কয় জমিনে থাকলি পাট তোমার তুললি পরে মহাজনের। এর মধ্যে সরকার নাই– তুমিও নাই-কছিম ভাই। কই– কি হাল তোমার।

দ্বিতীয় পৌঢ় : ই বছর মহাজনের কাছে পাট বেচুম না। –হৈ আতর।

প্রথম পৌঢ় : মগের মুলুক পাইছে– দাম যাচাই করতি দেয় না– রাতা রাইতি পাট কিন্যা নেয়। মুনশী আসলি পরে– উর মাথা দাও দিয়া ভাগ কইরা দিমু। আইজ রাইতে– বুজছো।[৩৯]

নাটকে ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের পরিকল্পনা সফল হবার পূর্বেই মুনশীর ভাড়াটে লোকদের হাতে আহত হয় কয়েকজন কৃষক। নাট্যকার এখানে সমাজের শ্রেণির শোষণ ও অভ্যন্তরীণ দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে তুলে ধরেন। মধ্যস্বত্বভোগী মুনশীর হাত থেকে পাট যায় মহাজনের গুদামে এবং মহাজন থেকে সরকারের কাছে। ফলে উৎপাদনকারী কৃষক তার পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। নাটকের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় পাটের স্তূপের উপর আতর আলীর মৃতদেহ পড়ে আছে। আর সেই পাট ছলে-বলে কৌশলে শোষণকারী ক্ষমতাবান মুনশী নিয়ে যায় :

আগন্তুক : –আতর– হৈ আতর। –ঘুমাতিছোস এখনও ঘুমাতিছোস।

মুনশী : উর বিমার। –হেঁ হেঁ ক্ষতিটা কি। দাম তো কমবি না পাটের। যেই দাম কেনে মহাজন সেই দাম দাবি।

আগন্তুক : গন্ধ টের পাই হুজুর– বদ গন্ধ। আঁই মালিক– আতর না ইটা।

মুনশী : কি করতেছে। পাট পাহারা দেয়। পাট পাহারা দেয়।

আগন্তুক : আঁই– গন্ধ হুজুর– ওয়াক থু।

মুনশী : আল্লা মালিক। অর মউত হইছে। ইন্নালিল্লাহ পড়ছোস।

আগন্তুক : না হুজুর।

মুনশী : পড়।

আগন্তুক : কিন্তুক হুজুর গন্ধে পেটের ভাত মাথায় উঠতি চায়।

মুনশী : আরে বেওকুফ। –আমরা পাট কিনতি আইছি। –হ আতরের নয় গন্ধ– কিন্তুক পাটতো গন্ধ না।

আগন্তুক : কিন্তুক হুজুর। –মুসিবত দেখি। ই লাশ রাখি কই। –পাট নিমু না লাশ।

মুনশী : দশমন– ধইরা হিসাব হতিছে– সে হিসাব করে মনে মনে– এ্যাঁ-কি কইলি পাট না লাশ– লাশ না পাট।[৪০]

সেলিম আল দীনের পথনাটক Pi KvKov। নাটকের প্রথম নাম ছিল Pi KvKovi WK¨‡g›Uwi। নাট্যকার পরবর্তীতে নাটকের নাম থেকে WK¨‡g›Uwi শব্দটি বাদ দিয়েছেন। বাংলাদেশে ১৯৭৭ সাল থেকে প্রথম নিয়মিতভাবে পথনাটক প্রদর্শনী শুরু হয়। 'নাচাও রাস্তা নাচাও'-এ শ্লোগান দিয়ে পথনাটকের বিকাশের পথে যাত্রা শুরু হয়। Pi KvKov নাটকের শুরুতে অনুরূপ শ্লোগান ছিল। সমসাময়িক নানা ঘটনাবলি নিয়ে তখন পথনাটক তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়। স্বাধীনতার পর নতুন ভাবে নাটক ও মঞ্চ নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। এরই মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে পথনাটকের ধারণা। পথনাটক সড়ক দ্বীপে মঞ্চস্থ হতো। সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব দ্রুতই এ প্রক্রিয়ায় নাটকের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। পথনাটকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> নাট্যচর্চায় সমকালীন রাজনৈতিক সচেতনতার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটেছে পথ নাটকে। যদিও শৈল্পিক বিচারে এসব নাটকের অধিকাংশই মোটা দাগে আঁকা, তবুও এ নাটকগুলোর গুরুত্ব এ কারণেই যে, নাট্যদলসমূহ তাদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিল, তাদের আদর্শগত বিশ্বাস কাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং চেয়েছিল নাটক সত্যিকার অর্থে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত হোক।[৪১]

বাংলাদেশের সমুদ্র ও সামদ্রিক জীবন নিয়ে নাটক Pi KvKov। এ নাটকে নাট্যকার দক্ষিণাঞ্চলের সংগ্রামী মানুষের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের প্রধান চরিত্র জব্বারের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

সেটি স্পষ্ট হয়েছে। মূলত স্মৃতির মধ্য দিয়ে সে ঘূর্ণিঝড়ের বিবরণ দেয়। সেলিম আল দীন একেবারে অভিনব পদ্ধতিতে এ নাটকের বিষয়বস্তু দর্শক সম্মুখে এনেছেন। খোলা আকশের নিচে ক্রমাগত ঢোলের বাদ্য শুনে লোকজন জড়ো হয়েছে। অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত স্থানটির তিনদিক খোলা। প্রেক্ষাপটে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র। জলোচ্ছ্বাসের ভেতর থেকে একটি বিশাল ও লবণাক্ত হাত স্থলভাগের মাটি আঁকড়ে ধরেছে। এছাড়াও আছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রামাণ্য ছবি ও তদ্‌সংক্রান্ত ছাপানো খবর। দুজন সাংবাদিক দর্শকদের মধ্য থেকে কথা বলে ওঠে। তাদের একজনের কাঁধে ক্যামেরা, তারা সেমিনারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এখানে কোনো সেমিনার নয়, হবে নাটক।

প্রথম সাংবাদিক। এই যে, ভাই-এখানে কী নাটক হবে।

একজন : হ্যাঁ ভাই নাটক হবে।

দ্বিতীয় সাংবাদিক : কী নাটক।

একজন : চর কাঁকড়া

প্রথম সাংবাদিক : কার লেখা

একজন : সেলিম আল দীনের

দ্বিতীয় সাংবাদিক: এ নাম তো কখনো শুনিনি ভাই। হালে গজিয়েছে মনে হয়। করছে কারা।

প্রথম সাংবাদিক: করছে কারা। ওই যে-

একজন : তাইতো প্লাকার্ডেই লেখা আছে। ঢাকা থিয়েটার।[৪২]

PiKvKov নাটকের পাণ্ডুলিপি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাট্যকার কর্তৃক সংযোজিত ভূমিকা অংশে নাটকের বিষয়ের গুরুত্ব ও তার গূঢ়রহস্য সম্পর্কে জানা যায় :

আমার নাটক লেখার গোড়ার দিকে 'চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি' রচিত হয়েছিল। রাস্তার উপর নাটক করবো এই গভীর আনন্দ মূল কাহিনীর সাথে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। তখন দেশে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। আমার মনে হয়েছিল অন্য এক শক্তির প্ররোচনায় নিষ্পাপ ও কোনো বিশালকায় সামুদ্রিক প্রাণী হত্যা করা হলো। এ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। প্রকৃতি বিরুদ্ধ যে কোন কাজের আনুপাতিক মূল্য দিতে হয়। এরকম একটা ঐশ্বরিক বিশ্বাস চর কাঁকড়ায় সক্রিয় ছিলো। রাস্তায় নাটক নামবে, অভিনব একটা ঘটনা। বিষয়টি আমি আর আমার নিত্যকার শিল্পসঙ্গী নাসির উদ্দিন ইউসুফ লেখা থেকে রাস্তায় নামানো পর্যন্ত প্রায় গোপন করে রাখি। কারণ ঐ তরুণ বয়সে যা হয় সবাইকে চমকে দেয়ার আনন্দ। ঢাকা থিয়েটারের সে প্রয়াস সফল হয়েছিলো কি না জানি না। তবে বাংলাদেশে তারপরই সচেতনভাবে রাস্তায় নাটক করার ব্যাপারে নাট্যকর্মীদের উৎসাহ একটা

> বড় জায়গায় তাঁদের নিয়ে আসে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের পথ নাটক যে ভূমিকা রেখেছিলো তার কোনো তুলনা সমকালীন বিশ্বে আছে কিনা সন্দেহ। চর কাঁকড়ার কাহিনী যেভাবে বলা হয়েছে তার ধরণটা আমার নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকেছিল। সমুদ্রোপকূলীয় অঞ্চলে আমার জন্ম। তাই তার রকম স্বভাব আমারও প্রায় মুখস্থ। স্মৃতির ভেতর থেকে যে লোকটি ঝড়ের বর্ণনা দেয়– সেখানে আঞ্চলিক শব্দের একটা বিশ্বাসযোগ্য ধ্বন্যাত্মক রূপ তৈরির চেষ্টা আছে। সেই আমার প্রথম প্রয়াস বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় সর্বত্রগামী রূপাবিষ্কারের। লেখাটির মধ্যে অল্প বয়সের অপরিপক্বতার গন্ধ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যেই আমার লেখার একটি জটিল গ্রন্থ উন্মোচিত হলো। কিছু লেখাকে নিজের অসফলতার নিদর্শন বলে স্বীকার করতে আপত্তি নেই। তবে এও জানি একটা লেখা মরে গিয়ে অন্য লেখার গায়ে তার অলঙ্কার দান করে যায়।[৪৩]

স্বাধীনতা-পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ, সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে যেমন নাটক লেখা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যবিষয়ক নাটক। এ পর্যায়ে নাট্যকাররা ইতিহাস ঐতিহ্যকে সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুন করে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। সেলিম আল দীনের ঐতিহাসিক কাহিনিনির্ভর নাটক Awb‡KZ A‡šÍY (১৯৭৩)। দিল্লির সম্রাট মাহমুদ বিন তুঘলককে নিয়ে নাটকটি রচিত। ফাট্টা অঞ্চলে তামিল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সুলতান বিশাল আকারের একটি সামুদ্রিক মাছ পেয়ে যান। সেই মাছ খাওয়ার পর তিনি জ্বর এবং আমাশাতে অসুস্থ সিন্ধু অঞ্চলে মারা যান। এ নাটকে নাট্যকার মাছের একটি স্বতন্ত্র সত্তা নির্মাণ করেন। নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, মাছটা যেমন নিঃসঙ্গ সুলতান তুঘলক তেমনি নিঃসঙ্গ ছিলেন। এখানেই তিনি মৌলিক নাট্যভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতীক হিসেবে তিনি মাছকে ব্যবহার করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী 'নাট্যকাররা তাঁদের নাটককে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এনে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন সচেতন করতে চেয়েছেন তেমনি চেয়েছেন তাঁদের নাটক যেন সাধারণ মানুষকে অর্থবহ ফলপ্রসূ নতুন জীবনের প্রেরণা যোগাতে পারে।'[৪৪] ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে এ নাটক রচিত হলেও নাট্যকারের লক্ষ্য যে কেবল ইতিহাস নয় তা স্পষ্ট হয় নাটকের শেষে যখন সুলতান তার বেগমকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 'আমি কি সেই অদ্ভুত মাছটি নই। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত। একা থাকতে দাও আমাকে। আমি একা থাকতে চাই– এই শয্যা একাকী– তুমি যাও–যাও।'[৪৫] Awb‡KZ A‡šÍY নাটকের মৌলবিষয় নিঃসঙ্গতা। নাটকের বিষয়ভাবনায় নাট্যকারের আধুনিক জীবনচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে সেলিম আল দীন এখানে সঞ্চারিত করেছেন আধুনিক জীবনবেদ, আধুনিক মানুষের অনন্বয়চেতনা।'[৪৬] সুলতান তুঘলক অত্যন্ত ক্ষমতাবান। কিন্তু তারপরও তার মধ্যে

আছে এক ধরনের নৈঃসঙ্গ্য আর পতনের ভীতি। সাহিত্য ব্যক্তিত্ব অরুণ সেন তাই তুঘলক চরিত্র মূল্যায়ন করেছেন এভাবেই :

> ইতিহাসের চেনা তুঘলককেই পাই এখানে–তাঁর সেই নিত্য নতুন পরিকল্পনা ও তার রদবদল তাঁর এক রোখা যুদ্ধাভিযান, তাঁর নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা তার প্রখর বুদ্ধি, সবই। একই সঙ্গে বিদ্রোহী ও বিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে তুঘলকের চরিত্রের অনন্য ও বেপোরোয়া খামখেয়ালীপনা চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রকৃত বন্ধুদের তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না, শত্রুদের অনায়স ক্ষমা করেন। বেগমের প্রতিই শুধু নয়, সবকিছুতেই অনিশ্চিত ও অস্থির তার আচরণ ও কথাবার্তা। এরই মধ্যে তাঁর ক্লান্তি ও নিঃসঙ্গতা ক্রমশ ছেয়ে যায়। এই অদ্ভুত চরিত্রটি সেলিমকে আকর্ষণ করতেই পারে। ঐতিহাসিক নাটকের আদলে তাঁর স্বকীয়তাও বেশ স্পষ্ট। বোধ হয় ফর্মের অনুশীলনই তাকে প্ররোচিত করেছে লেখায়। সেই অভিনবত্ব টের পাই নদীর পারে আজব মাছ নিয়ে কোলাহলের এক দৃশ্যে। "এমন বড় মাছ ইয়া বড় বড় চোখ জনতার ভাষায় মাছেদের সুলতান"। সুলতানও দেখতে গেলেন সেই মাছ। চর থেকে তাঁবুতে বয়ে আনা হবে তাকে– সেনাপতিরা আর বাহকেরা খাবে। পরের দৃশ্যে- মনে হয়, এ মাছ কি পতনের দিকে ধাবিত সুলতানেরই প্রতীক।[৪৭]

১৯৭৫ সালের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ঘটেছে পটপরিবর্তন। সবার অজ্ঞাতে ঘটে এক রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়। এরপর বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৭ সালে সামরিক একনায়কতন্ত্র দেশের সকল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করায় পূর্বের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস পরিবর্তিত হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজা হয়। রাষ্ট্রীয় আদেশে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হলো আদর্শ। পরিবর্তিত হয় সংবিধানস্থ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি–ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র পরিত্যক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয়নীতি ও চারিত্র্য আমূল পাল্টে যায়। সেলিম আল দীন ১৯৭৫ পরবর্তীকালে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি পরিহার করে নাটক রচনায় অবলম্বন করলেন মানুষ ও মানবতার নানান সংকট। সামাজিক জীবনে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করায় তখন তার বিধ্বস্ত শিল্পীমন আশ্রয় গ্রহণ করে মনোজগতে। এ পর্যায়ে তিনি লিখেছেন পুরাণাশ্রয়ী নাটক kKŠÍjv। এছাড়া লিখেছেন পারিবারিক জীবন, প্রেম-প্রণয়ের ঘটিত হৃদয়ের নানা টানাপোড়েনের কাহিনি নিয়ে AkæZ MvÜvi, i‡³i Av½ijZv, In! †'e'Z প্রভৃতি।

সেলিম আল দীনের পুরাণাশ্রয়ী নাটক kKŠÍjv (১৯৭৭)। মহাভারতের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা উপাখ্যান নাটকের কাহিনির উৎস। বাংলা নাটকে পুরাণ নির্মাণের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। পৌরাণিক কাহিনি

কেন্দ্রিক নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলত ধর্মীয় আবেগ থেকে পুরাণের ব্যবহার হয়েছে। পুরাণ ঐতিহ্য নিয়ে রচিত হলেও kKŠ Í j¨ ভিন্নমাত্রার নাটক। সেলিম আল দীন জীবন ও জগৎবোধের গভীরতলস্পর্শী শিল্পী। স্বর্গীয় দেব-দেবীর প্রতি চিরকালীন বিশ্বাস kKŠ Í j¨ নাটকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন। দেবতারা শুধু যজ্ঞের হোমাগ্নি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক মানবকল্যাণ সাধনে নিমগ্ন নন তারাও মর্ত্য মানবের মতো লোভ-ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণ। মানব সন্তান ঋষি বিশ্বামিত্রের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে দেবকুল তাঁর তপস্যা ভঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অপ্সরা মেনকা যোজনগন্ধা বেশে বিশ্বামিত্রের নিকট প্রেরিত হয়। এখানে প্রকাশ পায় স্বর্গ-মর্ত্যের চিরায়ত দ্বন্দ্ব। ফলে নাট্যকারের পুরাণভাবনা আধুনিক জীবনদর্শনের জারক রসে রঞ্জিত হয়ে নবযুগের মানুষের ভাবনার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। "সেলিম আল দীনের উজ্জ্বল সৃষ্টি 'শকুন্তলা' (১৯৭৭) নাটক। কেবল নাট্যগুণ আর সংলাপের স্বাতন্ত্র্যের জন্যে নয়, পৌরাণিক কাহিনীর সমকালস্পর্শী আধুনিক ব্যাখ্যার জন্যেই শকুন্তলা বাংলা নাটকের ধারায় এক দীপ্র নির্মাণ।"[৪৮] kKŠ Í j¨ নাট্যের স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ডে নর্তকী মেনকা পৃথিবীতে এসেছে ছদ্মবেশে, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করতে। যোজনগন্ধা বেশী মেনকা কৌশিকীর জলে ফেলে যায় তার কেয়ূর। কেয়ূর না পেলে সে চিত্রকূটে ফিরে যেতে পারবে না। কেয়ূর চলে যায় বিশ্বামিত্রের হাতে। মেনকা বাধা পড়ে বিশ্বামিত্রের নিকট। সে অনুরোধ করে কেয়ূর ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু বিশ্বামিত্রের অভিসন্ধি ভিন্নতর :

যোজনগন্ধা : ঋষি বিশ্বামিত্রের জয় হোক। সামান্যা কিন্নরি তাঁর দেখা পেলো। এ কেয়ূর ফিরে পেয়ে আমি যেন জীবন ফিরে পেলাম। নর্তকী যোজনগন্ধা অনুমতি পেলে চিত্রকূটে ফিরে যাবে।

বিশামিত্র : এই নাও কেয়ূর। না থাক। কথা আছে। এ কেয়ূর যদি আর ফিরিয়ে না দেই।

যোজনগন্ধা : সে কি প্রভু।

বিশ্বামিত্র : শোনো কিন্নরি আজ আমি শূন্যে ছড়িয়ে পড়া বসন্ত বাতাসে পুষ্পরেণুর গন্ধ পাই। টের পাই আম্রতক বনে বাঁকা লাঙ্গুল জ্বলজ্বলে চিতা বাঘ। আমি আজ সবল পুরুষ মাটির ভেতর থেকে জল তুলবো। নৃত্যপরা তোমাকে দেখবো আমি।[৪৯]

নাট্যকারের প্রস্তুতি পর্যায়ের নাটক বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য। এ পর্বে তাঁর মঞ্চ নাটকগুলো জীবনঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলো প্রায় একই বাস্তবতায় নির্মিত। তবে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও নাটকের পরিবেশনারীতির

ভিন্নতার কারণে মঞ্চে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। কোনো নাটক এ্যাবসার্ডরীতির, কোনোটা মিউজিক্যাল কমেডি, কোনোটি আবার হাস্য, কৌতুক ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। এসব নাটকে তিনি স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেন। স্বাধীনতার পর অনেক নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাটক লিখেছেন। এক্ষেত্রে সেলিম আল দীন ব্যতিক্রম। তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে অধিক প্রাধান্য না দিয়ে বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ও নিয়ন্ত্রণহীনতার বিষয়টিকে দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রস্তুতি পর্যায়ের বেশ কিছু নাটক রয়েছে যা তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য রচনা করেছেন। সেলিম আল দীন রচিত *jeqvg নাটকটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৭০ সালে Ng †bB নামে প্রচারিত হয়। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক দৈন্যদশার চিত্র খুব নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে এ নাটকে। তবে নাটকের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে এসেছে নৈঃসঙ্গ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র শরীফ খান একটি ট্রেডিং কর্পোরেশনের হেড ক্লার্ক। ছেলের জ্বর, স্ত্রীর গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, সংসারের খরচাপাতি নিয়ে টানাটানি এসব মানসিক চাপের কারণে নির্ঘুম কাটছে, এমনি সময়ে অফিসে জরুরি ও গোপনীয় চিঠি টাইপরত অবস্থায় একটা ফোন কল আসে তার কাছে। অপর প্রান্ত থেকে বলা হয়, সাঈদা ব্লাড প্রেসারে মারা গেছেন, তিনি যেন তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যান। শরীফ বুঝতে পারেন কলটা রং নাম্বারে এসেছে, সেটা তিনি বলেন অপর প্রান্তের লোকটাকে। কিন্তু এর মধ্যে ওই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটার দুটো লাইন টাইপ থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে ডেকে পাঠান ও বকাঝকা করেন। ওদিকে সহকর্মী আফজাল সাহেবের সঙ্গে খেলা দেখতে যাওয়ার কথা দুপুরের পর। ছুটি চেয়ে তিনি দরখাস্ত দিয়েছিলেন ওপরওয়ালার কাছে, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয় নি। তাকে ডেকে নিয়ে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এ রকম দরখাস্ত আর কখনো যেন তিনি না করেন। শরীফ খান খুব ভালো করেই বুঝতে পারেন, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ গত কয়েকদিনের টানা নির্ঘুমতা আর ওই অদ্ভুত ফোন কলটাই এই ভুলের জন্য দায়ী। তিনি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, সহকর্মী আফজাল সাহেবের কাছেও বিষয়টি প্রাধান্য পায় না, কথাটা তুলতে গেলে স্ত্রী চলে যান অন্য প্রসঙ্গে, কন্যার কাছেও বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এরপর যান পার্কে। পার্কের এক অচেনা মহিলার কাছে কথাটা বলেন, কিন্তু মহিলার অফিসিয়াল ব্যস্ততার কারণে তার কাছেও বিষয়টি তাৎপর্যহীন হয়। শেষপর্যন্ত শরীফ সাহেব ডাক্তারের শরণাগত হয়েছেন। ডাক্তার সাহেব তাকে এমন একটা ঘুমের ওষুধ লিখে

দেন, যেটা খেলে খোকার কান্না কিংবা স্ত্রীর চিৎকার কিছুই তার ঘুমের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না। শরীফ সাহেব ও ডাক্তারের সংলাপে বিষয়টি স্পষ্ট :

শরীফ: তীব্র আবেগে। কী করে বোঝাবো ডাক্তার আমি কি করে বোঝাবো। এ মুহূর্তে আমার যে কী ভীষণ ইচ্ছা করছে একা থাকতে আমি একা থাকতে চাই–লিসা–খোকা সবার কাছ থেকে। কেননা আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই–ফুটবল খেলা না দেখার দুঃখ–কিংবা চিঠির ভুল আর এক্সপ্লেনেশনের ভয়ের জন্য কারও সহানুভূতি আমার চাই না ডাক্তার। আমি একটু ঘুমাতে চাই।

ডাক্তার: একটা ওষুধ দিচ্ছি। এখুনি খেয়ে নেবেন। প্রেসক্রিপশন লেখেন খোকার কান্না কিংবা স্ত্রীর–চিৎকার কিছুই আপনার ঘুমের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না। কম্পাউন্ডার।[৫০]

শরীফ সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাত্র পনেরো টাকা দিয়ে সুগারকোটেড মিষ্টি ড্রাগ wjweqvg কিনে নিয়ে যান। আনন্দিত চিত্তে ভাবছেন, সত্যি তাহলে আজ ঘুমাতে পারবো মূলত শরীফ খানের এই নিঃসঙ্গতাই নাটকের প্রাণ।

সেলিম আল দীনের gbxiv gd¯‡j নাটকটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৭৩ সালে সম্প্রচারিত হয়। gwbiv মফস্বল কলেজের আই.এ. ক্লাসের ছাত্রী। বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, কলেজে যাওয়া আসার মধ্যে বাংলা সিনেমা দেখে তার ভালোভাবেই দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ একদিন মুনিরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার কিছুই ভালোলাগে না। নিয়মিত কলেজে যায় না, মাঝে মধ্যে তার মাকে সেলাই–এর কাজে সহযোগিতা করে। মুনিরার বান্ধবী ফরিদার বিয়ে হয়েছে, সে ঢাকায় থাকে। মুনিরাও স্বপ্ন সেও ঢাকা যাবে একদিন। এই মফস্বল শহরে নয়, সে মহানগরীতে যেতে চায়। এ শহর তার ভালোলাগে না। তার খালাতো ভাই মীরন মেরিন বায়োলজিস্ট। মীরনের কাছে মুনিরা তার ভালোলাগার বিষয়টি প্রকাশ করে। মীরনকে তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করে: 'আমার গল্পের বই পড়তে ভালোলাগে। সমুদ্রের গল্প। জানেন সমুদ্র দেখার আমার ভারি সাধ। সমুদ্রের ঢেউ শব্দ চিন্তা করতেই ভালো লাগে।'[৫১]

মফস্বলের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মুনিরার মধ্যে পরিবর্তন আসে। সে ভাবছে সমুদ্র নিয়ে, যেন ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের তলে ডুবুরিদের মতো। তার চোখের সামনে যেন প্রবল পাথর পান্না আর শৈবালের ঘর কিংবা উদ্দাম হাওয়ার সমুদ্র সৈকত। মীরন ইংল্যান্ডে চলে যায় ফলে মুনিরার স্বপ্ন পূরণ হয় না। মুনিরা চায় সুদূরের হাতছানি, ঝলমলে ঢাকার শহর, সমুদ্রের নীল ঢেউ। মুনিরার রোমান্টিক স্বপ্ন কল্পনার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। হালকা-সরস পারিবারিক স্নেহ মমতার কাহিনি নিয়ে মূলত নাটকটি রচিত।

সেলিম আল দীন রচিত AkæZ MvÜvi নাটকটি ১৯৭৫ সালের ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। AkæZ MvÜvi নাটকে রয়েছে যুগলের প্রণয়কাহিনি। নীলু বড় লোকের মেয়ে, ভালোবেসেছে জুবেরকে। নীলুর ঘরে সৎ মা, তিনি নীলুকে দ্রুত পাত্রস্থ করতে চান। তবে তিনি জুবেরকে পছন্দ করেন না। বেকার জুবের সংস্কৃতিমনা, নাট্যামোদী এবং শিল্পের অনুরক্ত। নীলুর অমতে বিয়ে হয় সাঈদ নামক চামড়া ব্যবসায়ীর সঙ্গে। সাঈদ কালোবাজারি, সে মজুদদারি করে। তার বন্ধুদের নিয়ে সে মদ খায়, জুয়া খেলে। সুন্দরবনের হরিণের চামড়ার শোপিস সে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে। নীলু খুব সংগীত প্রিয়। তবে তার স্বামী সংগীতানুরাগী নয়। সাঈদ জীবনে নাটক দেখে নি, গানের আসরে যায় নি। তার কাছে গোলাপের গন্ধের চেয়ে ট্যানারির গন্ধ অনেক ভালো। সংগীত থেকে নীলুকে উন্মুলিত করা হয়। শেষপর্যন্ত নীলু অসুস্থ হয়ে যায়। জুবেরেরও অনিদ্রায় কাটে দিন। তার বিদেশে যাওয়া হয় না। তাদের প্রণয় পরিণত রূপ লাভ করে নি। সামাজিক, পারিবারিক নিয়মরীতির বেড়াজালে জড়িত দুটি জীবন নষ্ট হয়। যুব সমাজের বেকারত্ব ও হতাশার দিকটি এখানে যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি কালোবাজারির প্রসঙ্গও।

সেলিম আল দীন টেলিভিশনের জন্য ১৯৭৫ সালে রচনা করেন k¨vgj Qvqvq নাটকটি। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কাহিনি নিয়ে নাটকটি রচিত। এদেশের মানুষের অভাব, দারিদ্র্য, হতাশা, অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি বিষয়গুলো নাটকে উঠে এসেছে। বৃদ্ধ আশরাফ সাহেব আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন। যথাসময়ে অবসরে গেছেন। মনির ও লাবণী তাদের দুই সন্তান। তারা অভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠে শৈশব থেকে। আশরাফ সাহেব সৎ কর্মচারী ছিলেন। চাকুরি শেষে প্রাপ্ত ত্রিশ হাজার টাকা তার শেষ সম্বল। এক টুকরো জমি কেনার জন্য চেষ্টা করছেন। মেয়ে লাবণী আর্ট কলেজে পড়ে। এক সময় ভালবাসতো আসাদকে। কিন্তু আসাদের সঙ্গে তার ভালবাসা স্থায়িত্ব লাভ করে নি। শেষপর্যন্ত লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে সময় কাটায়। অপর দিকে আশরাফ সাহেবের ছেলে মনির বাসা ছেড়ে হলে থাকে। সংসারের অভাব, অনটন তার ভালো লাগে না। হতাশাই তার একমাত্র সঙ্গী। সে নেশা করে, জুয়া খেলে। শেষে মায়ের গলার চেন চুরি করে একটি সাইকেল কিনে বিশ্ব ভ্রমণে যেতে যায়। মূলত অসহায় নিরুপায় আশরাফ সাহেবের আর্থিক সংকট যেমন এখানে উঠে এসেছে, তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তী এদেশের যুব সমাজের হতাশা, বেকারত্ব এবং পথ-ভ্রষ্টতার দিকও খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে k¨vgj Qvqvq নাটকে।

সেলিম আল দীনের i‡³i A¼ijZv নাটকটি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। i‡³i A¼ijZv নাটকে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের যুব সমাজের হতাশা, ব্যর্থতা আর সন্ত্রাসের ছবি যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি যুবক-যুবতীদের প্রেম-প্রণয়ের কাহিনিও রয়েছে। ছুট্টি, রঞ্জু, সিদ্দিক এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছুট্টি সকলের আড্ডার মধ্যমণি, তাকে সবাই ভয় পায়। ছুট্টিদের বাড়িতে অভি নামের একটি মেয়ে থাকে। অভি ছুট্টিকে ভালবাসে। অভির বাবা-মাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা হত্যা করে। অভির বান্ধবী সুমী পঙ্গু। অসুস্থ সুমীকে রক্ত দেয় ছুট্টি, তাই ছুট্টিকে ভালোবাসে সুমী। সুমী মনে করে অভি সুস্থ, সুন্দর তার জন্য অনেক পাত্র আসে। আর সুমীর পায়ের পঙ্গুত্বের কারণে তার বিয়ে ভেঙে যায়। এই নিয়ে তাদের তিন জনের মধ্যে মান-অভিমান হয়। শেষপর্যন্ত সুমীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় ছুট্টি। অভির মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে এমন ছেলের সঙ্গে বাগদান হয়, সে স্বামীর সঙ্গে চলে যাবে মধ্যপ্রাচ্যে। সুমীর কঠিন রোগ ধরা পড়ে, ছুট্টি চাকরি নিয়ে যশোর চলে যায়। কারো ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হয় না। নিঃসঙ্গ ছুট্টি মানবসেবা, দেশপ্রেম, রক্তদান ইত্যাদি সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

সেলিম আল দীনের †kl eskai নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৯ সাল। বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে নাটকটি প্রচারিত হয়। †kl eskai একটি হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা। বাস্তবতার বাইরে অতিলৌকিকতা এখানে বেশি। নাটকের শুরু উনিশ শতকের কবি, গল্পকার এ্যাডগার এলেন পো-র কথা দিয়ে, যিনি প্রকৃতিতে দেখেছেন এক ভয়ানক প্রেতকে। বকশী বংশের শেষ উত্তরাধিকার তিতু বংশীর জীবনের শেষ কটি দিন নিয়ে নাটকটি। তার পূর্ব পুরুষ ছিল অত্যাচারী জমিদার। তাদের বাড়ির কুয়োটার মধ্যে ঊনষাট জন মরা লোকের হাড়গোড়। তার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে শুধু তাদের পাপের ক্ষতিপূরণ দিতে। শ্যাওলা ধরা পুরাতন বাড়ির মধ্যে কাজের লোক, ডাক্তার আর দারোয়ান নিয়ে তার বসবাস। এ্যাম্পুল সিরিঞ্জ দিয়ে সে মরফিন নেয়। এবং রাজপ্রাসাদকে সে আগলে রেখেছে। তার মনে হয় পূর্ব পুরুষের আত্মা ঘোরাফেরা করে বাড়িতে। নাটকে জমিদারদের শাসনের নির্মমতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

সেলিম আল দীন In! †'e'Z নাটকটি ১৯৭৯ সালে রচনা করেছেন। নাটকটি বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রচারিত হয়। In! †'e'Z নাটকের শুরুই হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খোঁজার মধ্য দিয়ে। রুক্কু নামের এক যুবক উন্নতমানের একটি ব্রান্ডের ঘুমের ওষুধ খুঁজছে। 'রসেটা অ্যান্ড ডেভডি' কোম্পানির ওষধুটি ব্লাকে বিক্রি হচ্ছে। প্রেসক্রিপশনে দশটি থাকলেও রুক্কু বিশটি ওষুধ কিনে নেয়। এরই মধ্যে আরও একজন লোক ড্রাগ হাউজে আসে, সেও ওষুধ চায় তবে তা এন্টি এলার্জিক ওষুধ। নাটকের নায়ক

রুক্কু গ্রামের ছেলে, পাঁচ বছর আগে শহরে আসে। তার মা মারা গেছে, বাবা আবার বিয়ে করেছে। শহরের ধনীর দুলালী চিনুকে ভালবাসে রুক্কু। কিন্তু চিনুর মাকে বলা সম্ভব নয়, কারণ রুক্কুর আর্থিক অবস্থা চিনুদের মতো ভালো নয়। চিনুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এমনি দুর্ভাবনায় যখন রুক্কু তখন তার ঘরে আবির্ভূত হয় ডিয়ন গ্রহ থেকে দেবদূত। দেবদূতের নাম অনুপম। দেবদূত তার ক্ষমতা দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মেরে ফেলে চিনুর হবু বর খন্দকার রেজাউলকে। একটি মাত্র এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে ভিন গ্রহের মানুষ সব ঘটনা রুক্কুর অনুকূলে এনে দেয়। অনুপম রুক্কুকে বলে :

> ভুলে যাও আমি অন্য গ্রহের মানুষ। অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে আমার। আমি তোমার সারা ঘরটাই সাজিয়ে দেবো। বাজার থেকে চমৎকার সব জিনিস কিনে আনবো। দেয়ালে পেইন্টিং। ফ্লোরে দামি কার্পেট। পুরু নরম বিছানা দেবো তোমার জন্যে।[৫২]

চিনু, রুক্কু, অনুপম ও লোপা একদিন বেড়াতে যায় আরিচা রোডে। এরই মধ্যে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে অনুপম ভালবাসতে শুরু করে লোপাকে। তবে লোপা ভালবাসে জুবায়েরকে। চিনুর মা সম্পত্তির লোভে চিনুর চাচাতো ভাই ফারুকের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। শেষপর্যন্ত চিনুর ভাই জামিল তার চাচাতো ভাই অর্থলোভী ফারুককে হত্যা করে। এরপর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত চিনু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে। চিনু ও রুক্কুর মিলন হয় না। তাদের প্রেম অনন্তকালের জন্য রয়ে গেল, বিয়ে হলো না তাদের। ডিয়ন গ্রহ থেকে আসা দেবদূত লোপাকে ভালবেসে তার কাছে রেখে গেছে তার অন্তরের ক্ষরণ চিহ্নরূপে একটা হীরার আংটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত এদেশে হাজারটা সমস্যা বিরাজমান ছিল। প্রণয় যেমন পরিণতি লাভ করে না, তেমনি দেশের মানুষ জানে না তাদের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ। অনুপমের আগমন ও প্রস্থান কৌতূহল উদ্দীপক। যুব সমাজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে, দেশের নানা সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে। এরকম একটি আশাবাদী ভাবনার মধ্যে দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সরকারি গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন। সেলিম আল দীন রচিত বহু নাটক বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। আমাদের নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, তরুণ সমাজের নৈঃসঙ্গ্যতা, বেকারত্ব এবং সরস পারিবারিক জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত উল্লিখিত নাটকে নেই তেমন কোনো গূঢ় জীবনের জটিলতার রূপায়ণ। তবে তাঁর নাট্য-প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বলে তিনি মনে করতেন। মঞ্চে যা দেখানো সম্ভব ছিল না, এমন অনেক কিছুই নাট্যকার টেলিভিশনে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই বলেছেন :

> টেলিভিশন নাটক আমার রচনার সম্মুখ যাত্রার অংশীদার বটে। কারণ এর মধ্য দিয়ে আমার ভাবনার নানা ফেনা মনের চিবুক পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল। তখন যা কিছু মাথায় এসেছিল তার সবটাকে মঞ্চরূপে স্থির করা সহজসাধ্য ছিল না। ফলে ঐ ভাবনাগুলো নিরীক্ষা করার একটা বড় সুযোগ এসেছিল টেলিভিশনে।[৫৩]

সেলিম আল দীনের প্রথম পর্বের বেশির ভাগ নাটক সমসাময়িক নানা বিষয় নির্ভর রচনা। নাট্যকার কালিক, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন। তিনি পারিবারিক-সামাজিক হালকা বিষয় নিয়ে আবার কখনো রাষ্ট্রীয় খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রস্তুতি পর্বে টেলিভিশনের জন্য রচিত নাটকে সাধারণ দর্শক শ্রোতাদের পছন্দ, তাদের রুচি ও চাহিদার কথা তিনি ভেবেছেন ভাবতে হয়েছে। একই সঙ্গে এবং একই সময়ে তিনি মঞ্চের জন্য নাটক লিখেছেন। তবে সর্বক্ষেত্রে নাটকে নতুনত্ব আনার একটা আলাদা প্রয়াস নাট্যকারের মধ্যে ছিল। এই পর্বের নাটকগুলো দারুণ মঞ্চ সফল হওয়ার কারণে তাঁর প্রত্যয় আরও বেড়ে যায়। বলা যায় প্রস্তুতি পর্যায়ে তিনি নাট্যকার হয়ে উঠেছেন এবং নিজের জগৎ ও জীবন ভাবনার সূত্রগুলো অনুসন্ধান করেছেন। যৌবনের একেবারে শুরুতে মঞ্চে নানা নিরীক্ষার পাশাপাশি টেলিভিশনে অবাধ সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর কাব্যধর্মী নানা ভাবনাকে নাট্যরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। সেলিম আল দীন তাঁর প্রথম পর্বের দশ বছরের নাটক প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন :

> সন্দেহ করি আমার শুরুর দিকের রচনায় পাশ্চাত্য শিল্পরীতি এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে জীবনকে দেখবার ভঙ্গিটাও নিতান্ত অনুকৃত। অপটুত্ব কবিত্ব হয়ে দেখা দিলে তা উপহাস্য একথা মানি কিন্তু আমার এসব রচনার মধ্যে আত্মপথ সন্ধানের নিষ্ফল আর্তনাদটুকু শুনতে পান যদি কোনো সমালোচক তবে তা হবে আমার প্রতি যথার্থ সহৃদয়তা প্রদর্শন।[৫৪]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারি ও বিরোধী দল উভয়ই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে দেখেছেন, যা সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে উল্লিখিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পেছনে মুক্তিযুদ্ধের যে অন্যতম প্রধান চেতনাটি কাজ করেছিল তা হলো সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে ধারণ করে নাটক রচনা করেছেন সেলিম আল দীন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের gbZwmi নাটকে বুর্জোয়া শ্রেণির সীমাহীন ক্ষুধার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। AvZi Avj‡‘i bxjvf cvU এবং Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gj †‘Lv সমাজতান্ত্রিক চেতনায় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে শোষিত শ্রেণির মুক্তি কিভাবে আসবে তার দিক নির্দেশনা নেই। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের মধ্যে তাঁর রচিত নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করবার তাড়নায় উদগ্রীব এক তরুণ। তাঁর লক্ষ্য ছিল নতুনভাবে কিছু করা। নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর ভ্রমণ যাত্রার শুভসূচনা এভাবেই প্রস্তুতি পর্যায়ের নাটকে দৃশ্যমান হয়েছে। করিম কিংবা আতর আলী শ্রেণি শত্রু খতম করতে না পারলেও বিকাশ পর্যায়ের ‡KËb‡Lvjv নাটকে শোষক ইদু খুন হয় সোনাইয়ের হাতে। সেলিম আল দীনের নাট্যকীর্তির অন্তর্গত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র। দেশ-কাল-প্রতিবেশ তাঁর নাটকে এনেছে নতুন মাত্রা। সমকালে সাধারণ জনতার মধ্যে যে অস্থিরতা, সে অস্থিরতার অভ্যন্তরে সুপ্ত ছিল সমাজ পরিবর্তনের এক দুর্দমনীয় বাসনা। সেলিম আল দীন গণ মানুষের জীবনের মুক্তির প্রত্যাশা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়: ‘সেলিম আল দীন মঞ্চ নাটক রচনার সূচনাপর্বে স্বীয় রাজনৈতিক বোধ ও সমকালের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার চালচিত্র উপস্থাপনায় অঙ্গীকৃত ছিলেন। এবং কতকটা সংক্ষুব্ধ চিত্তেই তাঁর উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে প্রয়াসী ছিলেন।’[৫৫]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে স্বাধীনতার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা-বিরোধী গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির বিপর্যয় দেশপ্রেমিক কবি, লেখক ও নাট্যকারদের ভাবিয়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের বিপর্যস্ত, বিপন্ন ও অস্থির জীবনের উত্তেজনা তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছিল, তার তাগিদেই যেন যুদ্ধ-পরবর্তী নাট্যরচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে যুদ্ধ-পরবর্তী লুণ্ঠন, অস্ত্রবাজি, ছিনতাই, অরাজকতা, হত্যা ইত্যাদি। নাট্যকারগণ সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন নি। স্বদেশ ও সমাজসচেতন নাট্যকার সেলিম আল দীন তাই দেশ-কাল, সমাজ-জীবন ও মৃত্তিকা-সম্পৃক্ত নাট্যরচনায় শুরু থেকে অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল দীন, "লিব্রিয়াম", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-1 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ৩১

২. খোন্দকার শাহদাত হোসেন সম্পা., mvßvwnK cevYx, ৪ মার্চ ১৯৭৬, পৃ. ১২

৩. সেলিম আল দীন, "জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ৭৮

৪. ঐ, ÒRwÛm I wewea †ejbÓ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ৩

৫. সেলিম মোজাহার, ¯vaxbZv-DËi XvKv‡Kw›‘K gÂbvU‡K ivRbxwZ I mgvRev¯Íevqv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৬৯

৬. রাহমান চৌধুরী, ivR‰bwZK bvU¨wPšÍv I ¯vaxbZv cieZx evsjv‡‘‡ki gÂ bvUK (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ২৮০

৭. সেলিম আল দীন, "সংবাদ কার্টুন", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-1, পৃ. ১৪৯

৮. Z‡‘e, পৃ. ১৫১

৯. Z‡‘e, পৃ. ১৫৪

১০. Z‡‘e, পৃ. ১৫০

১১. Z‡‘e, পৃ. ১৫৪

১২. মোঃ জাকিরুল হক, ‘B evsjvi bvU‡K cwZev‘x †PZbv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৬৭

১৩. Z‡‘e, পৃ. ১৬৫

১৪. সেলিম আল দীন, "দেয়াল", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-1, পৃ. ৬৭

১৫. হোসনে আরা জলী, evsjv‡‘‡ki bvUK welq‡PZbv (1947-1982) (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনালয়, ২০১২), পৃ. ২১৩

১৬. সেলিম আল দীন, "সর্প বিষয়ক গল্প", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ১২৬

১৭. Z‡‘e, পৃ. ১২৮

১৮. Z‡‘e, পৃ. ১২৯

১৯. Z‡‘e, পৃ. ১৩৪

২০. রাহমান চৌধুরী, পৃ. ২৯১

২১. ^‘wbK B‡ËdvK, ৩০ নভেম্বর, ১৯৭৩

২২. হোসনে আরা জলী, bvU¨ welqK KwZcq ceÜ (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১২), পৃ. ১০৪

২৩. সেলিম আল দীন, "এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ১১১

২৪. ঐ, "করিম বাওয়ালীর শত্রু অথব মূল মুখ দেখা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ১৪১

২৫. Z‡‘e, পৃ. ১৪৪

২৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨ (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১৫৫

২৭. সেলিম আল দীন, "মুনতাসির", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ১৩

২৮. Z‡‘e, পৃ. ১৫

২৯. Z‡‘e, পৃ. ১৭

৩০. Z‡‘e, পৃ. ২৬

৩১. Z‡‘e, পৃ. ৪১

৩২. Z‡‘e, পৃ. ৪২

৩৩. Z‡‘e, পৃ. ৪৫

৩৪. রাহমান চৌধুরী, পৃ. ৩৪৩

৩৫. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK (ঢাকা: নান্দনিক প্রকাশনা, ২০১২), পৃ. ১১৮

৩৬. রামেন্দু মজুমদার, welq : bvUK (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭), পৃ. ৭৫

৩৭. সেলিম আল দীন, "আতর আলীদের নীলাভ পাট", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ২৮২

৩৮. Z‡‘e, পৃ. ২৮২

৩৯. Z‡‘e, পৃ. ২৮৫

৪০. Z‡‘e, পৃ. ২৯৪

৪১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, nvRvi eQi evsjv‡‘‡ki bvUK I bvU¨Kjv (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৭৯

৪২. সেলিম আল দীন, "চর কাঁকড়া", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ৩১৮

৪৩. ঐ, "পরিশিষ্ট", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 1, পৃ. ৪২৬

৪৪. রামেন্দু মজুমদার সম্পা., evsjv‡‘‡ki bvU¨PPv (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ২৮০

৪৫. সেলিম আল দীন, "অনিকেত অন্বেষণ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-1, পৃ. ৫৮

৪৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ১৫৯

৪৭. অরুণ সেন, "সেলিম আল দীন : নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র", ‘B evsjvi w_‡qUvi (বগুড়া, ২০০০), পৃ. ১৮

৪৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃ. ১৫৯

৪৯. সেলিম আল দীন, "শকুন্তলা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ৩৬২

৫০. ঐ, "লিব্রিয়াম", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ৩১

৫১. ঐ, "মুনিরা মফস্বলে", cmwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ১৭২

৫২. ঐ, "ওহ! দেবদূত", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ১৮০

৫৩. ঐ, "ভূমিকা দ্রষ্টব্য", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ০৯

৫৪. Z‡‘e, পৃ. ০৮

৫৫. লুৎফর রহমান, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
বিকাশ পর্যায়ের নাটকের বিষয়বিচার (১৯৮০-১৯৯৪)

সেলিম আল দীনের ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে রচিত নাটকসমূহ বিকাশ পর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে। আশির দশকের সময়টা ছিল সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকাল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হবার দশ মাস পর আরেক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর তিনি সংসদ বাতিল এবং সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন। সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে প্রচারিত ফরমানে সকল প্রকার মিছিল, ধর্মঘট, জনসভা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট ও ব্যাপক দুর্নীতির কারণে জেনারেল এরশাদ খুব শ্রীঘ্রই চরম গণবিরোধিতার মুখে পড়েন। ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি সে সময় আন্দোলন ও মিছিল-সমাবেশ দমিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সভা-সমাবেশে গুলি চালনা, রাজপথে ছাত্র হত্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। দেশের কালিক নানা ঘটনা প্রবাহের কারণে বলা যায় সেলিম আল দীন রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন নাটক রচনায় আর তেমন মনোনিবেশ করলেন না। বরং তিনি এ পর্বে বেছে নিলেন বৃহৎ বাংলার লোকজ জীবন। গ্রাম বাংলার সংগ্রামী জীবন নিয়ে রচিত তাঁর বর্ণনাত্মক ধারার নাটকগুলো হচ্ছে wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n‘vB, এবং কথানাট্য রীতির নাটকগুলো– PvKv, ‰heZx Kb¨vi gb এবং niMR। এছাড়া এ পর্বের অন্যান্য নাটকগুলো হলো– weïKgv‡ii cZj bvP, evmb এবং MwŠKMY K‡n প্রভৃতি। বিকাশপর্বের নাটকগুলো বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য। এছাড়া এ পর্বে নাট্যাঙ্গিক নিয়ে তিনি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর রচিত বর্ণনাত্মক শিল্পরীতির ও কথানাট্যধারার নাটক সমকালীন সাহিত্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে।

সেলিম আল দীনের আশির দশকে রচিত wKËb‡Lvjv (১৯৭৮-৮০) বিষয় ও আঙ্গিক ভাবনায় ব্যতিক্রমী নাটক। আবহমান বাংলা ও বাঙালির লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত wKËb‡Lvjv লোকজ ঐতিহ্য সংরক্ষণে কৃতিত্বের দাবীদার। বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ ভূমি মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানাপেশা ও সম্প্রদায়ের দুঃখ তাড়িত শ্রমজীবী মানুষের জীবনগাঁথা নিয়ে আলোচ্য নাটক নির্মিত। নগরজীবনের ডামাডোল থেকে বহুদূরে গ্রামের মানুষের চিরায়ত জীবনধারায়

দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-ফূর্তি, শোষণ-বঞ্চনা, প্রেম-ভালোবাসা, বিচ্ছেদ-বেদনা নাটকে রূপায়িত হয়েছে। মানিকগঞ্জের লোকজীবন সংস্কৃতি, নিসর্গ, ভূমিরূপ, ঋতুচক্রভিত্তিক সময়ধারার সঙ্গে প্রাত্যহিকতাকে তিনি নিয়ে আসেন মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয়। মানিকগঞ্জ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার উত্তর সীমান্তে টাঙ্গাইল জেলা; পশ্চিম, পশ্চিম দক্ষিণ এবং দক্ষিণ সীমান্তে যমুনা এবং পদ্মা নদী যথাক্রমে পাবনা ও ফরিদপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পূর্ব, উত্তরপূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণে রয়েছে ঢাকা জেলার যথাক্রমে ধামরাই, সাভার, কেরানীগঞ্জ, দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলা। বাংলার মধ্যভাটি অঞ্চলভুক্ত মানিকগঞ্জ জেলার ভূ-ভাগ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। বিশেষ পদ্মা, গঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, করতোয়া, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ও অসংখ্য খালবিলের পানি বিধৌত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি মানিকগঞ্জ জেলা। wKËb‡Lvjv নাটকে উল্লিখিত তেরশ্রী, টুইটাম, ঘিওরগঞ্জ, মহাদেবপুর, দৌলতপুর, ভাদ্রা, জালাই, সোনালিয়া, দপ্তিয়ার, নলসন্ধা, বরঙ্গাইল, কেরানীগঞ্জ, কৈজুরী প্রভৃতি প্রায় সবই বাস্তবে আছে মানিকগঞ্জে ও দুএকটি টাঙ্গাইলে। wKËb‡Lvjv নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে আবহমান বাংলার এক ঐতিহ্যবাহী মেলাকে কেন্দ্র করে। কিত্তনখোলা গ্রামে মনাই বাবার মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় তিন দিনের এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের শুরুতে মেলাগামী উৎসুক জনতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মেলায় কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণেচ্ছু একটি দল ঢোল বাজিয়ে মাঘী ফসলের রঙিন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। নাট্যকার কবিতার সুর ও ছন্দে সেটি উপস্থাপন করেন :

চল চল
তারপরের গাঁও দপ্তিয়ার
হাজারি গুড় সুনাম তার
ক্ষেতের মধ্যে হাউট্টা পথ
ভাদ্রা গেরাম উল্টা রথ
তার পরের গাঁও কিত্তনখোলা
চল মন শুরু ভোলা।
মেলায় কবির হইবো নারাই
মেডলখানা জিতন চাই।
চাইয়া দেখ চোখ মেইলা দেখ
সোনাইল্যার হাশেম শেখ।[১]

মেলায় কবির লড়াইয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সোনালিয়ার হাশেম শেখের দল এবং নয়াযুগ অপেরা যাত্রাদলের সদস্যের আগমন। টুইটাম গ্রামের সোনাই ও তার বন্ধু বছির, এক বৃদ্ধ ও তার নাতনী ছুটনী, অন্ধভিখারী ও তার পুত্র এরা সকলেই মেলায় যাচ্ছে। গ্রামবাসীর দীর্ঘ একটি বছর প্রতীক্ষার পর আসে মেলা। মেলায় এলাকাবাসী আসে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে। তাই মেলাকে ঘিরে জনমনে কৌতূহলের শেষ নেই। বৃদ্ধ দরুমিয়া মেলা সম্পর্কে জানতে চাইলে কাঠমিস্ত্রি আলতুর কণ্ঠে শোনা যায়-'বিহানে দেখি লউজং এর কূলে লাউয়াগো নাও ভিড়ছে। আর কাপড় পট্টির হেই দিকে যাত্রাদলের ছাউনি উঠছে। পান্দুয়াত্তুন আইছে হাজারি নাও। গুড়ের কলস নামতাছে শতে শতে। কাঠের জিনিসপত্র তো মেলাই উঠেছে।'[২] wKËb‡Lvjv নাটকের সূচনায় সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার মুখচ্ছবি ফুটে উঠেছে। নয়াযুগ অপেরার তিন সদস্য-রবিদাস, করিম দেওয়ান ও ছায়ারঞ্জন মহাদেবপুর স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ির দরদাম করে কিত্তনখোলার মেলায় যাবার জন্য। এমন সময় করিম দেওয়ান মুগ্ধ হয়ে যায় ফসলের মাঠ দেখে– 'ভাইবা দেখেন– ছায়া– ভারী সোন্দর স্থানটা। তিসি, মটর আর সইরষা ক্ষেতে ফুলের বন্যা লেগেছে। চোখটা খোল ছায়া।'[৩] মানিকগঞ্জ জেলা কৃষিফসলের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মাঠের ফসলের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে প্রচুর রবিশস্য ফলে। wKËb‡Lvjv নাটকে এ এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবনধারণের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সেলিম আল দীনের জন্ম যদিও নোয়াখালি অঞ্চলে, তবে মানিকগঞ্জের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র মানিকগঞ্জের তালুকনগরে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এই এলাকা ভ্রমণের ফলে বাংলার লোকায়ত জীবন তাঁকে প্রীত ও মুগ্ধ করে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের একটি সাক্ষাৎকারের বক্তব্যে এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় :

> আমি যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে ঢুকলাম এবং তখনই আমি বিয়েও করলাম, এই বিয়ের সুবাদে আমার মানিকগঞ্জ এলাকার সাথে পরিচয় হলো। এই অঞ্চলে বিচরণের ফলে আমার শিল্পভূমির এক নতুন সন্ধান যেন আমি পেলাম। আমি এস্থানে এসে বাংলাদেশের অন্তর্গত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করলাম। ধরো, আমি যখন ঘিওর পেরোলাম, প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দিগন্ত জোড়া কেবল সর্ষে ফুলের ক্ষেত দেখলাম। মনে হলো, রঙের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে। শীতকাল, কিছু কিছু মৌমাছি উড়ছে সর্ষে ফুলে ফুলে এবং মটর লতায়, দুপুরের আগে আগে আমি হেঁটে চলেছি তো চলেছিই। একটা জামগাছ ছিলো, তার নিচে বসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে যখন চারিদিকে তাকাতাম, দেখতাম, প্রায় তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে কোনো বসতবাড়ি নাই, কেবল রঙ আর রঙ। আমি কোনো একদিনের ঘটনা বলছি না। সেই দিনগুলোর কথা বলছি। কোনো দিন

> হয়তো বিস্তীর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ এক ঝাঁক শীতচর পাখি উড়ে গেল আর ওড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় কাচের ভেতর রশ্মি যেমন ঢেউ খেলে যায়, তাদের উপর রৌদ্র পড়েও তেমনি ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমি ওই অঞ্চলে যে বাড়িতেই যাচ্ছি, সেই বাড়িতেই হয় একটা ঢোল পাচ্ছি, না হয় বাঁশি পাচ্ছি, না হয় খোল পাচ্ছি। কেউ না কেউ গান বা শাস্ত্র পাঠ করছে। লোকায়ত যে ব্যাপারটা, তাঁর সন্ধান আমি এ প্রথম পাওয়া শুরু করলাম।[৪]

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ অঞ্চলে জলপথই ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। প্রবাহমান অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল এ অঞ্চলের ভূ-খণ্ডকে জালের মতো সংযুক্ত করে রাখায় জলপথই ছিল যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। ‡KËb‡Lvjv নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, নাট্যকার নদীর তীরে মেলার আয়োজন উপস্থাপনে এলাকার ভৌগোলিক ও জনজীবনের পরিচিতি তুলে এনেছেন বাস্তবসম্মতভাবে। কিত্তনখোলার মেলা জমে ওঠে নদীর তীরে। মানিকগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে খুব আকৃষ্ট ও মোহাবিষ্ট করে। নাটকের একাংশে তারই বর্ণনা রয়েছে :

> সূর্য ডুবুডুবু হতেই লউজং এর পূর্বে চাষীবউ এর হলুদ ছোপানো হাতের মতন চাঁদ ওঠে। ত্রয়োদশীর চাঁদ। দূরের গ্রামগুলির বনজ পরিবেশে কুয়াশা ও অন্ধকার ক্রমশ জমতে থকে। আর এপাশে লউজং এর পশ্চিমে মেলা জমে উঠে পুরোদমে। দূর থেকে মাজারের উঁচু শামিয়ানাটি দেখা যাচ্ছে। উত্তরে একটি প্রাচীন বটগাছ। দক্ষিণে বাঁশবন ও সুন্দিবেতের ঝোঁপ।[৫]

মানিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ জন্মে। প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে বাঁশঝাড় রয়েছে। এছাড়া এ অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য খেজুর ও তালগাছ। এখানকার খেজুর গাছের রস থেকে উৎপাদিত পাটালি গুড় সারাদেশে বিক্রির জন্য সরবরাহ করা হয়। হাজারি গুড়ের জন্য বিখ্যাত এ অঞ্চল। এখানে কৃষক, গাছি, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার ও তাঁতি প্রভৃতি পেশার মানুষের বসতি। মেলাকে ঘিরে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটে। বলা যায় নাট্যকার এ বিষয়ে নিপুণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাঠ-সমীক্ষা চালিয়েছেন। মেলায় আগত নানাবৃত্তি ও পেশার মানুষের উপস্থিতি নাট্যকার এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> লাউয়াদের ছয়টা গহনা নৌকা নদীর শান্ত জলে বাঁধা হয়েছে। ঢালুতে মুলি বাঁশের চালানের কাছে ক্রেতাদের হাঁক ডাক। ওইদিকে গুণটানা বিশাল তিনটি মহাজনী নাও। সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের নারকেল আর শুঁটকির চালান এসেছে। পান্দুয়ার হাজারি নাওতে আখের গুড়। ছোট ছোট চিতাপড়া কলস কচুরিপানার গাদি থেকে টেনে বার করা হচ্ছে। কাঠের মইতে নড়বড়ে ওঠানামা লম্বা মই

> খাড়া নেমে গেছে নৌকা থেকে কূলে। যেখানে ঢালুর শেষ-নাড়াক্ষেতের শুরু-কেরানীগঞ্জ আর তেরশ্রীর কামারেরা তিন-চারটি হাঁপর বসিয়েছে। সামনে সাজানো দা-খন্তা-কোদাল-কাঁচি-চিমটে।[৬]

হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত আবহমান বাংলা ও বাঙালির লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় মেলা উৎসব। wKËb‡Lvjv নাটকের মূল কাহিনি গড়ে ওঠে একটি মেলাকে কেন্দ্র করে। মেলার আয়োজনে নাটকের সব ঘটনা ও চরিত্রের মুখ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনাই বাবার মাজারে তিনদিন ব্যাপী মাঘী মেলা হয় এবং সেই মেলায় চারপাশের গ্রাম থেকে বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন পেশার, শ্রেণির, বর্ণের নানা রকম মানুষ এসে জমায়েত হয়। কাঁচির দোকান থেকে শুরু করে শিশুদের খেলনা, নানান ধরনের মুখোশ, চুরি, ফিতা, মাটির পুতুল, বেলুন বাঁশি, বেলুন বাঁশের বাঁশির দোকান। এছাড়া আরও আছে মাথায় ঝাঁপি নিয়ে বেদেনিরা, অলৌকিক চিকিৎসার ক্যানভাসারের আসর, বায়োস্কোপওয়ালার নৃত্যগীত বাদ্যে বায়োস্কোপ দেখানোর আয়োজন। কাশেমালির তাড়ির দোকানে রয়েছে জালা ভর্তি বাংলা মদ ছাড়াও ছোট বড় কলসে খেজুর রসের তাড়ি। কিত্তনখোলার মেলায় বড় আয়োজন যাত্রাপালা এবং কবিগানের লড়াই আর একই সঙ্গে চলে জুয়ার আসর।

সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক রীতির প্রথম নাটক wKËb‡Lvjv-র পটভূমিতে রয়েছে তিনটি উপাখ্যান। প্রথমটি টুইটাম গ্রাম থেকে আসা সোনাই ও বছিরকে নিয়ে। দ্বিতীয় আখ্যানটি 'নয়াযুগ অপেরা' যাত্রাদলের কুশীলবদের কেন্দ্র করে। আর তৃতীয়টি লাউয়া সম্প্রদায়ের নারী ডালিমনকে নিয়ে। সোনাই ও বছির দুই সখা। সোনাই পেশায় দিনমজুর আর বছির কলু। নাটকের প্রধান চরিত্র সোনাই মৃগীরোগী, তাকে ঘিরে কাহিনি আবর্তিত হয়। স্ত্রী গত হওয়ায় এখন একমাত্র বৃদ্ধ মাকে নিয়ে তার সংসার। সোনাইর প্রপিতামহ ছিল জোলা, আর বাপ ছিল চাষি। সে এখন দিনমজুর। উত্তরাধিকারসূত্রে চার বিঘা জমি ছিল তার। জীবিকার তাগিদে সেই জমি বন্ধক রেখেছে ইদু কন্ট্রাক্টারের কাছে। ইদু তাকে আরও ঋণ দিতে চায় এবং ছলে বলে কৌশলে চার বিঘা জমিই সাফ কবলা করে নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সোনাই ও বছির মেলায় এসেছে মনাই বাবার মাজারে মানত পুরা করতে। তাদের বিশ্বাস মনাই বাপের দোয়া পেলে রোগ বালাই, শোক, দুঃখ-কষ্ট-সব দূর হয়ে যাবে। তাই সোনাই মাজারে এসে বাবার দরবারে রাতের আঁধারে আকুল মিনতি করে, মাজারের ধূলি মাখে গায়ে। অপরদিকে বছিরের সংসার চলে না, তেলের ঘানিতে তার উপার্জন একেবারে শূন্য। সারাটা শীতকাল সে তাড়ি খেয়ে নেশা করে বেড়ায়, যাত্রাগান আর কবির আসরে খোল বাজায়। তার ঘরে আছে অসুস্থ স্ত্রী। বছিরের অনেক কষ্ট, ঘানির গরুটা মরে গেছে, ভাদ্রা হাটের তেলের মেশিনে

সব তিল-সরিষা চলে যায়। তাই সে মনাই বাবার মাজারে দুঃখ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় একটা রূপার টাকা দান করে। নাট্যকার এখানে গ্রামের সহজ-সরল মানুষের সংস্কার বিশ্বাসকে তুলে ধরেছেন। শোষক ইদুর শোষণের কূটকৌশল সোনাই মেলায় এসেও প্রতিমুহূর্তে টের পায়। সে কৌশলে গ্রাস করতে চায় সোনাইর শেষ সম্বল জমিটুকু। সোনাইকে ঘিরে নাটক এগিয়ে চলে। সোনাইর শঙ্কা যদি ইদু কৌশলে তার কাছ থেকে জমির দস্তখত নিয়ে নেয়। কিন্তু তার ঘনিষ্ঠ সহচর বছির তাকে সাহস যোগায় এবং প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলে: 'অরে ঘানিতে ফালায়া যদি একবার চিপতে পারতাম'।[৭] এছাড়া সোনাইর অসহায় অবস্থায় মাজারকে অলৌকিক শক্তি হিসেবে দেখে বছির তাকে শঙ্কামুক্ত করে: 'এহ– অত সোজা না। মনাই বাপের মেলা এইটা। জুর জুলুম খাটব না। হেই বাবা দোহাই। আমার সোনাই বাইয়ের যেন মঙ্গল হয়– ধূলি নিয়ে আর এই বছর যেন সইরষা বেশি হয়। আর তেলের মিশিনগুলান যেন নষ্ট হয়া যায়।'[৮] এভাবেই হাজার বছর ধরে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ পুণ্যবান সাধক ব্যক্তিদের মাজারকে বিশ্বাস ও ভরসার স্থল হিসেবে দেখেছে।

পল্লিজীবনের একঘেয়েমি ও সংসারের একটানা সংগ্রামের মধ্যে গ্রামের মেলা জানায় উৎসবের এক শুভ সংবাদ। সাধক, গায়েন, পীর এঁদের ওফাত দিবস উপলক্ষে মেলা হয়। মানিকগঞ্জ ধানের দেশ, গানের দেশ, সুফি সাধকদের দেশ। 'মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামীণ মেলাগুলো মিলিয়ে দেয় মানুষে-মানুষে, আত্মীয়-স্বজনে, জামাই-কুটুম্বে, জিনিসে-পণ্যে এবং চিনিয়ে দেয় নিজের শিল্প-সংস্কৃতি সমাজকে। এ জেলার সবগুলো উপজেলাতেই 'বারো মাসে তেরো পার্বণ উপলক্ষে অনেকগুলো মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।'[৯] মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলাধীন আছে জারিগানের অন্যতম স্রষ্টা ও প্রখ্যাত লোকশিল্পী জুলমত আলী সরকার (১৭৯৭-১৮৯৯) এর মাজার। প্রতি বছর ১৮ পৌষ তাঁর পবিত্র ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সৈয়দ কালু শাহ ফকির (১৮১০-১৯০৬) মানিকগঞ্জের সাধক। মাঘ মাসের চাঁদের ৫ তারিখ থেকে শুরু হয় ওরস শরীফ, যা ১০ দিন পর্যন্ত চলে। অলি, আওলিয়া ও সুফি সাধকের স্মৃতি বিজড়িত এ জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মাজার। এ এলাকার অন্যতম লোকশিল্পী ও লোককবি খন্দকার আজহার আলী (১৮৬৫-১৯৬০) পালাগানের শিল্পী ছিলেন। তাঁকে তালুকনগর নিজ বাড়িতে সমাধিস্থ করা হয়। সেলিম আল দীনের ‖KËb‡Lvj‖ নাটকে মনাই বাবা মূলত এই আজাহার আলী বয়াতি। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের সহধর্মিনীর বক্তব্যে তার সমর্থন পাওয়া যায় :

> ‖KËb‡Lvj‖ নাটকের কথাই ধরুন। আমার বিয়ের পর প্রথম যখন আমাদের গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়, সময়টা ছিল শীতকাল। ঘোড়ার গাড়িতে করে সোনালি সর্ষে ক্ষেতের ভেতর দিয়ে রবি শস্যের

> মদির গন্ধ বয়ে বয়ে দূর পথে যাত্রা। তারই বর্ণনা wKËb‡Lvjvi প্রথম অংশে কী চমৎকারভাবেই না এসেছে। সেই সময়েই তার পরিচয় ঘটে এ এলাকার জনজীবনের সাথে। তারই ফলশ্রুতি wKËb‡Lvjv নাটকটি। আমাদের গ্রামের আজহার বয়াতীর মাঘী মেলাই তাকে কিত্তনখোলা নাটকটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজহার বয়াতীর গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতি বছর মাঘ মাসে সারারাতব্যাপী গান গেয়ে গুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর ভক্তরা। এটাই মনাই বয়াতীর মেলা হিসেবে এসেছে এ নাটকে। ঘরোয়া এ অনুষ্ঠানের সাথে চমৎকার কৌশলে যুক্ত হয়েছে গ্রামবাংলার উৎসবমুখর মেলা। এ মেলা থেকেই গ্রাম থিয়েটারের পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল নাট্যকারের।[১০]

মনাই বাবার মাজারে একদিকে মেলা অপরদিকে রাতে চলে যাত্রাপালা। যাত্রা আমাদের লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুগ যুগ ধরে এদেশের সকল স্তরের মানুষকে আনন্দ দিয়ে আসা এই যাত্রা এদেশের জনগণের নিজস্ব শিল্প মাধ্যম। হাজার হাজার দর্শক রাত জেগে যাত্রা উপভোগ করে থাকেন। এই লোকজ শিল্প মাধ্যমটির সংরক্ষণ ও প্রসার আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্যেই জরুরি। স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশক জুড়ে যাত্রা প্রসার লাভ করেছিল। বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাত্রাদল রয়েছে মানিকগঞ্জ জেলায়। মেলা, উৎসব, লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজা উপলক্ষে লোকযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত গ্রামভিত্তিক এই লোকযাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করেন স্থানীয় জনগণ এবং দর্শক শ্রোতা। wKËb‡Lvjv নাটকের দ্বিতীয় আখ্যানটি বিকশিত হয়েছে যাত্রাদলের অভিনেতা অভিনেত্রীর সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা, তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দলের ম্যানেজারের লোভের কাছে শিল্পীদের অসহায়ত্ব প্রভৃতি বিষয়কেন্দ্রিক। মেলার মালিক ইদু যাত্রাশিল্পী বনশ্রীবালা, ছায়ারঞ্জন, রবিদাশ এদের উপরও তার শোষণের হাত বাড়িয়েছে। ইদু একদিকে যেমন সোনাই এর জমি গ্রাস করতে চায় সামান্য টাকার বিনিময়ে, তেমনি আবার টাকার বিনিময়ে যাত্রাদলের নর্তকী বনশ্রীবালার নাচও দেখে। তবে শুধু নাচ দেখেই সে তৃপ্ত হয় না, পেতে চায় আরও কিছু 'আমি সাঁঝের বেলা বনশ্রীর ঘরে যাবো।'[১০] এই অশ্লীল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় রবিদাশ ও ছায়ারঞ্জন। বনশ্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই দলের ম্যানেজার সুবল ঘোষের কাছে। কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে নিরুপায় বনশ্রী সরাসরি প্রতিবাদ করতে পারে না, তাই সে বাংলা মদ খেয়ে অভিনয় করে দ্রোহচেতনা ব্যক্ত করে। রবিদাশ এক পর্যায়ে বনশ্রীর পক্ষ নিয়ে সুবল ঘোষের মুখোমুখি হয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়: 'যাত্রাটা তোমার কাছে ব্যবসা। কিন্তুক বনশ্রীর বাঁচন মরণ। আর এসব তুমি করতিছো বনশ্রীর আগাগোড়া জানো বইলা। জান যে সে আর ফিরা যাবে না বেশ্যাপাড়ায়।'[১২]

নাট্যকার wKËb‡Lvjv নাটকে যাত্রাশিল্পী ও তার কুশীলবদের শোষিত হবার ঘটনা তুলে ধরেছেন। যাত্রার মালিক সুবল ঘোষ তার দলকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইদুর প্রস্তাবে রাজি হয়। আর জীবনের এই টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয় বনশ্রী। শেষপর্যন্ত সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। চিতায় জ্বলে তার শব :

> শবদাহের হরি-ধ্বনির সাথে আগুন দ্বিগুণ হয়। তারপর হুতাশে গুঞ্জনে শোকে স্তিমিত শ্মশানের আলো কাঁপে। দূরে পূর্ণিমার চাঁদ। নদীর ওপারে ক্ষেত তারও পেছনে মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি। মাঘের রাত্রের অনড় বাতাসগুলি আগুনের ভাপে নড়েচড়ে উঠে।[১৩]

বনশ্রী বালা ডোম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নিগৃহীত এক নারী চরিত্র। ডোম প্রান্তিক ও প্রাকৃতজন হিসেবে সমাজে পরিচিত। নাট্যকার বনশ্রী বালা চরিত্রকে বিশেষ তাৎপর্যে সৃষ্টি করেছেন। সে ইজ্জত হারানোর ভয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করে। তাই বলা যায়, বনশ্রী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এক যাত্রাশিল্পী, দ্রোহী এক নারী চরিত্র। এই নারী চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে নাট্যকারের একান্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

> বনশ্রী বালার মধ্যে আমি এক ডোম নারীর জীবন ও শিল্প চেতনার একীভূত চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। কৈশোরে যখন মনসামঙ্গল পড়ি তখন আমার বেউলার জন্য খারাপ লাগতো। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আমি দেখেছি রোরুদ্যমান নারীকে। দেখেছি উন্মাদ হিংস্র করুণ ধর্ষিতা নারীদের। তাই বনশ্রীর দিক থেকে যতোই তার জীবন আঘাতে আঘাতে বিক্ষত হয় ততোই তা হয়ে ওঠে মনসাদেবীর সমান্তরাল।[১৪]

wKËb‡Lvjv নাটকের তৃতীয় আখ্যানটি লাউয়া সম্প্রদায়ের নারী ডালিমনকে ঘিরে আবর্তিত। এর মধ্য দিয়ে লাউয়াদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পেশা-নেশা ও পূর্ব পুরুষের পেশা বদলের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। নৌকার বসতি ছেড়ে তারা বাঁচার তাগিদেই পেশা ত্যাগ করে চাষি হতে চায়। এদের মেয়েরা মাথায় ঝাঁপি নিয়ে মনিহারি বেলোয়ারি ফেরি করে বেড়ায়। এদেরই একজন ডালিমন, যার স্বামী খুন হয় লাউয়াদেরই সর্দারের হাতে অথচ সেই আবার হাত বাড়ায় ডালিমনের দিকে। এদিকে মেলায় সোনাই নজর কাড়ে ডালিমনের। ডালিমন সোনাইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, ঘর বাঁধতে চায় ডাঙায়। কিন্তু আজন্ম সংস্কার পরলোকগত স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কাও তাকে পীড়িত করে। ফলে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয় ডালিমন। সোনাইর মৃগী রোগ সারাতে ভাল্লুকের নখ দাওয়াই দিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাটে পড়ে। লাউয়া যুবক রুস্তম তাকে সোনাইর সঙ্গে ঘর বাঁধার ইঙ্গিত দিলে ডালিমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়:

'লউয়ার মাইয়া ডাঙ্গায় কুনদিন ঘর বান্ধে না।'[১৫] এভাবে এই সম্প্রদায়ের সংস্কার বিশ্বাসের দিনলিপি নাট্যকার তুলে ধরেন।

wKËb‡Lvjv নাটকে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের একটি বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। মেলায় ইদুর সাথে দেখা হয়ে যায় সোনাইর। সোনাইকে সে 'গোটকা' বলে গাল দেয়। ইদুর চক্রান্তের জালে সে আটকে যায়। কাশেমালির তাড়ির দোকানে মারামারি করতে গিয়ে সোনাই হারিয়ে ফলে তার টাকার থলি। ইদুর চেলা মালেক কূট কৌশলে সে থলি নিয়ে যায় আবার ফেরতও দেয়। এরপর মালেক তাকে জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করেসমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়। নেশার ঘোর কেটে গেলে সোনাই বুঝতে পারে এ চক্রান্ত ইদুর। ইদুর লোকজন তাকে নির্যাতন করে। ক্ষোভ আর বঞ্চনার জ্বালা বুকে নিয়ে সোনাই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছায় সে প্রতিশোধ নেবে। বছিরকে নিয়ে কামারের দোকানে যায় এবং একটি দা ক্রয় করে। মেলার মধ্যে ইদুকে সামনে পেয়ে এগিয়ে যায় সোনাই জমির প্রসঙ্গ তুলে তা সাফ কবলা করতে প্রস্তুত বলে জানায় এবং মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইদুর ওপর। দায়ের কোপে খুন করে ইদুকে। এরপর দিশেহারা সোনাইকে লাউয়া যুবক রুস্তম দুখাইপুরে যাবার প্রস্তাব দেয়। তারা সেখানে গিয়ে সাপ ধরে জীবিকা নির্বাহ করবে। সোনাই রাজি হয় এবং যাত্রা করে দুখাইপুরে। দিনমজুর সোনাই রূপান্তরিত হলো সাপুড়ে পেশায়। 'নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর wKËb‡Lvjv নাটকের বিষয়ভাবনায় শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় গণজীবনে যে শোষণ ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ জমেছে তাকেই তুলে ধরেছেন।'[১৬]

সেলিম আল দীন wKËb‡Lvjv নাটকে রূপান্তরিত জীবন সংগ্রামের এক দার্শনিক ভাবনা ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়ও রয়েছে সামাজিক রূপান্তর। এই রূপান্তরের সঙ্গে ধ্রুপদী রূপান্তরের একটা সম্পর্ক আছে। দেবতার অভিশাপে মানুষ যেমন পাথর কিংবা হরিণে রূপান্তর হয়, তেমনি বাস্তবে জোতদার চোখ শাসালো আর কৃষক উচ্ছেদ হয়ে গেল। সামাজিক রূপান্তর এ কারণে। নাটকে নিঃস্ব ইদু রূপান্তরিত শোষণ রূপে আবির্ভূত। জীবন সংগ্রামের পালায় তাঁতি হয়েছে চাষি, চাষি হলো দিনমজুর, দিনমজুর হলো সাপুড়ে। প্রতিটি চরিত্র সমাজের কোনো না কোনো অংশ দিয়ে বদলে যাচ্ছে বা রূপান্তর হচ্ছে। 'গ্রাম বাংলার শ্রমজীবী দুঃখী মানুষ যে বাঁচার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে এবং জীবিকার বদল করতে বাধ্য হয় সেই বাস্তবতাই শৈল্পিক ঐশ্বর্যে উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে।'[১৭]

wKËb‡Lvjv নাটকে শাশ্বত বাঙালির লোকজীবনের ছবি রূপায়িত হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস উঠে এসেছে নাটকে। গ্রামীণ সংস্কৃতির চর্চা থাকলে তার বিকাশ যেমন হবে তেমনি বিলুপ্তির হাত থেকেও রেহাই পাবে। মানিকগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির উপাদান মেলা, যাত্রাপালা, কবিগান, হাস্তর, কিস্‌সা, বায়োস্কোপ প্রভৃতি নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালির সংস্কৃতির সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনি নাটকে এসব ব্যবহার করেছেন। মেলা প্রাঙ্গণ wKËb‡Lvjv নাটকের মূল মঞ্চ এই মঞ্চে প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার গ্রাম বাংলার মানুষ ও তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। শামছল বয়াতীর মুখ দিয়ে কৌশলে নাট্যকার এ নাটকে বাংলা জনপদের মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কিস্‌সা শুনিয়েছেন। বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সয়ফলমুলুক বদিউজ্জামাল, মহুয়া পালা, রহিম-রূপবান পালা প্রভৃতি মেলার মঞ্চে উচ্চারিত হয়। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্তির পথে ছিল। তাকেই সেলিম আল দীন নাটকে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। 'wKËb‡Lvjv নাটকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসে এর রচয়িতার চেতনায় এদেশের লোক ঐতিহ্য-সংস্কৃতি এবং সাম্প্রতিক জীবনভাবনা নাটকটির আদ্যন্ত বিস্তৃত।'[১৮] wKËb‡Lvjv নাটকের পটভূমি একটা মেলাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু সেই মেলায় শুধু নাটকটি সীমাবদ্ধ থাকে না। তা পুরো বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মানচিত্র হয়ে দাঁড়ায়। কবিগান, যাত্রাগানের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ মানিকগঞ্জ জেলার জনপদ শীত ঋতুর প্রকৃতিসমেত এ নাটকের মেলায় উপস্থিত হয় লেখকের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব লীলায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> wKËb‡Lvjvi মেলা গোটা বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ এবং চূড়ান্ত অর্থে বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রসেনিয়াম ফ্রেমের বাইরে সহস্র বছরের বহমান জীবনলীলার সঙ্গে অন্বিত করেছে এবং কেউ wKËb‡Lvjvi মেলাকে বাংলাদেশের প্রতীক বললে তা মোটেই অত্যুক্তি নয়। সুতরাং আখ্যান পরিকল্পনা এবং সমগ্র জাতিসত্তার পরিচয়জ্ঞাপক সাংস্কৃতিক উপাদান উপকরণ নাটক মধ্যে সংস্থিত করণে সেলিম আল দীন অনন্য।[১৯]

wKËb‡Lvjv নাটকে নাট্যকার গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী জীবনচিত্র উপস্থাপন করেছেন। এ পর্বে নাট্যকার লোকজ জীবনবর্তী। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিরাট একটি পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা ছিল এদেশের নাট্য সংগঠনগুলোর মধ্যে। তখন নাট্যকারের মননে প্রাধান্য পায় 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' নির্মাণের ভাবনা। মৌলিক নাটক রচনার মাধ্যমে এই আঙ্গিক নির্মাণের কথা তিনি ভেবেছেন। বাঙালির নাট্যচর্চার নিজস্ব জীবনবোধ তিনি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। বলা যায়, এরই ফলশ্রুতিতে পাওয়া যায় wKËb‡Lvjv নাটক। 'সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের একটি

নতুন বাঁকের স্রষ্টা, স্বতন্ত্র একটি ধারা একক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করেন তিনি। তিনি স্বীয় সৃষ্টির মহার্ঘতায় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।'[২০] wKËb‡Lvj নাটকে নাট্যকারের ভাবনা একেবারে স্বতন্ত্র: 'wKËb‡Lvj থেকে আমার ভাবনা ও রচনারীতি খানিকটা হলেও স্বাবলম্বিতার পথ খুঁজে পেয়েছিল।'[২১]

wKËb‡Lvj নাটক নিম্নবর্গীয় জীবনের লড়াই রূপায়ণে নাট্যকার প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করেছেন। নাটকে সোনাই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি এবং ইদু শোষক শ্রেণির। সমাজ অভ্যন্তরস্থ শোষণ ও বঞ্চনা নাট্যকাহিনিতে প্রাধান্য বিস্তার করে কিন্তু নায়ক চরিত্র সোনাই তার শ্রেণির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে নি। ইদুকে খুন করে সে প্রতিশোধ নিয়েছে, তবে তার পালিয়ে দুখাইপুরে চলে যাওয়া নায়কোচিত গুণাবলির সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে। সংঘশক্তির কোনো উত্তাপ wKËb‡Lvj নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মূলত মানিকগঞ্জের লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতির রূপায়ণে প্রকৃতার্থে নাটকটি হয়ে ওঠে সমগ্র বাংলার সংস্কৃতির দর্পণ।

সেলিম আল দীনের অন্যতম শিল্পসফল সৃষ্টি †KivgZg½j (১৯৮৪-১৯৮৫) নাটক। বৃটিশ শাসনের অবসান লগ্নে ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তানের জন্ম, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, হাজং বিদ্রোহ, ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের অবক্ষয়িত রূপ সবই এ নাটকের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে উঠে এসেছে। প্রায় ত্রিশ বছর ব্যাপ্তিকালের নাটকটিতে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক তথ্যের ভিত্তিতে বৃহত্তর বাংলার জনজীবন ও তার সমস্যা নানা চরিত্রের মাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। †KivgZg½j নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত। নাট্যকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর হিন্দু, মুসলিম, হাজং, গারো, ক্যাথলিক, খ্রিষ্টান, জমিদার, রাজনৈতিক নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, ডাকাত মাঝি, সন্ত্রাসী এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে †KivgZg½j নাটকের পটভূমির বিস্তার ঘটিয়েছেন। নাট্যঘটনায় মূল বক্তব্য হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে সমাজের সংগ্রামশীল নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্ট এবং শোষক শ্রেণির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব। শোষক ও শোষিতের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নাটকের কাহিনি এগিয়ে যায়। এই নাটকে সেলিম আল দীন নিম্নবর্গের মানুষের জীবন ও তাদের শোষিত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন কেরামত চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সোমেশ্বরী নদীর তীরবর্তী গারো পাহাড়ের অদূরবর্তী বর্তমান শেরপুর জেলার নখলা গ্রাম থেকে কেরামত জীবনের বন্ধুর পথে পা রাখে। মানবসৃষ্ট নরকসমাজ ও সেই নরকের অধিপতি জমিদার, মহাজন, রাজনীতিবিদ, মৌলবাদীগোষ্ঠী, সামরিক জান্তা, তাদের দোসর রাজাকার, শাসকশ্রেণির শোষণ ও শোষণনীতি দর্শনে কেরামত প্রায় অর্ধ শতকের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। সোমেশ্বরী

থেকে যমুনার শাখা নদী জলসুখা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূগোলে কেরামতের বিচরণ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে শাসন শোষণের পীড়ন, বঞ্চনা, অস্থিরতা, বীভৎস মৃত্যু, রিরংসা ও অনন্ত সম্ভাবনাময় ভ্রুণের বিনাশ কেরামতকে প্রতিবাদী করে তোলে। তার সঙ্গে আছে মহাকালের সাক্ষী আকাশের আদম সুরত। বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ বর্ণনা এবং বর্ণনাত্মকরীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা †KivgZg½j নাটকটির প্রথম প্রযোজনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভিনিয়রে ব্যক্ত মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> নাটকের ব্যাপক পটভূমিতে পথিক কেরামত জীবনের কষ্ট-দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে শেষ অবধি প্রায় যীশুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। ক্রুশ বিদ্ধ যীশু ফিরে আসেনি, কিন্তু অন্ধ এবং পরিণত কেরামত শেষ গণ্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হয়তো সেখানে শুধু দোজখের অগ্নিময় অন্ধকার। অভিজ্ঞতায় প্রৌঢ় কেরামত কাহিনির ব্যাপ্তিকেও অনেক স্থানে অতিক্রম করেছে। অথচ কেরামত এ দেশেরই সাধারণ মানুষ। লোকজ বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে তাকে জাতীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে।[২২]

†KivgZg½j নাটকের কাহিনি বারো খণ্ডে পরিসমাপ্তি লাভ করে। নাটকের খণ্ডগুলো হচ্ছে এক. নখলা খণ্ড; দুই. চন্দ্রকোণা খণ্ড; তিন. ফইট্যামারী খণ্ড; চার. হিজড়া খণ্ড; পাঁচ. হাজং খণ্ড; ছয়. হাজত খণ্ড; সাত. চিগাস্থান খণ্ড; আট. একিনপুর খণ্ড; নয়. রাজাকার খণ্ড; দশ. জলসুখা পঞ্চঘাট ও বিবাহ খণ্ড; এগারো. কুসুমপুর খণ্ড; বারো চানতারা খণ্ড। নাটকের এই বারোটি খণ্ড হচ্ছে বারোটি দোজখ। একের পর এক নাটকের নায়ক কেরামত তা অতিক্রম করে যায়। প্রতিটি খণ্ডে এদেশের মানুষের শ্রেণি বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

†KivgZg½j নাটকের প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু বিচারে তার নাম নির্ণীত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার দোজখ। নখলা গ্রামের দরিদ্র চাষির সন্তান কেরামত প্রত্যক্ষ করেছে তার গ্রামে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুদখোর হরিশ মহাজন ও ভূস্বামী মির্জা সাহেব উভয়ে নানা কৌশলে কৃষকদের শোষণ করে। নখলা গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানদের চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল, কিন্তু সুবিধাবাদী মির্জা সাহেব সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করেন। জিন্নাহ সাহেবের লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনের দোহাই দিয়ে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঁধিয়ে স্বার্থ-হাসিল করেন। নখলার এই দাঙ্গায় অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান নর-নারী হয় স্বজন হারা, গৃহ হারা ও গ্রাম ছাড়া। কেরামতের পিতাও এই সময় মানুষের হাতে প্রাণ হারায়। বিমাতার সহোদয় কর্তৃক গ্রামছাড়ার হুমকিতে রাতের অন্ধকারে অসহায় কেরামত এই সাম্প্রদায়িক নরক ত্যাগ করে। †KivgZg½j নাটকের এই অংশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানান্তে ভারত ও পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের নীতি ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে ভারত আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

'চন্দ্রকোণা খণ্ড' হচ্ছে ছিন্নমূল মানুষের দোজখ। এখানে দেশব্যাপী সংখ্যালঘু নির্যাতনের ও নিপীড়নের চিত্র পাওয়া যায়। কেরামত নিজ গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নেয় খালার বাড়ি চন্দ্রকোণায়। এখানে এসে সে শুনতে পায় মুচিপাড়া উচ্ছেদের কথা। মুচিপাড়া ভাড়াটে লাঠিয়ালদের দখলে চলে যায় এবং দশরথের স্ত্রীকে ছয় মাস আগে দুইশ টাকা ঋণের দায়ে তুলে নিয়ে গেছে রশীদ ডিলার। তাই মুনশির কাছে দশরথের আকুতি 'আমার যমুইনারে আইনা দেন গো হুজুর আমার বুকের মধ্যে বিচ্ছেদের শোক আর উচ্ছেদের কষ্ট।'[২৩] সর্বহারা দশরথ এরপর দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আর কেরামত দেখে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে খালাতো বোন নওশাদীকে তার বাপ আলি মিয়া কাজে পাঠিয়েছে তালুকদার সাহেবের বাড়িতে। বন্ধ্যাত্বের অভিযোগে স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী নওশাদী সেখানে হয় গর্ভবতী। গণেশ কবিরাজের ঔষধ খাইয়ে গর্ভপাত করা হয় নওশাদীর। বাংলার নিপীড়িত নারীদের একজন সে। মানব দরদী কেরামত কলাপাতায় মুড়ে ইসলামি প্রথানুযায়ী কবরস্থ করতে চেয়ে বলে: 'ক্যা ফালামু ক্যা। মানুষের ছাও না। কাগ হগুনে ডাইয়া পিঁপরায় খাবো। তার চায়া কবর দিলে আল্লা খুশি অবো। আর য্যা বিপদের কথা কস। আমি তো আইজ রাইতের মধ্যে গেরাম ছারুম।'[২৪] এরপর গ্রামের তালুকদার তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে নওশাদীর পরিবারের সঙ্গে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। জোতদার তালুকদার রশীদ ডিলার আর মুনশিরা মুচিপাড়ার সর্বহারা মানুষগুলোর ঘর-বাড়ি দখল করে নিয়ে তাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করে। নাটকের চন্দ্রকোণা খণ্ডও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়। মূলত 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করে তখন দেশত্যাগে বাধ্য করা হতো সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়কে।

†KivgZg½j নাটকের তৃতীয় খণ্ড সামন্তবাদীদের সৃষ্ট দোজখ। কলকাতা প্রবাসী জমিদার চুন্নু মিয়া গ্রামে আগমন করলে জমিদারের নায়েব, গোমস্তা, চেলারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কৌতূহলী কেরামত জমিদার দেখতে এসে চেয়ারে বসা রুগ্ন জমিদারকে দেখে হেসে ওঠে: 'হে হে হে। এবা ক্যা। ভাঙ্গা চোরা জমিদার'।[২৫] জমিদার এতে কেরামতের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। জমিদার চুন্ন মিয়া কেরামতের দৃষ্টিতে ঘৃণা প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করতে পারেন পূর্বপুরুষের শোষণ পীড়ন অত্যাচারের কারণেই এই ঘৃণা। জমিদারতন্ত্র উঠে যাচ্ছে বলে সে আহত-ক্ষুব্ধ। জমিদার শোষকের স্থলাভিষিক্ত হবে কারখানা মালিক- অর্থাৎ সামন্তবাদের উচ্ছেদে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করবে। উৎপাদক কৃষকশ্রেণি

ভারতবর্ষীয় বঙ্গীয় সমাজে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করেছে। তার ফলশ্রুতিতেই উচ্ছেদ হতে যাচ্ছে জমিদারি প্রথা। চুন্নু মিয়া কারখানার মালিক অপেক্ষা জমিদারকে শ্রেয় মনে করে। 'জমিদারি উঠে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ ডাক্তার দোষ আর গুণ মিলিয়ে আমরাই সবার সেরা মানুষ। আমাদের মেজাজ ঐ কারখানার মালিকদের মতো মেকানাইজড নয়।'[২৬] চুন্নু মিয়া তাই কেরামতের মতো নিরাপরাধ কৃষকসন্তানকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার অপরাধে গাল দেয। তার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে। নাট্যকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ক্ষোভের স্বরূপ উপস্থাপন করেন:

> চুন্নু মিয়া। এসেম্বলিতে জমিদারি উচ্ছেদের কথা চলছে। কিন্তু এই চাষার বাচ্চারা দেখবে কোনটা তাদের জন্য শ্রেয়। এই কুত্তার বাচ্চা। কেরামত প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। এই কুত্তার বাচ্চা। সময় আসবে যখন জোতদার আর ঐ নায়েবের মতো লোকদের কাছে তোরা হাঁটু গেড়ে বসবি কিন্তু এক কণা দয়া পাবি না। এই এভাবে দাঁড়িয়েছিস ক্যান। প্রতিবাদ। গোলামের বাচ্চা প্রতিবাদ। যা যা এখান থেকে যা। ডাক্তার দেখ ছোটলোকের বাচ্চাটা কিভাবে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে।ওকে সরে যেতে বলো। সরে যেতে বলো। কাছে আয় থুক কেমন মজা। আবার থু থু দেয়। হা হা।[২৭]

প্রতিবাদী কেরামতকে জমিদারের নির্মম নির্যাতনে জর্জরিত হতে হয়। জমিদারের চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও তার চোখে জল নেই। জমিদার দেখার শখ মিটেছে কেরামতের, তাই সে আবার ভিন্ন দর্শনের তাগিদে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়। যাবার আগে তার ঘৃণা জানিয়ে যায়– 'কুত্তার নগে থাকুম। গাছ তলায় হুমু। জমিদারি দেহনের শখ আছাল, মিট্যা গেছে। যাই।'[২৮] এখানে নাট্যকার এই দেশের আধা-সামন্তবাদী এবং আধা পুঁজিবাদী আবহকালের শোষিত মানুষকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করেন।

'হিজড়া খণ্ড' হচ্ছে সামাজিক প্রাকৃতিক বঞ্চনার দোজখ। কেরামতের সঙ্গে পরিচয় হয় এক হিজড়ার। মাঘ মাসের শীতের রাতে হিজড়া নিজেকে কেরামতের কাছে মদিনা সুন্দরী হিসেবে পরিচয় দেয়। মদিনার সঙ্গে ভাঙা দালানে দুই টাকার বিনিময়ে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে গিয়ে কেরামত আবিস্কার করে সে হিজড়া। রাগে ক্ষোভে দুঃখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে কেরামত। কিন্তু হিজড়ার বেদনার্ত জীবনকাহিনি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই কেরামতের হৃদয় সমবেদনায় বিহ্বল হয়ে ওঠে, সহানুভূতি জানায়, আবার ক্ষুব্ধও হয়ে ওঠে। 'দুকখিত মদিনারে আদর দেও বাবা,— তোমার তারার ফুলকি আগুনে জালায়া দেও ঠকগো ঘর বাড়ী। না অয় দেও আমার এই পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচ সইলতা এত দুঃখ যে সংসারে হে সংসারে আমি আগুন লাগায়া দেই'।[২৯] এরপর কেরামত হিজড়ার সঙ্গে বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করলে

দুঃখে এবং আত্মযন্ত্রণায় নিরুদ্দেশ হয় হিজড়া। 'সেলিম আল দীন হিজড়া খণ্ডে মানুষের ক্লীবত্বের যন্ত্রণাকে তার জন্মের অর্থহীনতার প্রেক্ষাপটে সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেন।'[৩০]

'হাজং খণ্ড' প্রতিবাদীর দোজখ। কেরামত এরপর যায় উপজাতি হাজংদের অঞ্চলে। সে যেন এক পর্যটকের মতো বঙ্গভূমি ঘুরে বেড়ায়। কেরামত শুনেছিল এই অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোমুগ্ধকর সবুজ শ্যামল ইচ্ছামতির দেশ। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে ভিন্ন চিত্র। পাকিস্তানিদের অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত হাজং সম্প্রদায়। তারা তখন তঙ্ক বা খাজনা না দেওয়ার জন্য মরণ পণ লড়াই সংগ্রাম করছে জমিদারদের বিরুদ্ধে। ফলে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে হাজং নেতৃবৃন্দ। হাজং নেতা মাখল লালকে পুলিশ হত্যা করে আর আরেক নেতা মঙ্গল সরকারও আছে আত্মগোপনে। এমন সময় হাজংরা বাঙালি কেরামতকে বন্দি করলে মঙ্গল সরকার তাকে মুক্ত করে। তার কাছেই কেরামত জানতে পারে হাজংদের উপর জমিদারের শোষণ বঞ্চনার বৃত্তান্ত। মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মাখনলাল হত্যার বিচার দাবি করে: 'আমলা মুরিব হার না মানিব। জুরকে দেওয়া তঙ্ক পরথা- ন মানি ন মানি। ইনকিলাব- জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি- জিন্দাবাদ।'[৩১] পাকিস্তানি পুলিশের অত্যাচারের করুণ কাহিনি শুনে কেরামত সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্রোহী হাজংদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লড়াই করবে জমিদারের বিরুদ্ধে: 'যতো অমাবস্যা তত তারা-কিসের ডর-কিসের ডর। মার যতজনে অত্যাচার করে বেবা করে মাত্র খুন কর খুন কর। কুত্তার বাচ্চাগরে।'[৩২] আর তখনই সে পুলিশের হাতে বন্দি হয়। cKivgZg½j নাটকের বিষয়বস্তুতে শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব উপস্থাপন প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> শোষক ও শোষিতের জীবন চিত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মঞ্চের একটি উল্লেখযোগ্য নাটক এটা। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা চারপাশের জনজীবন এবং তার সমস্যা আশ্চর্যভাবে এ নাটকে উঠে আসে। সে চেনাজীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে কেরামত। রূঢ় বাস্তবের কঠিন ভূমিতে দাঁড়িয়ে নাট্যকার জীবন সম্পর্কে কোনো অযাচিত ভাবালুতার প্রশ্রয় দেননি।[৩৩]

'হাজত খণ্ড' জাগতিক জেল দোজখ। এরপর শুরু হয় কেরামতের হাজতে বাস। হাজতে পাঠাবার পূর্বে ইপিআর-এর সৈনিকরা কেরামতকে কৃষক সমিতির সদস্য এবং কমিউনিস্ট মনে করে তার শরীরে নির্মম অত্যাচার চালায়, ফলে কেরামতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঘা হয়ে যায়, শরীর থেকে পুঁজ পড়ে। বিনা বিচারে এক নাগাড়ে আট বছর হাজত খাটে সে। হাজত খণ্ডের অভিজ্ঞতা অতীত জীবনের অর্জিত যাবতীয় অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্নতর। সমাজের দোষী-নির্দোষ বহুসংখ্যক মানুষের ঠাঁই

হয়েছে জেলখানায়। নির্দোষ কেরামতের সঙ্গে জেলে পরিচয় হয় হাজতি চাষি নুরুল ইসলাম, ভয়ংকর চশমাডাকাত, বিদ্রোহী হাজং কৃষকগণ, মিথ্যা মামলার আসামি নখলার আখিলদ্দি। এরা জেলখানায় নির্মম নিপীড়নের শিকার। অপরাধীর সঙ্গে নিরাপরাধ ব্যক্তিকে জেল খানায় আটক রাখার এই কৌশল সামরিক জান্তার। মূলত ১৯৫৮ সালের রাজনৈতিক সংগ্রাম সংক্ষুব্ধ তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিকজান্তা আইয়ুব খানের শাসনামলের চিত্র হাজত খণ্ডে বিধৃত হয়েছে। সে সময়ে সামরিক আইনের আওতায় নির্বিচারে মানুষের উপর দমন-পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়ে তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। হাজতের অভ্যন্তরে মানুষের অমানবিক জীবন-যাপনের দৃশ্য দেখে কেরামতের উপলব্ধি: 'বুজছেন ভাই হাজতের হাবিয়া দোজখে নির্দুষী মানুষ যে পুড়তাছে আহারে'।[৩৪] হাজতে বসে কেরামত অতীতের স্মৃতিচারণ করে আর মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে। তার পরিচয় হয় আজমত ডাক্তারের সঙ্গে। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে পুলিশকে পিটিয়ে সে হাজত বাস করছে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি হয় কেরামতের। আজমত তাকে আশ্বাস দেয়, মুক্তি পেলেই সে কেরামতকে লেখাপড়া শেখাবে, কম্পউন্ডার বানাবে এবং গারোদের দেশে গিয়ে দুজন মিলে বসতি গড়ে তুলবে। তারপর একদিন কেরামত হাজতের হাবিয়া দোজখ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং মুক্তির স্বাদ উপভোগ করার লক্ষ্যে সে যাত্রা করে ময়মনসিংহের দিকে, গন্তব্য এবার চিগাস্থান।

'চিগাস্থান খণ্ড' হচ্ছে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সৃষ্ট দোজখ। গারোদের দেশ এটা। আজমত ডাক্তারের চিকিৎসা করে কম্পাউন্ডার কেরামত। বাস্তুচ্যুত কেরামত বিরিশিরির গারো পাহাড় অধ্যুষিত অঞ্চলে উপস্থিত হলে আর এক নারকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। খ্রিষ্টান মিশনারির সদস্যগণ চার্চ প্রতিষ্ঠার পর অনগ্রসর গারো সম্প্রদায়কে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিতে শুরু করে। নিরন্ন জীবনে অনেকে মিশনারিদের সহযোগিতা গ্রহণ করে। ফলে গারোদের আদিম ধর্মমত (সাংসারিক ধর্মের) ও ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মের বিরোধ এখানে তীব্রতর হয়। গারোদের রয়েছে আলাদা সংস্কৃতি। গোষ্ঠী সমাজের মাতৃতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় বসবাসরত গারো নৃগোষ্ঠী প্রকৃতিপূজক অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদী। নিরক্ষর গারো বাঙালি মুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের এড়িয়ে চলে। আদিবাসীদের খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য মিশনারি উডওয়ার্ড তৎপর। কেরামতকেও খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে চায়। ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের বাড়ি ঘর ঘেরাও করে আদিবাসী গারোরা। এমনকি তাদের কেউ মারা গেলে শেষ কৃত্য নিয়ে খ্রিষ্টান আর আদিবাসীদের মধ্যে কলহ বাধে। খ্রিষ্টানদের নির্যাতনে গারোরা রক্তাক্ত হয়, নিহত হয় আদিবাসী

গামজিসহ আরো তিনজন। এরপর গারোরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয় অত্যাচারী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে। যেমন:

> উষণ কান্দস ক্যা মাখাল। অস্ত্র পূজা করুম আইজ থিকা আবার। শত বছর আগে আমাগো পূর্ব পুরুষরা ইংরেজ গো বিরুদ্ধে নারাই করে পাই। বংশের পর বংশ আমরা হেই অস্ত্র কি রাইখা দেই নাই। আমরা চিগাস্থান থিকা আরো উত্তরে বসতের খোঁজ পাইছি একটা। ওয়ানগাল্লার পরে আমরা পঁচিশ ঘর সাংসারেক এই স্থান ছাইরা চইলা যামু। তারপর এক এক রাইতে লুঠ করবার আসুম। আগুন আর রক্তে ভাসায়া দিয়া যামু চিগাস্থানের মাটি।[৩৫]

চিগাস্থানে যখন গারোদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে দ্বন্দ্ব-কলহ চরম আকার ধারণ করেছে তখন কেরামত একদিন দূর থেকে শুনতে পায় জয় বাংলার আগমনের সংবাদ। আজমত ডাক্তার তাকে জানায় 'হ আমরা স্বাধীন হয়া যামু। পশ্চিমারা আমাগোরে এদ্দিন খালি ঠক মারছে'।[৩৬] নাট্যকার ১৯৪৬ সাল থেকে ইতিহাসের নানা ঘটনার ঢাল বেয়ে †KivgZg½j-Gর আখ্যান নিয়ে আসেন ১৯৭১ সালে। †KivgZg½j নাটকের বিষয়ের বৈচিত্র্য ও ব্যাপক পরিধি বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়:

> বিরাট পটে বিস্তৃত এ নাটকের বিশাল আখ্যান ভাগে যন্ত্রণা- বঞ্চনা, আর প্রচারণায় বিক্ষুব্ধ পথিক কেরামত কায়েমী স্বার্থন্বেষী মহলের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নৃসংশ হত্যাকাণ্ড, উন্মত্ত পৈশাচিকতা, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে বেদনার্ত চোখে।[৩৭]

†KivgZg½j নাটকের 'একিনপুর খণ্ড' হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনীর সৃষ্ট দোজখ। এখণ্ডেই প্রত্যক্ষ করা যায় ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ কালোরাতের বিভীষিকাময় ঘটনাবলি। স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামের পথে জয় বাংলার মিছিল নামে, শোনা যায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। রাতে কামানের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আজমত ডাক্তার ও কেরামতের। কেরামত একদিন বেতারে শুনতে পায় পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝিনাই নদীর উপারে অবস্থান নিয়েছে। আর বঙ্গভূমি জ্বলে উঠেছে মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য। পাঞ্জাবি সেনারা গ্রামে গ্রামে ঢুকে ধর্ষণ, গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগে সব কিছু পুড়িয়ে দিচ্ছে। এসময় ভীত সন্ত্রস্থ গ্রামবাসীকে কেরামত জয় বাংলার কথা বলে তাদের সাহস যোগাতে চেষ্টা করে। এদিকে পাকিস্তানপন্থী ফজল মিয়ারাও গ্রামের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তৎপর। এই স্বাধীনতা-বিরোধীরা আজমত ডাক্তার ও কেরামতের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। তখন তারা দুজন যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই মধ্যে জানা যায়, যমুনার গাঙ্গে মুক্তি সেনারা পাঞ্জাবিদের একটি অস্ত্রের জাহাজ লুট

করতে সক্ষম হয়েছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন প্রতিরোধ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় এবং নৃশংস পাকসেনাদের আশু বিনাশ ও অনিবার্য ধ্বংস কল্পনা করেছেন। কেননা তারা বর্বর ও অন্যায়কারী, তাদের সেই পৈশাচিক রূপের বর্ণনা এসেছে অনেকটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে :

> মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রীয় ধর্মতন্ত্রের ধ্বজাধারী ফরসা গায়ের বরণ কালো পেশাকধারী এইসব হত্যাকারী এই মেঘের জল পান শেষে কুলি করে দেখবে এক মুখ রক্ত। আর তারা রুক্ষ পাথুরে দেশ থেকে এসেছে। জলকাদা শ্যামলতা সম্পর্কে দুই চোখে ভয়াবহ ঈর্ষা ক্রোধ নিয়ে। আর তারা এই ভূগোলের ভেতরকার লালিত মানুষগুলিকে শুধুমাত্র বর্ণ ও আকৃতির অহংকারে অবজ্ঞা করে। তবে তারা যমুনার ভাঙন দেখেনি। সে ভাঙনের শব্দ শোনে নি। লবণাক্ত বঙ্গোপসাগরের তীরের জলোচ্ছ্বাস দেখেনি। বৃদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদের অকাল প্লাবন দেখেনি। এখানে জলের বাঁকে বাঁকে জোঁক আলের গর্তে গোক্ষুর কেউটে।[৩৮]

†KivgZg½j নাটকের রাজাকার খণ্ড হচ্ছে মৌলবাদের দোজখ। মুক্তিযুদ্ধে যাত্রার পথে কেরামত রাজাকারদের হাতে ধৃত হয়ে ক্যাম্পে বন্দি হয়। ক্যাম্পের টর্চার চেম্বারে তার ওপর নির্যাতনের আদেশ হয়। রাজাকার কমান্ডার তাকে জেরা করতে থাকলে নির্ভীক কেরামত উত্তর দিতে থাকে। কেননা বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ তাকে উজ্জীবিত করে, নিজের ভেতর সে শুনতে পায় কামানের গর্জন। পাকিস্তানি কমান্ডারের নির্দেশ মতো গুপ্ত সংবাদদাতা হতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে শারীরিক অত্যাচার করা হয়। মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে কবে শেষ দেখা হয়েছে প্রশ্নের উত্তরে কেরামত গতকাল খোয়াবে দেখা মুক্তি বাহিনীর বর্ণনা দিলে ক্ষিপ্ত রাজাকার কমান্ডার তাকে টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন ও জবাই করার হুমকি দেয়। কেরামতের স্বপ্নবৃত্তান্তে রাজাকার কমান্ডার আতঙ্কিত হয়ে পাক আর্মিদের দ্বারা এলাকায় অপারেশন করাতে চায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি শান্তিকমিটির নামে গঠন করে রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ বাহিনী গড়ে তোলে। পাকিস্তানি শত্রুদের সঙ্গে এসব দেশীয় শত্রুরা হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে জাতির সঙ্গে চরম বেইমানি করেছিল। নাট্যকার রাজাকার খণ্ডের স্বল্প পরিসরে তাদের অপকীর্তির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর কেরামত বন্দি জীবন থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে। বাঙালির ওপর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন দৃষ্টে কেরামতের মন যেন আপনা আপনি গেয়ে ওঠে 'জয় বাংলা, বাংলার জয়।' এভাবেই †KivgZg½j নাটকে বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনের শিল্পিত রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য স্মরণীয় :

> †KivgZg½j বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ ভূগোল কেরামতের বিচরণক্ষেত্র। ১৯৪৬-৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা লেখকের প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বিস্তীর্ণ জনপদের অজস্র মানুষ এবং বিচিত্রধর্মী নানান ঘটনাকে মঞ্চ পরিসরে উপস্থাপনের কৌশলটি wKËb‡Lvjv অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা ও শিল্পবুদ্ধিজাত।[৩৯]

জলসুখা লঞ্চঘাট ও বিবাহ খণ্ড হচ্ছে নিরাশার দোজখ। মুক্তিযুদ্ধে আজমত ডাক্তারকে হারিয়ে সে আবার নিরাশ্রয় হয়ে পথে নামে। দুঃখ তাড়িত কেরামত জলসুখা নদীর লঞ্চঘাটে এসে উপস্থিত হয় তখন ১৯৭২ সালের মধ্য মাঘ মাস। সদ্য স্বাধীন দেশের নানা সংকট নিয়ে কথা বলে কেরামত সাধারণ মানুষের সাথে। লঞ্চে বই ফেরি করা এক যুবকের সঙ্গে তার সখ্য হয়। কেরামতের মানবিক হৃদয় বই-বিক্রেতা যুবকের প্রতি সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। এমন সময় কেরামত শুনতে পায় সোনা মিয়ার মাছের আড়তে মেয়েদের ওপর নির্যাতনের কথা। মুয়াজ্জিনের কন্যা নূরজাহানকে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায় এবং একমাস রেখে এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয় এক রাজাকার কমান্ডারের কাছে। এরপর শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নূরজাহানকে আরেক স্বাধীনতা-বিরোধী সন্ত্রাসী সোনা মিয়া নিয়ে যায়। টাকার বিনিময়ে হাত-বদল হওয়া ধর্ষিতা বীরাঙ্গনা প্রসঙ্গে গ্রামের চন্দ্রধর জানায় 'সোনা মিয়া বেরাঙ্গনা কিনে টেহা দিয়ে আবার মাছের আরতে আমাগোরে জোরজুলুম করে।'[৪০] কেরামত নূরজাহানকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে, নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচায় তাকে। বীরাঙ্গনা নূরজাহানের ভ্রুণটিকেও কেরামত নওশাদীর ভ্রুণের মতোই দাফন করে। দরদী কেরামত সিদ্ধান্ত নেয় নূরজাহানকে সে বিয়ে করবে। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয় সোনা মিয়া। এ বিয়ের ব্যাপারে নূরজাহানও আপত্তি জানায় আর ঘৃণা প্রকাশ করে বলে : 'এ বিয়া অবো না। কেয়া কইছে জয় বাংলা। থুক কেরা কইছে দ্যাশ স্বাধীন! বাজান পাপের চিন পাপের মধ্যে ফিরা যাক। আমারে সোনা মিয়ার কাছে ফেরত দিয়া আস।'[৪১] নূরজাহানের আপত্তি উপেক্ষা করে কেরামত বিয়ে করে বীরাঙ্গনা নূরজাহানকে। আর বিয়ের পরক্ষণেই মৃত্যু ঘটে তাঁর। নববধূর লাশ নিয়ে নৌকায় করে জলসুখা নদীতে যাত্রা করে নূজাহানের পৈতৃক নিবাস কুসুমপুরের উদ্দেশ্যে।

কুসুমপুর খণ্ড হচ্ছে অর্থহীন স্বাধীনতার দোজখ। কেরামত স্ত্রীর লাশের পাশে বসে স্মরণ করছে স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী বীরাঙ্গনা মা ও বোনদের। শোকে বিহ্বল কেরামত বীরাঙ্গনার লাশের পাশে বসে অবিরাম কথা বলতে থাকে। নদীর তীরের লোকজন তাদের নদী পার করে দিতে বললে কেরামত বলেছে: 'এইটা সুখের নাও– না গুদারা না– বাইচের নাওনা– এইটা দুঃখের নাও। এ

নাওতে এক বেরাঙ্গনার লাশ– এই লাশ কুসুমপুরে যায়'।[৪২] পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা সম্ভ্রম হারানো বীরাঙ্গনার কথা শুনে সকলেই স্তব্ধ হয়ে যায়। †KivgZg½j নাটকে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, রাহাজানি, বীরাঙ্গনার লাঞ্ছনা ও অবহেলা এবং স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির দাপট নাট্যকার তুলে আনেন আপন মহিমায়।

চানতারা খণ্ডকে নাট্যকার আখ্যা দিয়েছেন আর্তহাহাকারের দোজখ। কেরামত কুসুমপুর থেকে চানতারা গ্রামে আসে। সে দেখতে পায় এ গ্রামে যুদ্ধোত্তর মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্দশার চিত্র। যুদ্ধাহত রফিকের পায়ে ঘা। ঢাকা গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো টাকা নেই। টাকার জন্য জমি বিক্রি করতে চেষ্টা করেও পারে না। এদিকে স্বাধীনতা-বিরোধী মজলিশরা মশকরা করে তাকে। যুদ্ধের পরপরই সে গিয়েছিল ঢাকায় চিকিৎসা করানোর জন্য। সেখানে তাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করানোর কথা, কিন্তু গিয়ে দেখে ভিন্ন চিত্র; টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে এভাবেই অবহেলিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধা রফিক মনে করে পায়ে ঘা নিয়েই যদি মরতে হবে তাহলে সমরুদ্দির মত যুদ্ধে মারা গেলেই ভালো ছিল। সে ক্ষোভে দুঃখে মাঝে-মধ্যে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেওয়ার কথাও ভাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই করুণ অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে আরেক মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ব। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক স্বাধীনতা-বিরোধীকে– 'আমি হেই হালার পুরে খুঁজবার নইছি। যে কইছে মুক্তিগরে যুদ্ধের পাপে ধরছে।'[৪৩] চানতারা গ্রামে এসে কেরামত আরেক অভিজ্ঞতা লাভ করে। পূর্ব পরিচিত নেতা ফকিরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে জানতে পারে তার কন্যা শমলার পাগল হওয়ার বৃত্তান্ত। গোসল করতে গিয়ে কানের দুল হারিয়ে ফেলার অপরাধে স্বামী ও শ্বশুরের হাতে নির্যাতনের শিকার হয় শমলা। সেই থেকে সে পাগল হয়ে যায়। তাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এদিকে নেতা ফকিরের ছেলে ছোভান ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হয়। শমলার চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক সময়ের কম্পাউন্ডার কেরামতের উপর। শমলার দুর্দশায় কেরামত বেদনার্ত হয়। এমনি সময়ে কেরামতের সামনে এসে দাঁড়ায় বোবা ও পাগল বশর। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি স্বাধীনতা-বিরোধী লেবু খান মজলিশ প্রতারণা করে বশরের সম্পত্তি দখল করেছে। মজলিশ পরিবারের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতেও সাহস পায় না, কারণ মন্ত্রীর আত্মীয় বলে এরা স্বাধীনতা বিরোধী হয়েও ক্ষমতাধর। তবু একদিন খবর পাওয়া যায় যে, মুক্তিযোদ্ধা রফিক, তৈয়বসহ যুবকেরা মিলে ডাকাতি করেছে মজলিশের বাড়ি। লেবুখানকে বেয়নেট চার্জ করে তার লক্ষ টাকা লুট করেছে। ইতোমধ্যে একদিন জানাজানি হয় পাগলা বশরের সন্তান শমলার গর্ভে। বাবা নেতা ফকির মেয়েকে কলঙ্কের হাত

থেকে বাঁচাবার জন্য দুই মাসের ভ্রূণ হত্যা করতে চাইলে কেরামত বাধা দেয়। শমলাকে গলা টিপে হত্যা করতে চাইলে নিরুপায় কেরামত তাকে ঔষুধ খাওয়াতে বাধ্য হয়। শমলার খবর সারা গ্রামে রটে গেলে লেবু খান শতেক মানুষ নিয়ে এসে হাজির হলে নেতা ফকির, বশর, শমলা সবাই পালিয়ে যেতে পারলেও ধরা পড়ে যায় কেরামত। কেরামতের ওপর চাপে বশরের কৃতকর্মের দায়। অমানুষিক নির্যাতনে জর্জরিত হয় তার দেহ। তার দুচোখ উপড়ে ফেলা হয়। রক্তাক্ত অন্ধ কেরামতকে ছেঁড়া জুতো গলায় দিয়ে পথে বের করা হয়। চারপাশে জনতার ঢল নামে। অন্ধকার গণ্ডির উদ্দেশ্যে আবার তার যাত্রা। আহত কেরামত তখনো চায় দোজখের গণ্ডি পার হতে, আরো শাস্তি চায় নিজের, তথাপি অন্যের জন্য তার কণ্ঠে আশীর্বাদ: 'আদম সুরত বেবাক মায়ের গরভে শান্তি দিইক আরাম দেইক। শমলার পোলা য্যান ফিরা আহে নানার ভিটায়।'[৪৪] এভাবেই কেরামত একের পর এক দোজখ অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত নিজেই সমগ্র কাহিনির ট্রাজেডির নায়ক হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সেলিম আল দীনের নাট্য প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য স্মরণীয় :

> গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে বিচরণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেলিম আল দীনের প্রত্যক্ষণ। প্রত্যক্ষণকে পরিপুষ্ট দান করে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতীয় এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য-শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান অধ্যয়নজাত জীবনাভিজ্ঞতা এবং শিল্পবুদ্ধি। তিনি তাঁর নাটকের নায়ক নির্বাচনে শ্রমজীবী, ভূমিহীন, বাস্তুচ্যুত গ্রামীণ-মানুষকে প্রাধান্য দিলেন যুগগত কারণেই।[৪৫]

সেলিম আল দীনের মহাকাব্যিক পটভূমির নাটক †Ki¨gZg½j-এর ৭০টি চরিত্র রয়েছে। তার মধ্যে জমিদার, নায়েব ও উডওয়ার্ড ছাড়া বাকি ৬৭টি চরিত্রই সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির। তাদের জীবনের সংগ্রাম ও বঞ্চনার শেষ নেই। নাটকের অনেক চরিত্রের মিছিলে কেরামতের অবস্থান একাধারে কথক ও নায়কের। জনম দুঃখী কেরামত যেন সাত দোজখ প্রদক্ষিণরত। সে মানুষের রূপান্তরিত চরিত্রস্বরূপ। কেরামত তাই কখনো দাঙ্গা বিধ্বস্ত কৃষক, কখনো ক্লীব হিজড়ার সঙ্গী, বিদ্রোহী হাজং সম্প্রদায়ের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গী গারোদের বন্ধু, বীরাঙ্গনার দয়িত, কিংবা ভ্রূণ নষ্ট করা হতভাগিনীদের পিতা। সবার জন্যই দরদ, সকলের জন্যই তার অন্তর কেঁদে ওঠে। নাট্যকার বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে ক্লান্তিহীন পর্যটক কেরামতের সর্বহারা জীবনাভিজ্ঞতায় সমাজজীবনের শোষণের চালচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বঙ্গভূমির সকল বঞ্চিত-দুস্থ-নির্যাতিত-শোষিত ও প্রতিবাদী মানুষের প্রতিনিধি কেরামতকে ঘিরে উন্মোচিত হয়েছে দেশ কালের চিরন্তন মনুষ্যত্ববোধ ও আদর্শ। সেই মানবিক গুণাবলি দ্বারা সমাজ পরিবর্তন সম্ভব মূলত নাট্যকার কেরামত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এমনটাই

প্রত্যাশা করেন। সমাজের নির্মম নির্যাতনের শিকার অন্ধ ও রক্তাক্ত কেরামত এ কালের যীশুতুল্য মহাপুরুষের মর্যাদা লাভ করে। নাটকের পরিশিষ্ট অংশে কেরামতের মতো সকলে যেন সমাজের মানুষের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে আসেন এমন আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকার :

> সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী এই নাটক দর্শনে সামাজিকগণের কল্যাণ হোক। পুণ্য হোক। যে এই নাটক দেখে-সামাজিক মঙ্গল সাধনে সে যেন তৎপর হয়। অন্যায় অবিচারের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। যে এই নাটক দেখে সে যেন শমলার অপরিপুষ্ট ভ্রূণের নিরাপত্তা বিধান করে। পৃথিবীর সমস্ত ভ্রূণের জন্য যেন সে মমতার হাত বাড়ায়। মানব জনমকে সামাজিকগণ যেন স্বাগত জানায়। এই নাটক দর্শনে বন্ধ্যা নারী যেন ফলবতী হয়।[৪৬]

†KivgZg½j নাটকের এই সমাপ্তিসূচক বক্তব্য পৃথিবীর মানুষের শান্তিময় জীবনের জন্য আকুতি। তাই এই নাটকের বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক ড. আহমদ শরীফ যথার্থই বলেছেন :

> গণ-মানুষের দুঃখ মোচনের জন্যে, জীবন জীবিকায় এবং জীবনাচারে তাদের বন্ধন মুক্তির জন্যে আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির যে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তা ঘটাবার জন্যে যে বিপ্লব কাম্য তা ত্বরান্বিত ও আসন্ন করার জন্যে এই ধরনের নাটক রচনা ও প্রদর্শন আবশ্যক।[৪৭]

†KivgZg½j নাটক এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা আন্দোলন সংগ্রামকে ধারণ করে রচিত। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ক্রান্তিকালের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নির্মাণে নাটকটি পেয়েছে ঐতিহাসিক মহিমা। নাটকের নায়ক কেরামত সংঘশক্তির উত্তাপে আলোড়িত, কিন্তু সে কোনো গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আসে নি, বরং যারা লড়াই করছে চলতি পথের দুধারে তাদের সহযাত্রী হয়ে তাদের দুঃখ ধারণ করেছে। এখানেই দুর্বলতা কেরামত চরিত্রের। দীর্ঘসময় পরিসরের দর্শক কেরামত সৈয়দ শামসুল হকের bij ‘x‡bi mvivRxeb (১৯৮২) নাটকের নূরল দীনের মতো নেতৃত্ব দিতে পারেনি। wKËb‡Lvjv-এর নায়ক সোনাইও দাঁড়াতে পারে না, কেরামতও তাই। কেরামত অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। তাহলে কি নাট্যকার জাতীয় জীবনের পরাভব বা নেতৃত্ব শূন্যতা বা সামরিক শাসক কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরবর্তী জাতীয় জীবনকে এখানে নির্দেশ করেন? জাতীয় জীবনে নায়ক নেই, নাটকেও নেই নায়কের জয়। নায়ক চরিত্রের আছে পরাভব আর জয় জয়কার জোতদার, মহাজন, তালুকদার, রাজাকার এদের। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে যেমন খল নায়কদের দাপট তেমনি নাটকের খল চরিত্ররাও এখানে প্রভাবশালী। তাই হয়তো কেরামত হয়ে ওঠে না জাতীয় জীবনের বীর। আকাশের আদম সুরতের কাছে অর্থাৎ কোনো অলৌকিক শক্তির কাছে তার প্রার্থনা যেন কিছুটা বাস্তবতা থেকে দূরে। †KivgZg½j নাটকে ভ্রূণহত্যা প্রসঙ্গটি বারবার ঘুরে ফিরে

এসেছে। নওশাদী, শমলা ও নূরজাহান সমাজ অস্বীকৃত ভ্রূণ ধারণ নাট্যঘটনায় পুনঃপুনঃ আঘাত হানে দর্শক হৃদয়ে। অবৈধ ভ্রূণ সমাজের নৈতিক স্খলনকে স্মরণ করিয়ে দিলেও দর্শক শ্রোতাকে একঘেয়েমি এনে দেয়।

সেলিম আল দীন রচিত nvZ n‘vB (১৯৮৯) নাটকে বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রান্তিক মানুষের জীবন সংগ্রামের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার ছোট ছোট ঘটনার সমন্বয়ে দক্ষিণাঞ্চলের চরবাসী নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর জীবনের একটি প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন। এ নাটকের মধ্যমনি আনার ভাণ্ডারি একই সঙ্গে প্রবীণ ও নবীন প্রাচীন ভাণ্ডারি মৃত্যুর পথ থেকে জীবনের পথে উন্নীত হয়। অসংখ্য নদী যেমন এসে মোহনায় মিলিত হয় সমুদ্রের সঙ্গে তেমনি অসংখ্য টুকরো টুকরো বিচিত্র জীবন এসে মিশেছে আনার ভাণ্ডারির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনে। সেলিম আল দীন সচেতনভাবে সব নাটকেই তুলে এনেছেন বাংলাদেশের নানান পেশাজীবী ও বিচিত্র জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বমুখর সামাজিক জীবন আর তার অভ্যন্তরীণ এক মহাকাব্য। তাঁর নাটক সর্বত্রই হয়ে ওঠে সহস্রবর্ষের আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। নাবিক আনার ভাণ্ডারির নাবিক-জীবনের সমুদ্রাভিজ্ঞতার গল্প, উপকূলবাসীর জীবনচর্চা, সংস্কৃতি-সংস্কার বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সামাজিক জীবনের নানামুখী বাস্তবতা, সমুদ্রের সঙ্গে উপকূলীয় জীবনের সংঘাত-সংঘর্ষের কাহিনি nvZ n‘vB নাটকের মর্মকথা। nvZ n‘vB সম্পূর্ণ নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। কিন্তু বৃহত্তর নোয়াখালীর চরাঞ্চল থেকে বঙ্গোপসাগর, থাইল্যান্ড, ব্রাজিলের রিওডি জেনেরিও বন্দর পর্যন্ত নাটকের সীমানা পরিব্যাপ্ত। তাই একটি গ্রামকে নিয়ে রচিত হলেও বিশ্বের নানা জায়গার স্মৃতি বর্ণনে তা হয়েছে ভূগোল বিলোপী। নাটকের মূল কেন্দ্রে আছে চৌষট্টি বছরের জীবনরসিক অবসর প্রাপ্ত সারেং আনার ভাণ্ডারি। এ নাটকে কোনো একজনের একটা গল্প নিয়ে নয়, নানা চরিত্রের নানা গল্পকে একসঙ্গে বুনে একটা চমৎকার নকশি কাঁথা তৈরি হয়েছে। nvZ n‘vB নাটকের বিষয়বস্তু নাট্যপর্ব অনুযায়ী নিম্নে আলোচনা করা হলো–

nvZ n‘vB নাটকের প্রথম পর্বের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে লেদেন, মোদু ও চুক্কুনীকে ঘিরে। চর চান্দিয়ার মাছুয়ারা ছোটফেনী গাঙের পাড়ে ছোট চালাঘরের নিচে সমবেত হয়েছে। সেখানে হাইশশা গান গায় ও নাচে আর তার সঙ্গী মোক্কা ঢোল বাজায়। রসিক ও ছান্দসিক বৃদ্ধ আনার ভাণ্ডারি ঢোলের বাদ্য বাজনা শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাকে বুড়ো বলা যাবে না, ‘বুইয়া কিরে অডা-কইবি ইয়াংম্যান এইজ চিক্সটি ফোর।’[৪৮] বাকপটু ভাণ্ডারি চরের মাছুয়াদের সঙ্গে সরস বাক্য বিনিময় করে। লেদন সমুদ্রের স্বপ্নে বিভোর। থাইল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মোদু চরের দুই কুস্তিগীর ডিঙ্গা ও ইদ্রিছের

সঙ্গে চরের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করে। নাবিক মোদুর অন্তরে নতুন করে প্রেমের আবেগ জাগে হাস্নার জন্য। ভাণ্ডারির কাছে পুত্রতুল্য মোদু তার স্ত্রী বর্মী মেয়ে মাসিনূর জন্য ভালবাসা প্রকাশ করে। প্রবাস থেকে নিজ গ্রামে এসে দীর্ঘদিন পর মোদুর আর বার্মা ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। তাই পিতৃতুল্য ভান্ডারি বলেছে: 'হোমে আসি চেকের ম্যারিজ করে আর বিদেশি মাইয়াগা ভ্যালভ্যালাই কান্দে-বাঙালিগোরে এসব কারণেই ত বার্মাতুন শানটিং মারি বা-র করি দিছে। হুঁহ- উ।'[৪৯] চরের দুঃসাহসী মেয়ে চুক্কুনী তার দ্বিতীয় বিয়ে ভেঙে দিয়ে পালিয়ে চলে আসে বাপের বাড়ি। যৌবন প্রাপ্ত আইব্বার ক্রোধ ও আবেগ ব্যক্ত হয় নদীর ঘাটে। নদীতে জোয়ার দেখে জেলেরা মাছ ধরার জন্য তৈরি হয়। তাই মাল্লারা নেচে-গেয়ে পাল খাটাতে খাটতে মাস্তুলের নিচে সমবেত কণ্ঠে গান গায় এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয়। যেমন–

চল চলরে চল
মুখে আল্লা নবীর নাম-বলরে বল।
...
সপ্তমে আসিল সর খোয়াছ খিজির
দমে দমে জপ নাম করবে জিকির
চল চলরে চল॥[৫০]

দ্বিতীয় পর্বে নাট্যকাহিনিতে প্রাধান্য পায় ভাণ্ডারির ক্ষিতীশ গোয়ালার সঙ্গে কথোপকথন ও জাহাজের মৃত সঙ্গীদের সঙ্গে তাস খেলা। এছাড়া সে টঙের কাছে তোলা শনে ছাওয়া ঘরটিতে একা একা বসে তাস খেলে আর কথা বলে অদৃশ্য খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে। নিজেই একা একা কখনো হাসছে আবার কখনো ক্ষেপে উঠছে। ভাণ্ডারির জীবনে দুঃখ হলো তার দুটি ছেলেই নিরুদ্দেশ। এখানে তার ঘরছাড়া কনিষ্ঠ পুত্র জামালের প্রসঙ্গ রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় পর্বে উপকূলবাসীর ঐতিহ্যবাহী বলি খেলা চলে চরের ইদ্রিছ ও ডিঙ্গার মধ্যে। ঢোল বাদ্য বাজনার মধ্যে চরবাসী বলি খেলা উপভোগ করে। খবর আসে জেলে পাড়ার সুনীল ঝড়ের কবলে সাগরে ডুবে মারা যায়। তার স্ত্রী সীতা স্বামীর মৃত্যুকে মেনে নিতে পারে না। মোমিন মাঝির কন্যা দুঃসাহসী চুক্কুনীর স্বামীর ঘর ছাড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে ভাণ্ডারির সঙ্গে আলাপ হয়। চরের সংগ্রামী নারী চুক্কুনী। এই যুবতী নারী নির্ভীকতার পরিচয় দেয় স্বামীর সংসার ত্যাগের মধ্য দিয়ে। নেশাগ্রস্ত স্বামীর নির্যাতন ও অবহেলা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসেছে।

প্রাণোচ্ছল চুক্কুনী চোখে কাজল, কপালে কালো টিপ, নাকে সুনীল নাকফুল আর সবুজ শাড়ি পরে চরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এসে ভাণ্ডারিকে জানায় স্বামীর ঘর ছাড়ার প্রকৃত কারণ:

> চুক্কুনী আঁর বাপে মাত্র পাঁচশতগা টেঁয়া খাই বিয়া দিল মাঘ মাসের তেইশ তারিখে। মাঝির বেডা খেলাধন যাই দেখি যে আল্লায় দিলে তার আগের বৌ আছে দুগা। ইগগার সান্নি-হারাদিন চেতি থাকে। আর ইগগা-পটের বিবি-খালি শাড়ি বদলায়। কয় ওই বান্দি-পানি আন-ওই বান্দি-মরিচ বাট।[৫১]

চরের ভেড়া চোর লুত্তার কৃতিত্ব সে পাঠা, ভেড়া, গরু, ছাগলসহ গবাদি পশু চুরি করায় পারদর্শী। চুরি করা তার নেশা ও পেশা। কেননা সে মাঠের কাজ ও মাছ ধরার কাজ করতে পারে না। চরবাসীর কাছে বিস্ময় জাগে যে, লুত্তা যাদু জানে। আর সে জাদুর বলে অনায়াসে চুরি করতে পারে অথচ ধরা পড়ে না। লুত্তাও জানায় কাশ্মীরের হাটের এয়াকুব সর্দারের কাছে শেখা চুরির মন্ত্রের কথা। এছাড়া সে আনার ভাণ্ডারিকে শোনায় চরের চলে জোতদারদের অত্যাচারের নির্যাতন ও লুটতরাজ কাহিনি: 'লুত্তাদের চোর কইয়েন না দাদা– লুত্তা ঐ জোতদারগো লুটের মালের ভাগিদার। ইঞ্জিমান ডাইনে রাখি সোজা চৌধরীর হাট– টেকে টেকে চলি যান চর খোয়াজ– সেরা মাজন মাজুদ জোতদার।'[৫২]

নাটকের তৃতীয় পর্বের মূল বিষয় হচ্ছে ঘুড়ি কাটাকাটির খেলা। এর আয়োজক মোদু ও আমোদপ্রিয় চরবাসীগণ। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় আনার ভাণ্ডারি। গাঙের কূল উৎসবমুখর, তুমুল শব্দে ঢোল কাঁসর বাজে। এখানে ওখানে লাল, সাদা, নীল, সবুজ, বেগুন ও কমলা রঙের ঘুড়ি হাতে চরের কিশোর ও যুবকদের উপস্থিতি। মোদু ও আনার ভাণ্ডারিকে ঘিরে ভীড় জমে উঠেছে বিভিন্ন স্থানে। ভান্ডারি চির পরিচিত ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছে আজবগুবি গল্প। আনারের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিদ্দার আগমন। ওলমার হাট থেকে খবর আসে 'আঁই ওলমার হাটতুন আইসছি। আমনের সঙ্গের সঙ্গী লোকু টপাস মরণ বিছানে।'[৫৩] ঘুড়ির উজ্জ্বল বর্ণের আনন্দলোক থেকে আনার গোরখোদক হামেদালির সঙ্গে জাহাজের শ্রমিক লোকুকে দেখার উদ্দেশ্যে ওলমার হাটের উদ্দেশ্যে শোকার্ত পথযাত্রা করে। আলাপচারিতায় জানা যায়, পাশের গ্রামে কলেরায় প্রচুর মানুষের মৃত্যুর খবর। লোকুর অন্তিম শয্যা আনার ভান্ডারি মনকে বিষণ্ন করে, সেও মৃত্যুচিন্তায় নিমগ্ন হয়: 'বুক গুরগুরায় ভাই-ডরে- কানে ঝাঁ ঝাঁ করে। হায়রে জীবন। এত হাজার হাজার মাইল চরি আসি-কোই মইরবা। কই যাইবা। হেই সাড়ে তিন হাতে-হেহ।'[৫৪]

হাস্না ও মোদুর প্রণয় কাহিনি নাটকের চতুর্থ পর্বে প্রাধান্য পায়। হাস্না জানে মোদুর বার্মার স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাই মোদুর চর পরিত্যাগের আশাঙ্কায় হাস্না ভীত: 'অচিন কথা শুইনলে ডর লাগে-বুঝি অচিন মানষ আবর অচিন দেশে চলি যাইব।'[৫৫] ভাণ্ডারির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিদ্দার স্ত্রী বেগমী দুশ্চিন্তা করে দেবর জামালের জন্য। এক বছর যাবৎ তার কোনো খোঁজ মেলে নি। সে পারলৌকিক চিন্তায় অধীর হয়ে উঠে, শ্বেত-শুভ্র পোশাক পরে এবং তৌবা করার সিদ্ধান্ত নেয়। 'চার ইঞ্জিমানে চলি যা মছলন শারে খবর দিবি যে বাজানে তৌবা কইরবো। আর আসনের সমে এক ছড়া মক্কা শরীফের ফড়ু আলা তসবি আইনবি'।[৫৬] রাতে সহজিয়াপন্থী কায়া সাধক মছলন শার জন্য আনার ভাণ্ডারির অপেক্ষা। চর তমিরুদ্দি, টুবা, দিঘলীর চরাঞ্চলে কলেরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এক মৃত জনপদের গন্ধ নিয়ে আসে মছলন শা।

নাটকের পঞ্চম পর্বে বর্ষা ঋতুর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আনার ভাণ্ডারিকে বিমোহিত করে। সে আগের চেয়ে খানিকটা মৃত্যুচিন্তা মুক্ত। আষাঢ়ের মেঘে মেঘে তার প্রফুল্লতা বেড়েছে। তার ভেতরে তৌবা ভাঙার অনুকূল পরিবেশ নিয়ে আসে যেন ভোরের রোদ ও দুধ দোহনের শব্দ। ক্ষিতীশ গোয়ালার উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে: 'আইজ ঘরের নামায় যে দুধ দুইলিরে ক্ষিতীশ-চিঁচু চিঁচু জাগি-চাই যে দুধের ফেনার লগে বউ সাজনির আলতা রইদে মেঘে মিলিমিশি গেছে- ফজরের নামাজের কারবার শেষ।'[৫৭] এই পর্বে দুধের দইতে উত্তরণের নৈসর্গিক প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়। নাড়ু মা ও বোনের আহার যোগাতে নামে সীমাহীন জলে। তার কচ্ছপ শিকারের গল্প চরবাসীকে শুনিয়েছে এবং তার অভিনয় করেও দেখায়। পুরাণ আর জীবন যেখানে একাকার হয়ে এক বিন্দুতে মিলেছে। 'তুই নারায়ণের জলের মূর্তি– জলের রাজা– তরে আমি শিক গাঁথুম– খুন করুম– তুই আঁরে ক্ষেমা দে। দে ঠাউর আহার দে। ডর কি তোর জন্ম জরমান্তর আছে– আমিত নমশূদ্র– কত কষ্টে মনুষ্য দেহ ধারণ করে আছি।'[৫৮] আনার ভাণ্ডারির মনে এক প্রচণ্ড আবেগ তৈরি হয়। আনন্দপ্রবণ জীবন পিপাসু ভাণ্ডারি আবার চরবাসীর সঙ্গে তাস খেলায় মগ্ন হন।

নাটকের ৬ষ্ঠ পর্বে সে জীবনবাদী হয়ে ওঠে। মালু হাবজ ও ভাণ্ডারির কথোপকথন থেকে বুঝা যায় যে, সে ইতোমধ্যে তৌবা ভেঙে ফেলেছে। নদী থেকে ধৃত কোরাল মাছ নিয়ে উদ্যাম নৃত্য করে রসনা বিলাসে মেতে ওঠে ভাণ্ডারি। জীবনের সবটুকু রস উপভোগে ভুলে যায় পারলৌকিক চিন্তা। ধর্ম বা আখেরাতের চিন্তা নিজের মধ্যে ঠাঁই না দেওয়ায় মালু হাবজ বলেছে: 'বাউরে গেল শীতে বাতের বেদনায় বিছানে হড়ি আঁর হাতে হাত রাখি তৌবা কইরছিলেন জীবনে আর হাইশ আমোদ ন-খালি

নমাজ কলমা।'[৫৯] ৬ষ্ঠ পর্বে প্রেমিকা হাস্না ও ব্যাংককে রেখে আসা বর্মী বউ মাসিনূরকে নিয়ে মোদুর মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

নাটকের সপ্তম পর্বের শুরুতে আছে আনার ভাণ্ডারির নাতি ইন্তর খৎনা উৎসব। আয়োজন করা হয় পটকা ফোটানো, লাঠি খেলার ও নাচ গান ও বাদ্য বাজনার। ভাণ্ডারির গৃহ প্রাঙ্গণে ভেড়া জবাই করা হয় এবং প্রচুর লোকসমাগম হয়। শ্রাবণের শেষ দিকে চরচান্দিয়ার প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়ে এখানে ওখানে শুরু হয় ভাঙন। এই ভাঙনের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের সাহসী অধিবাসীরা শোকার্ত হয়ে ঘরে বসে থাকে না। পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দার বাড়ির পুকুরটির পাড় ভেঙে গেলে তারা পুকুরের তলদেশে সোনা রূপাসহ পিতল কাঁসার ঘটি-বাটি-বাসন সংগ্রহের জন্য দলবেঁধে ছুটে যায়। আনার ভাণ্ডারি সেখানে গিয়ে কাঁদা মাটি ছেঁকে পেয়ে যায় একটি সোনার টিকলি। টিকলি পেয়ে ভাণ্ডারির আনন্দের সীমা থাকে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও অপেক্ষার পর্ব শেষে আসে লেদনের স্বপ্ন পূরণের চিঠি। শিপে মাস্তুর হবার চিঠি পেয়ে লেদন ছুটে আসে ভাণ্ডারির কাছে।

nwZ n‘wB নাটকের অষ্টম পর্বের মূল বিষয় হচ্ছে আনারের কনিষ্ঠ পুত্র জামালের প্রত্যাবর্তন। নাড়ুর কাছে জামাল স্বীকার করে যে, সে জলদুস্যুদের দলে নাম লিখিয়েছে। নাড়ু যখন তাকে পায়ের পট্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে তখন জামাল স্বীকার করে। পুত্রের আগমনে আনন্দিত ভাণ্ডারি চরে জনপ্রিয় খেলা মোরগের লড়াইয়ের আয়োজন করে। চরাঞ্চলের মানুষের বিনোদন ও সংস্কৃতির পরিচয় ব্যক্ত হয় মোরগের লড়াই এর মাধ্যমে। মোদুর সঙ্গে মোরগের লড়াইতে সে জিতে যায়। জামাল নিজের জন্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। পিতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা ছিল তার মায়ের স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল কিনা জানতে চায়। পিতার কাছ থেকে সদুত্তর না পেয়ে সে রাতেই জামাল তার পিতৃগৃহ চিরতরে পরিত্যাগ করে।

নাট্যপর্ব নবম অংশে যৌতুক প্রথা ও ভাণ্ডারির জীবনাসক্তি প্রাধান্য লাভ করে। দশগণ্ডা জমি যৌতুকের বিনিময়ে লেদনের সঙ্গে শেকুর কন্যা ছেমনীর বিয়ে হয়। আনার ভাণ্ডারিকে মৃত্যু চিন্তায় স্থির রাখার প্রয়াসে মুরিদ বানাতে ব্যর্থ হয় মছলন শা। বরং সে নিজের ভেতরে উপলব্ধি করে যৌবনের উপভোগ করা নানাস্মৃতি: ‘রিওডি জেনিরোর এলিনা– ভালোত্তির লোত্তে– ব্যাঙ্ককের উঙ্গি কেপটাউনের মানকা– জিহ্বা মরে না– টকঝাল খুঁজে। গান বাজনার আবাজ তৌবার পরতুন দেখি কোন বেশকম নাই– আগে যেমন বাইজতো– অনও বাজে। মরনের কথা মনে থাকে না।'[৬০]

নাটকের দশম পর্বে আফাজ গায়েন ঝড় কমানোর উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বিপদভঞ্জন পীর খোয়াজ খিজিরের জীবনচরিত্র সঙ্গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে বর্ণনা করে। উপকূলবাসীকে ঝড়-ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। ফলে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের লোকজ নানা পীর-ফকিরের বিশ্বাস হয়ে ওঠে মজ্জাগত। দক্ষিণাঞ্চলে ঘুর্ণিঝড়ে ব্যাপকভাবে মানুষের প্রাণহানি ঘটে। নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পেতে পানির পীর বা নবি খোয়াজ খিজিরের মহিমা কীর্তন করে তারা। তাদের ভরসা ও বিশ্বাস চর চন্দিয়ার জীবন-নৌকার যাত্রীদের রক্ষা করেন খোয়াজ খিজির।

nvZ n‘vB নাটকের এগারতম পর্বে অতিরিক্ত জীবন পিপাসু হয়ে ওঠে ভাণ্ডারি। মোদু থাইল্যান্ড ফিরে যায়। কিছুদিন পরে আনার ভান্ডারি দ্বিতীয় পক্ষের মৃত স্ত্রী জমিলার ছোট বোন আঙ্কুরীকে দেখার নিমিত্তে চরটুবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে আইব্বা ও শামা মাঝির সঙ্গে দেখা হয়। নাবিকের জীবনে পাপপুণ্যের বোধ নিয়ে আলোচনা হয় আনারের সঙ্গে শামা মাঝির। যেমন:

আনার — হেই কথা যদি কন– হো হো হো– যদি হেই কথা কন– তই কই– আখেরাতের কামাই আমার এ জনমেও অইতো ন। মরণ চিন্তায় অস্থির অই এ জীবনে কত যে তৌবা কইরলাম আর কত যে ভাইঙলাম– তৌবা।

শামা মাঝি — আর আমি ত ভাঙ্গনের ডরে তৌবা করি না। সাতাইশ আডাইশ বোছর আগে– সন্দ্বীপের চর বাউরিয়া তুন বার অইছি বাপের হাত ধরি– ঐ আইব্বা হাগলায় কয় না– গাঙ্গের টেকে টেকে হোঁতের ঘষায় ঘষায় জীবন ক্ষয় করি দিছি।[৬১]

বাংলা বাজারে সন্ধ্যার কিছু আগে জেলে ও শ্রমিকদের রেস্টুরেন্টে সে পাঞ্জা খেলে। এরপর সিরাজ মাঝির কেরায়া নৌকায় উঠে বসে চরটুবার উদ্দেশ্যে। হার্মাদের ঘাটে এসে আনার ভাণ্ডারি মিলিত হয় ছকিনা নামের এক জল বেশ্যার সঙ্গে। এ সময় পাপের তীক্ষ্ম অনুভূতি জাগে তার মনে। ‘একি কইরলাম আমি- ও খোদা। যে বয়সে হাঁটু– কনুই– মেরুদণ্ড– জায়নামাজে লুডি থাইকবো– হে বয়সে আঁই একি কইরলাম। কি শরম– কি শরম– ছি ছি ছি।’[৬২] শ্মশানে এসে মদ্যপান করে এ পাপ থেকে মুক্ত হতে চায় আনার ভান্ডারি। এরপর সে পৌঁছে যায় চরটুবায় আঙ্কুরীর শ্বশুর বাড়ি।

নাট্যপর্ব বারোতম অংশে আনার ভাণ্ডারি ফিরে আসে নিজ গ্রামে। চর ইঞ্জিমানের নওশের মিয়ার বড় পুত্রের সঙ্গে হাস্নার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। লুত্তা ভেড়া চুরি করে এনে উপহার দেয় আনার ভাণ্ডারিকে। ভাণ্ডারির পুরাতন ভেড়া সুকানীর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই হয় নতুন ভেড়া ছেরাঙের। চরের আমোদপ্রিয় লোকজন এই ভেড়ার লড়াই দেখার জন্য ভিড় জমায়। হাস্না শ্বশুর বাড়ি যাবে না বলে

পালিয়ে আনারের আশ্রয়ে যায়। বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হয়। ইদ্রিছ চট্টগ্রামের কোনো একটি জুটমিলে বদলি শ্রমিকের কাজ পায় কিন্তু 'লে– অফ' এর জন্য বাড়িতে ফিরে আসে। নাড়ু পাতানো বৌদি সীতাকে বিয়ে করে। জেলে পাড়ায় কলেরা শুরু হয়। শেষ রাতে প্রচণ্ড জ্বরে চুক্কুনীর মৃত্যু হয় নিঃশব্দে ঘুমের ভেতর। লুত্তা ও নাড়ুর চরগাজী যাওয়ার সংকল্প। মালু হাবজের অসুস্থ হবার সংবাদ পাওয়া যায়।

nvZ n'vB নাটকের তেরোতম পর্বে গুরুত্ব পেয়েছে চরের ডেঙ্গুইরা পাখি শিকার। এসব পাখি ভোরে চাঁদ ডোবার পরপরই ঊষার প্রাক্কালে গাঙে নামে। শেষ রাতে জোয়ারের ফেনায় আসে বিশালাকার পাখিরা। তারপর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাটার টানে অজানা গন্তব্যে হারিয়ে যায়। বামনী নদীর দীঘল টেকে দ্বাদশী চাঁদের রাতে কয়েকজন পাখি শিকারি একত্রে হয়। মহারাণী বা পানির রাণীনামে খ্যাত ডেঙ্গুইরা শিকার করতে গিয়ে ভাণ্ডারি জোয়ারের টানে ভেসে গিয়েছিল। সঙ্গী শিকারি ইদ্রিছ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চরে পৌঁছে দেয়। ঘাটের চা-দোকানে ভাণ্ডারির এ খবর আসা মাত্র চরের বহু লোক ছুটে আসে। এদিকে জানা যায়, গাজীর চর দখল করতে গেছে লুত্তা।

নাট্যপর্ব চৌদ্দে চর চান্দিয়ার অধিবাসীরা সংজ্ঞাহীন আনার ভাণ্ডারির জন্য ঘাটে অপেক্ষা করে। নিঃস্পন্দ ভান্ডারি ও সঙ্গে বিশালাকার 'মহারাণী' ডেঙ্গুইরা পাখি নিয়ে দুজন লোক নৌকা থেকে নেমে আসে। ইজিপ্ট থেকে খবর এসেছে লেদনের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সমুদ্রসঙ্গী বদু কাচ্ছপের আগমন। জীবনবাদী বদু অসুস্থ আনার ভাণ্ডারিকে সাহস জোগায়। সাধক মছলন শা চরবাসীদের দ্বারা প্রহৃত হয় রাতে অন্ধকারে মৃত যুবতী নারীর কবরে প্রবেশের অপরাধে। আনার ভাণ্ডারির ইচ্ছানুযায়ী তার মৃত্যুর পূর্বেই কবর খোড়া হয়। মৃত্যুর এক অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসে তাকে। গোরখোদকের কাছে শুনেছে কবরে পাপী ও পুণ্যবান বান্দাদের সঙ্গে কী কী করা হবে। গোরখোদক বলেছে: 'তারপর ঠিক মতো উত্তর দিলে দেয়াল-ফুড়া অই-দোজখের আগুন নয়- বেহেশতের বাতাস লাইগবো গায়ে'।[৬৩] অত্যন্ত আশ্চর্য হচ্ছে গোরখোদক ঘুমিয়ে গেলে বিছানার তলা থেকে তাস বের করে আনার ভাণ্ডারি খেলতে থাকে। ভাণ্ডারির অসুস্থতার খবর পেয়ে শ্যালিকা আঙ্কুরীর আগমন ঘটে চরচান্দিয়ায়।

পনেরোতম পর্বে আনার ভাণ্ডারি সুস্থ হয়ে ওঠে। শ্যালিকা আঙ্কুরীকে শুনায় কিভাবে সে সারেং হয়েছে। জাহাজে জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে পরিভ্রমণের কাহিনি শুনে মুগ্ধ হয় আঙ্কুরী। ভাণ্ডারি অভাবের তাড়নায় মায়ের কানের সোনা চুরি করে এক সন্ধ্যায় ছেড়েছিল ঘর। এদিকে ডিঙ্গা চরগাজী থেকে লুত্তা ও নাড়ুর বিপর্যয়ের সংবাদ নিয়ে আসে। মধ্যরাতে লুত্তা সস্ত্রীক ভাণ্ডারির গৃহে এসে

উপস্থিত হয়। জমি দখল করতে ব্যর্থ হলেও চরগাজীর শরণার্থী পরিবারের এক বোবা মেয়ে লটকনিকে সে বিয়ে করে। ভাণ্ডারির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী জমিলার ছোটবোন অঙ্কুরী চরটুবা থেকে এসেছিল দুলাভাই এর সেবা করার জন্য। অকাল বিধবা আঙ্কুরীর অন্তরে আছে দুঃখ ও কষ্টের এক নদী। যৌবনের শুরুতে স্বামীকে হারিয়ে একমাত্র পুত্রকে নিয়ে জীবন সংগ্রামে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেই পুত্র আজ আট-দশ বছর যাবৎ নিখোঁজ। নিঃসঙ্গ ভাণ্ডারি আঙ্কুরীকে রাতে সমুদ্র ভ্রমণের নানা গল্প শোনায়। যৌবনে জাহাজী জীবনের আনন্দ ফূর্তির স্মৃতি এখনও তাকে মোহগ্রস্ত করে তোলে। নিজের সেই গল্প বলতে বলতে যেন আবার হারিয়ে যায় ভালেত্তি বন্দরে: 'এক উঁচা জাগার মাইধে ইস্টেজ– তার মধ্যে ম্যান্ডলিন বাদ্যযন্ত্র বাজায় হোলারা। আর মাইকে গান-নাচের চাইর মাইয়া। কাছে আসে বুঝি– পাকনা আপেলের ঘেরান শরীলে। এক এক ক্রু ধপাস করি টেবিলে বোতল মারে।'[৬৪]

আনার ভাণ্ডারি ব্রাজিলের রিওডি জেনিরো বন্দরের গল্পটি ছিল সমুদ্র ভ্রমণের সর্বশেষ গল্প। এখানে আনিটা আর এলিনা নামে দুই মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সারারাত ফূর্তি শেষে সকালে বিদায়ের আগে এলিনাকে পাউন্ড দেয়। এলিনা তাকে ভাংতি হিসেবে নোট ফেরত দেয়। বিশ্বযুদ্ধের আগে আনার ভাণ্ডারি ব্যাংককের এক হোটেলে যে নোট সই করেছিল অর্থাৎ নিজের নাম লিখেছিল সে নোটই এলিনা তাকে ফেরত দেয়। এতে খুবই আশ্চর্য হয় ভান্ডারি। গল্প বলতে বলতে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা জাগে তার মনে। নিজের হাতে বন্ধ করে দেয় করব। এদিকে আঙ্কুরী ফিরে যাবে স্বামীর ভিটায়, কিন্তু ভাণ্ডারির মন আঙ্কুরীর প্রতি আসক্ত হয়। নিঃসঙ্গ ভাণ্ডারির প্রেমানুভূতির উন্মেষ ঘটে। আনার ভাণ্ডারির প্রণয় ও বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করে আঙ্কুরী। ভরা জোয়ারে চরটুবার উদ্দেশ্যে আঙ্কুরী আর ভাণ্ডারির যাত্রা শুরু হয়। অবশেষে চর চান্দিয়া ছেড়ে ভাণ্ডারি আঙ্কুরীর আহ্বানে তার সঙ্গে ঘর বাঁধার উদ্দেশ্যে চরটুবায় পাড়ি দেয়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে nvZ n'vB নাটকের জীবন পিপাসু মানুষগুলোর উপাখ্যান।

সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত মানুষগুলোর জীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য নিয়ে nvZ n'vB নাটক। দিগন্ত বিস্তারী চর আর সমুদ্র। সমুদ্র তাদের জীবন-জীবিকার উৎস। সমুদ্রই বাঁচন, সমুদ্রই তাদের মরণ। বঙ্গোপসাগর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে নাটকের কাহিনি বিস্তৃত হয় এক সময়ের নাবিক আনার ভাণ্ডারির জীবন অভিজ্ঞতার সূত্রে। আর আছে চরবাসীর নানা উৎসব কুস্তিখেলা, মোরগ ও ভেড়ার লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব, খিজির নবীর কিস্‌সা, তাস খেলা, কচ্ছপ শিকারের গল্প ও অমিত জীবনীশক্তির অধিকারী আনার ভাণ্ডারির মৃত্যুকে জয় করার নানান গল্প।

নাটকে সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে আনার ভাণ্ডারি, লুত্তা, ইদ্রিছ, নাড়ু, চুক্কুনী, মোদুদের জীবনের সংগ্রাম ও বেদনার এক অসীম চিত্র। nvZ n‘vB নাটক প্রসঙ্গে পবিত্র সরকারের মন্তব্য এখানে উল্লেখ্য :

> nvZ n‘vB তুলে এনেছে নোয়াখালী সন্দ্বীপ অঞ্চলের সমুদ্রতাড়িত এক চরুয়া গ্রামকে যার পুরুষেরা অনেকেই জাহাজে করে ভূ-প্রদক্ষিণ ও উপার্জনে বেরিয়ে পড়ে। বন্দরে বন্দরে নানা নারীর স্মৃতি বহন করে ফিরে আসে, এসে গ্রামীণ জীবন যাত্রাকে আবার পুরানো পোশাকের মতো গায়ে জড়িয়ে নেয়। ... চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের জীবন স্বতন্ত্র ও অন্য নিরপেক্ষ যেন। আনারের ছেলে জামাল জলদস্যু হয়েছে। তার এক শালী চুক্কুনী শরীর বিক্রি করে উন্মত্ততা ও আত্মহননের কবলে এসে পৌঁছেছে, নাড়ু নামে এক ভাড়াটে লাঠিয়াল, কিংবা ভেড়াচোর লুত্তা, অনেকখানি জুড়ে থাকা রেঙ্গনের স্ত্রী আর জন্মের এই গ্রামের প্রতি ভালোবাসার মধ্যে ছিন্নভিন্ন নাবিক মোদু, চরের আর এক দুর্ভাগিনী হাস্না, চায়ের দোকানের মালিক ছোলতান, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে সুগ্রীবের মতো দখল করে আনা এক হিন্দু যুবক গায়েন আফাজ– বহু চরিত্র আলাদা-আলাদা গল্পের ডালপালা মেলে ধরে।[৬৫]

ভাগ্যান্বেষী আনার ভাণ্ডারি বাংলার সমুদ্র উপকূল থেকে থাইল্যান্ড, ইতালি ও ব্রাজিলসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর পরিভ্রমণের গল্প শুনিয়েছে। nvZ n‘vB নাটকের ভূগোল বিলোপী ভাবনা প্রসঙ্গে আনন্দ বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সেলিম আল দীন বলেছেন :

> nvZ n‘vB কথাটার অর্থ সাত সওদা বা সাতটি বাণিজ্য। আমার জন্মভূমি বৃহত্তর নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের সমুদ্রগামী মানুষদের লড়াকু অধিবাসীদের নিয়ে nvZ n‘vB লিখিত হয়েছে। ... এত কাছিম শিকার, মাছ-শিকার, মোরগের লড়াই, কুস্তি, ভেড়ার লড়াই, পাঞ্জা, লাঠিখেলা আঞ্চলিক জীবনের শক্তি-প্রকাশক এই অনুষঙ্গগুলো এনেছি। এর পাশাপাশি কলম্বো, কেপটাউন ভালেত্তি, রিওডি জেনিরো, জাভা, হংকং, লিভারপুল, বার্সিলোনা প্রভৃতি সমুদ্র বন্দরের নানান বিবরণ জড়ো করেছি। এ নাটকে প্রথমবারের মতো আমি বিশ্বমুখীন হবার চেষ্টা করেছি। ... নাটকটি লেখার পর মনে হচ্ছে, আমি যেন সেইসব বন্দরে আমার জন্মেরও আগে নানা জাহাজ-শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করেছি। লাবাডার স্রোত কি আটলান্টিকের বন্দরে ঘুরেছি। বিশ্বদর্শনের এক দিব্য-উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যেন। নোয়াখালীর মিষ্টি মধুর ভাষাতেই গোটা নাটকটি লেখা। এই প্রথম আমি অনুভব করছি- আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্বদর্শনের কথামালা রচনা করা যায়।[৬৬]

nvZ n‘vB নাটকের মূল কাহিনি এ অঞ্চলের বৃদ্ধ নাবিক আনার ভাণ্ডারিকে ঘিরে। যৌবনে পৃথিবীর নানান বন্দরে ঘুরেছে ভান্ডারি। বর্ষীয়ান এই ব্যক্তি জীবনের সংগ্রামশীলতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার মধ্য থেকে জীবনের ত্রিস্বাদ গ্রহণ করেছে। জন্ম-মৃত্যু-ভাঙা-গড়া ইত্যাদি সামাজিক ও পার্থিব বিষয় তার

কাছে অতি তুচ্ছ। সে বয়সের ফ্রেমে জীবন ও যৌবনকে বাঁধার পক্ষপাতী নয়। বয়সকে ভুলে সব সময় উৎফুল্ল মেজাজে থাকতে চায়, কিন্তু একদিন তাকেও মৃত্যুযন্ত্রণা ঘিরে ধরে। নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে রাখতে চায় ভাণ্ডারি। সে জীবনকে ভালবাসে; যৌবনে সে উপভোগও করেছে জীবনের স্বাদ। গোর খোদকের সাথে কথা বলতে গিয়ে আবারো তার মধ্যে জেগে ওঠে জীবনতৃষ্ণা। বার্ধ্যক্যেও তাই আনার ভাণ্ডারি শ্যালিকা আঙ্কুরীকে নিয়ে নব-জীবনের অভিসারে আরেকবার ঘর বাঁধে চরটুবায়। আনার বিচিত্র এক মানুষ। সাগর পাড়ের এক সাধারণ সারেং কিন্তু নাটকে সে সাধারণ কেউ নয়। জাহাজে জাহাজে যত দেশ সে ঘুরেছে, সব জায়গার কথা তার মনে আছে। স্বদেশ এবং পরবাসের সব বন্ধুর নাম এবং তাদের ঘিরে সব ঘটনা তার মনে আছে, সন-তারিখ পর্যন্ত। আনার ভাণ্ডারি একজন নয়। নাটকে স্পষ্টতই এক আনার ভাণ্ডারির মধ্যে দুই আনারের বাস। একবার সে অদৃশ্য মৃত্যুদূতের ভয় ভুলে নদী পাড়ের বারাঙ্গনার সাথে মেতে ওঠে আদিম খেলায়, আবার পরক্ষণেই সুতীব্র অনুতাপে সে টুপি, তসবি সহযোগে দারুণ মুসল্লি বনে যায়। পুনরায় সে অদৃশ্য বিদেশি বন্ধুদের সাথে তাস পেটায়, সাগর পাড়ের বিচিত্র ক্রিয়াকর্মের রসে মজে। জীবনপ্রীতির একটি অভূতপূর্ব চিত্র তার মধ্য দিয়ে উপলব্ধ হয়। nvZ n‘vB নাটকের আনার ভাণ্ডারি চরিত্র নির্মাণে নাট্যকার ঋণ স্বীকার করেছেন এভাবেই :

> জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক শামসুল হক এবং তাঁর পিতা-শ্রদ্ধেয় মরহুম নূর আহাম্মদ সাহেবের কাছেও হাত হদাইর ঋণ অনির্ণেয়। মরহুম নূর আহাম্মদ সমুদ্র নাবিকরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর বিশ্বের নানা বন্দরে কর্মরত ছিলেন। তাঁকে চাক্ষুষ দেখেই আনার ভাণ্ডারির একটি বাস্তব অবয়ব নির্মাণে সাহসী হই। এ নাট্যে কাছিম শিকার ডেঙ্গুইরা শিকার মোরগ ও ভেড়ার লড়াই সম্পর্কে সকল খুঁটিনাটি তথ্য অগ্রজ গৌড়জন শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে।[৬৭]

বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ অহর্নিশি আছড়ে পড়ে, তাদের একটি ভূখণ্ড নোয়াখালী। এর চরে যে মানবগোষ্ঠীর বসতি, সমুদ্র তাদের স্বপ্ন, সমুদ্রই পিছুটান। nvZ n‘vB তাই চরের মানুষদের বলা গল্প। বিবিধ পেশার বিচিত্র মানুষ, তাদের গার্হস্থ্যজীবন, ধর্মবিশ্বাস, রুচি-সংস্কার-সংস্কৃতি-আচার-আচরণ, বিধি-বিধান, অর্থনীতি সংগ্রাম প্রভৃতি একই মঞ্চে উপস্থাপনে নাট্যকারের কৃতিত্ব অপরিসীম। বঞ্চিত মানুষের জীবনের ব্যর্থতা আর স্বপ্ন ভাঙার চিত্র তুলে ধরেছেন nvZ n‘vB নাটকে। নাট্যকার তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সমান্তরালে উপকূলীয় মানুষের সংক্ষুব্ধ চরিত্র নির্মাণ করেন স্বমহিমায়। nvZ n‘vB নাটক প্রসঙ্গে নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> nvZ n‘vB এ (সাত সওদা) সেলিম আল দীন wKËb‡Lvjv বা †Kivg Zg½j এর মতোই অনায়াসে সৃষ্টি করেন এক বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের এক বর্ণাঢ্য মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমিত জীবনীশক্তির অধিকারী জীবনপ্রেমী মানুষ– নোয়াখালীর নাবিক আনার ভাণ্ডারি; যাকে ঘিরে আরও অসংখ্য মানুষ যারা প্রত্যেকেই এক একটি কাহিনী। বাংলাদেশের নদী-নালা-সমুদ্র-উপকূল থেকে তাদের জীবন ব্যাপ্ত হংকং, কেপটাউন, এডেন, রিওডি জেনিরো বা আরব সাগর, ভূমধ্যসাগর, আটলান্তিক পর্যন্ত। এই সব সাধারণ মানুষের প্রেম-প্রীতি-বিরহ-মিলন সংগ্রাম মৃত্যু জীবন-জীবিকা নিয়ে যেন এক মহা ঐকতান nvZ n‘vB।[৬৮]

nvZ n‘vB নাটকে আনার ভাণ্ডারি, হাস্না, চুক্কুনী, আঙ্কুরী, মোদু ইদ্রিছ, নাড়ু, লুত্তা, ছিদ্দা, মালু হাবজ প্রমুখ চরিত্রের অন্তর-চেতনা এক একটি সমুদ্রের প্রতীক। নাট্যকার এক নিরাভরণ গল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্তের মানুষগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করেন। আনার ভান্ডারি স্বপ্নচারী দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর জীবন্ত প্রতিভূ। এসব মানুষ একাধারে নিম্নবিত্তের এবং শোষিত শ্রেণির। এদেরও রয়েছে আলাদা একটি জীবন, নিতান্ত নিজস্ব কিছু স্বপ্ন-সাধ। ফলত nvZ n‘vB নাটকে শোনা যায় বহু মানুষের স্বপ্নভাঙার আহাজারি, বঞ্চিত জীবনের ব্যর্থতাজনিত হাহাকার। তবুও পার্থিব জীবনের সুর ও ছন্দে পাখা মেলে তাদের মন। আবহমান বাংলার অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজের প্রতিনিধি চুক্কুনী। পুরুষ শাসিত সমাজের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে নারীর মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় চরিত্রটি নির্মিত হয়। দ্বিতীয় স্বামীর অত্যাচারে ঘর ভেঙে দিয়ে নিরুপায় চুক্কুনী পথে বের হয়ে সমাজের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কচ্ছপ শিকারি নিম্নবর্গের অস্পৃশ্য মানুষ নমশূদ্র নাড়ুর নিরন্ন জীবনের অস্তিত্বের সংগ্রাম ফুটে ওঠে। এছাড়া প্রত্যক্ষ করা যায়, একদা মালু হাবজ মরণাপন্নদের ধর্মের বাণী শুনিয়েছে, অথচ সে নিজে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুভয়ে কেঁপেছে। মছলন শা আনার ভান্ডারিকে কাফনের কাপড় কাছে রাখার পরামর্শ দিতে কুণ্ঠা করে নি, সেই মছলন শা নিজেও ছুটে যায় নারী সংস্পর্শের খোঁজে। আনার ভাণ্ডারি নিজের জন্য খুঁড়ে রাখা কবর নিজেই রাতারাতি মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয় এবং অসুখ শুনে দেখতে আসা শালীর সঙ্গে নতুন করে ঘর পাতে। মূলত nvZ n‘vB নাটকের মূল কথা জীবনাসক্তি। nvZ n‘vB নাটকের জীবনাচরণ বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের চরবাসীর। সেই অঞ্চলের মানুষের আচরণ ও উচ্চারণ বাস্তব সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে নাটকের সীমানায়। তবে ভাষাগত দুর্বোধ্যতা নাটকের সাবলীল হৃদয়াঙ্গমে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। আনার ভাণ্ডারির গোর খোদকের সঙ্গে কথা বলা শেষে কবর খননের পরমুহূর্তেই আবার সে জাহাজি জীবনের মৃত সঙ্গীদের সঙ্গে তাস খেলে এই বিষয়টি অতিপ্রাকৃত আবহ সৃষ্টি করে। মৃত্যুভীত ভাণ্ডারি যখন

জলবেশ্যার সঙ্গে মিলিত হয় তখন তার পূর্বের সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। যার হাতে ছিল কাফনের কাপড়, তসবি, চেখের সামনে কবর, তারই জলবেশ্যার সঙ্গে রতিক্রিয়া প্রভৃতি ঘটনায় তার চরিত্র খানিকটা হলেও রহস্যময় মনে হয়।

সেলিম আল দীন বরাবরই দেশ-কাল, সমাজ-জীবন ও মৃত্তিকাসম্পৃক্ত লোকজ জীবন কেন্দ্রিক নাট্যরচনায় অধিক মনোযোগী ছিলেন। তিনি জীবনঘনিষ্ঠ নাট্যকার। তাঁর নাটকে আছে শ্লেষ, কৌতুক, ব্যঙ্গাত্মকভাব ও ক্ষোভ। তাঁর রচিত PvKv (১৯৯১) নাটকটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত PvKv নাটকের পটভূমি স্বৈরাচার বিরোধী নব্বই-এর রাজনৈতিক গণআন্দোলন; দ্বিতীয়ত PvKv উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে রচিত; তৃতীয়ত PvKv কথানাট্যের আঙ্গিকে নির্মিত। এ নাটকে ভূমিজ বিষয়বস্তুনির্ভর জীবনধারা অর্থাৎ লোকজ জীবনমূল নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি মঞ্চসফল জনপ্রিয় নাটক। এর নাট্যকাহিনি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র PvKv অর্জন করেছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩)। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য এবং এ ভূখণ্ডের ইতিহাস তিনি নাটকে তুলে এনেছেন স্বমহিমায়। তাঁর রচিত নাটকের বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সেলিম আল দীনের নাটকের মৌলচেতনা প্রসঙ্গে নাট্যকার সাঈদ আহমদের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় : 'সেলিমের নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায় আমাদের দেশ ও দেশের মানুষগুলোকে। তাঁর প্রায় নাটকেই উঠে এসেছে একটি জাতি, একটি ভূখণ্ড এবং পুরো সংস্কৃতি।'[৬৯]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে স্বপ্নের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এদেশে কলঙ্কিত এক রাজনৈতিক অধ্যায়ের। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ। সেনাবাহিনির প্রধান হিসেবে শফিউল্লাহকে বিদায় করে জিয়াউর রহমান সেই পদটি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন জিয়াউর রহমান। তিনি একই সঙ্গে ত্রয়ী প্রধান–সেনাবাহিনি প্রধান, সামরিক আইন প্রশাসক প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্বে থেকে নিজেকে সকল ক্ষমতার উৎস করে তোলেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হলে উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্বে থাকা আবদুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হন। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২-তে এরশাদ সামরিক আইন ঘোষণা করেন এবং সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন। এক সামরিক শাসকের বিদায়ের পর আরেক সামরিক শাসক কর্তৃক দেশদখলের প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে

ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে। ক্ষমতা দখলের পরপরই এরশাদ তার নতুন শিক্ষানীতি, বহু বিতর্কিত নানা মন্তব্য, গণবিরোধী সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুতই রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করে তোলেন। রাজনৈতিক মঞ্চে মেরুকরণ ঘটতে থাকে অসম্ভব দ্রুততায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাসদ, বাকশাল, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ওয়াকার্স পার্টি, গণ আজাদী লীগ প্রভৃতি দলের মিলিত ঐক্যে গঠিত হয় ১৫ দল। অন্যদিকে বিএনপির নেতৃতে ইউপিপি, কমিউনিস্ট লীগ, জাতীয় লীগ প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় ৭ দল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সালে ১৫ দল ও ৭ দল যুক্তভাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত ১০ দফাকে ভিত্তি করে ঘোষণা করে তাদের ৫ দফা কর্মসূচি :

> প্রথমত, অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ রাজনৈতিক তৎপরতার উপর থেকে সকল বিধি নিষেধ তুলে নিতে হবে। তৃতীয়ত, সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে এবং যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদের হাতেই থাকবে। চতুর্থত, সকল রাজনৈতিক মামলা আটকাদেশ প্রত্যাহার করে বন্দীদের মুক্তি ও গ্রেফতার হয়রানি বন্ধ করতে হবে। পঞ্চমত, মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংগঠিত ছাত্র হত্যার বিচার, দোষীদের শাস্তি, নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৭০]

১লা নভেম্বর ১৯৮৩ সালে জোটের পক্ষে সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। তখন সামরিক সরকার প্রবল আন্দোলনের মুখে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ২৫ নভেম্বর ১৯৮৪ সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। জেনারেল এরশাদ সংবিধানের যথেচ্ছ পরিবর্তন, প্রশাসন, আইন, বিচারসহ জাতীয় গণমাধ্যমসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। স্বাধীনতা-বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত করাসহ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি, দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক অস্থিতিশীলতা, ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে শোচনীয় করে তুলেছেন। এছাড়া উচ্চশিক্ষাসহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ বিপর্যস্ত করে তোলেন। কৃষি হতে বৈদেশিক বাণিজ্য পর্যন্ত অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে অস্থির নৈরাজ্য সৃষ্টির ফলে ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক দলসমূহ, ছাত্রজনতা, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের মুখে ৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ এ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বাংলাদেশ সুদীর্ঘ ১৪ বছরের সামরিকতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের পর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ জাতীয় সংসদ

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ও গণতন্ত্রের বিজয় PvKv নাটকের প্রেক্ষাপট। গণআন্দোলনে পরিচয়বিহীন এক ভাগ্যহীন যুবকের লাশ বাংলার এক গ্রামের উদ্দেশ্যে গরুর গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। গাড়ি রওনা হয়ে যায় কাগজে অস্পষ্টভাবে লেখা ঠিকানার উদ্দেশ্যে। গাড়ির চাকা অবিরাম ঘুরে চলে, কিন্তু ভুল ঠিকানার কারণে গাড়োয়ান মৃত যুবকের গ্রামের স্বজনদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। গাড়োয়ানের এই অবিরাম পথচলা ও মৃতের বাড়ির সন্ধান করাই PvKv নাটকের বিষয়বস্তু। PvKv নাটকে নাট্যকারের রাজনৈতিক মনস্কতার ছাপ রয়েছে। এই নাটকে একদিকে রয়েছে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী ও তাদের মদদপুষ্টদের নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা এবং তার বিপরীতে রয়েছে অতি সাধারণ ক্ষেতমজুর শ্রেণির অকৃত্রিম মহানুভবতা। গণআন্দোলন ও এই আন্দোলনে নিহত যুবকের লাশ বহনকারী গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের অপরিসীম মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার একটি বিশেষপ্রান্ত নাটকে উন্মোচিত হয়েছে। নাট্যকারের সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায় PvKv নাটকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> নাট্যকার আসলে নানা কৌশলে এ নাটকে সমকালের বেদনা ও মানবিক সম্পর্ককে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমকালের রাজনৈতিক বাদানুবাদের শিকার ঠিকানাবিহীন শহীদদের শবের গন্তব্যহীনতার মাধ্যমে মানবিক বোধকেই যেনো জাগ্রত করতে চেয়েছেন। বাহের গড়োয়ান, ধরমরাজ ইত্যাদি চরিত্র মানবিকবোধ সম্পন্ন হওয়ায় তা যেমন হয়েছে বিষয়ানুগত তেমনি দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে শাশ্বত মানবিকবোধে উজ্জীবিত চিরন্তন মানুষ।[৭১]

সামরিক শাসনের ফলে সৃষ্ট এদেশের আর্থ-সামাজিক ভঙ্গুরদশা PvKv নাটকে বর্ণিত হাসপাতালের চিত্র বর্ণনায় ধরা পড়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত চিকিৎসালয়টি বর্তমান জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। হাসপাতালটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। নাট্যকারের বর্ণনায় সেনা শাসনে অবহেলিত স্বাস্থ্যসেবা হাসপাতালের চিত্রে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে :

> হাসপাতালের ১০ দরোজা ২৪ জানালা॥ সবগুলো দরোজা ও চৌকাঠের রং বিবর্ণ সবুজ* সৃষ্টিকালে যে অর্থহীন রং দালানকে পরানো হয়েছিল তা আছেও নেইও॥ এসব দরোজা দিয়ে কতো রোগী ও রোগিনী ঢুকেছে বেরিয়েছে যুগপৎ চেতন এবং অচেতন। শাদা চুনকামে শেওলা পড়ে জ্বরো জ্বরো ভাব* ভেন্টিলেটরের কানে কানে মাকড়ের ঝুল চড়ুই বাসা* আর ডাক্তার দুজন* একজন অতিশয় ক্রুদ্ধ অর্শরোগী* মাঝে মধ্যে শল্য চিকিৎসায় সে ক্লোরোফরম বা লোক্যাল এনাসথেসিয়া পর্যন্ত

> ব্যবহার করে না* তখন রোগীদের নিকট চীৎকার কেবল উষ্ট্র মুখেই সম্ভবে। প্রায় আসবাবহীন এলংজানি হাসপাতালের অপারেশন কক্ষ* পলেস্তরা ঝুরঝুর ছাদে চীৎকার আঘাত খেয়ে দ্বিগুণ হয়ে শূন্য প্রায় কক্ষের জানালা দিয়ে বিশাল ও জান্তব রূপে পেছনের মাঠ পেরিয়ে দূরের গাঁয়ে চলে যায়* নিশিকালে এই চীৎকার গাঁয়ের মানুষকে এরকম ভাবায় যে নরকের অগ্নি প্রহারে অসহায় পাপীদের সাজা চলছে* কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এ হাসপাতালকে নৈঃশব্দ এসে গ্রাস করে।[৭২]

কাকেশ্বরী গাঙ্গের পারের এলংজানিগঞ্জের এই হাসপাতাল থেকে PvKv নাটকের কাহিনি শুরু। দশ দরোজা ও চব্বিশ জানালা বিশিষ্ট বিবর্ণ রঙের সবুজ হাসপাতাল। এখানেই এনেসথেসিয়া ব্যতিরেকে শল্য চিকিৎসা চলে আর রোগীর চিৎকারে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার কালো শরীরে শ্বেতীরোগী। গম্ভীর স্বভাবের ডাক্তার কর্মচারীদের কাছে বদমেজাজি ঈশ্বর নামে পরিচিত। হাসপাতালের রান্নাঘরে চাটাই মোড়া একটি লাশ থেকে মর্মান্তিক এই কাহিনির সূত্রপাত। খেজুর পাতার চাটাই মোড়া লাশের বরফ গলছে। এমন সময় সাঁওতাল ডোম ধরমরাজকে ঈশ্বরডাক্তার খুব সতর্কতার সঙ্গে ডেকে বলেছে, 'একটি সরকারি লাশ এসিছে সদর থিকে ঠিকানা মাফিক পৌঁছে দাও হুশ সাবধান অহে ধরম করম।'[৭৩] হাসপাতালের আয়া ঠুনকির মা। মানব ভ্রুণ হত্যার অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আয়া। তাই মৃত্যু ও মৃতকে সে ভয় পায় অন্য সব হত্যাকারীর মত। রাত্রি গভীর হলে অপমৃত্যুর শিকার মানুষের আত্মার নীরব আর্তনাদ যেন জীবিতের কখনও কখনও বুকে পাথর হয়ে চেপে বসে। সে কারণেই হয়তো কোনো মরা দেখলে আয়ার মমত্ববোধ জেগে ওঠে। অনামা লাশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সে মৃত যুবকের লাশ পাহারা দেয় আর অঝোর ধারায় কাঁদে এবং আপন মনে বিলাপ করে- 'চান সুজ্জি সামনে রেখে পিঠ পিছন কেবল লাশই পওরা দিমো খেলে খেলে মুনে হয় এই খালা বুইলবে লাশটা।'[৭৪] মৃতের প্রতি মমতাসিক্ত এই আয়াকে অন্যায়ভাবে কটাক্ষ করে ডাক্তার। আয়ার কান্না শুনে ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে। সে অপঘাতে মৃত যুবকের হত্যার ঘটনা আড়াল করতে চায়। 'হই হই ঠুনকির মা লাশটা কি তর বাপ লাগে যে কান্দস হাম্বাডাম্বা বন্ধ কর জানটা খায়া ফালামো সদরে না কোথায় যেন গোলমাল হয়েছিল ডাকাত পড়েছিল রাস্তায়।'[৭৫] লাশের ঘটনা গোপন রাখার হীনচেষ্টায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় হাসপাতালের ডাক্তার শাসকগোষ্ঠীর পরিপূরক। এরকম লাশ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ফল। আর সে কারণেই হত্যার কারণ ডাক্তার গোপন করতে চায়। মায়া মমতাহীন কসাই স্বভাবের ডাক্তার মাতাল ডোম ধরমরাজকে ডেকে আনে লাশ গ্রামের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য। তখন ধরমরাজ বৈশাখের সকালে গরুর গাড়ি নিয়ে ধান কাটতে যাবে এমন একটি গাড়ির তিনজন গাড়োয়ানকে পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় ঠিক করে। গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া এসব মানুষ সহজ-সরল এবং মানবিকবোধে

অনন্য। মাঠ-ঘাট শস্য প্রান্তরের মতোই উদার তাদের মন। শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন সংগ্রাম তারা বোঝে না। কিন্তু নিজেকে তারা উজার করে দিতে প্রস্তুত অপরের জন্য। হালাঙ্গা ফকিরের ষাঁড় দুটো তাদের সঙ্গী। চারজন গাড়োয়ানের একজন প্রৌঢ় পইরাত। গাড়োয়ানের সঙ্গী বাকি তিনজনের মধ্যে শুকুর চান তরুণ। সবার সঙ্গে সেও যাবে জলিধান কাটতে বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে দিল সোহাগীর বিলে। পাঁচানি গ্রামে তার অনাহারি পরিবার পেছনে রেখে সে এই প্রথম পইরাতের কাজে যাচ্ছে। তার দুচোখে পাকাধানের গুচ্ছ। দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবার সংগ্রামে তাদের দিন কাটে। এসব নিরন্ন কৃষকেরা ফসল দেখেছে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডের লাশ দেখে নি। তাই গাড়োয়ানরা এক রকম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে লাশ বহন করতে রাজি হয়। লাশ নিয়ে নানা গুঞ্জন আর সময়ক্ষেপণ হলে ঈশ্বর ডাক্তার গম্ভীর ভীতি জাগ্রত কণ্ঠে বলে- 'অহে লাশ নিয়ে এত ক্যাচাল কিসের। সরকারী রিপোর্ট আছে পোস্ট মর্টেম হয়েছে সরকার বাহাদুর স্বয়ং বাদী।'[৭৬] লাশ অনামা ঠিকানায় প্রেরণে সরকারের হীনষড়যন্ত্র চরিতার্থ করার নিমিত্তে ঈশ্বর ডাক্তার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গণআন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা যাতে না বাড়ে সে কারণে সে সতর্ক। নির্দয়, পাষণ্ড ডাক্তার রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নমূলক প্রশিক্ষণে দক্ষ। মাঠ প্রান্তরে শ্রমঘনিষ্ঠ মানুষ রাজনীতির নির্মম খেলা বোঝে না। কিন্তু কূটকৌশল অবলম্বনে শাসকগোষ্ঠী সিদ্ধহস্ত। স্বৈরশাসকের হত্যাযজ্ঞের শিকার হোসেনালির লাশ বহন করতে হচ্ছে ঐ মানুষগুলোকে যাদের ঘামে অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। স্বাধীনদেশের এরকম দুরবস্থায় নিপতিত জাতির কর্মমুখিতাই মূলত একমাত্র অবলম্বন। 'এমন সময় ধরমরাজ হাত ধরে টানতে টানতে যাকে আনে সে কেবল সোনালী খড় ও পাকা ধানের ঝুমঝুমি চেনে।'[৭৭] শ্রমজীবী গাড়োয়ান গরুর গাড়ি নিয়ে দিল সোহাগীর বিলের উদ্দেশ্যে জীবিকার জন্য পা বাড়িয়েছে। অভাবের তাড়নায় ভবিষ্যৎ জীবনের সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা গাড়োয়ানের অস্তিত্বকে একমুখী গতি দান করে। সেলিম আল দীন অত্যন্ত সজাগ ছিলেন দেশ-কালের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে। নাট্যকার সামরিক শাসনের কুৎসিত বীভৎস রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই সচেতন কিংবা অবচেতনে নাটকে এসেছে খাকি রং এর প্রতি ঘৃণা :

> খেজুর পাতার চাটাই মোড়া লাশ ভেতরে বরফ গলছে* রক্তের ধারা মিশে কিচেনের পানি নিঃসরণের পথ দিয়ে ওপাশের ড্রেনে গিয়ে পড়ছে॥ একটা খাকী রঙের কুত্তা জিহ্বায় লকলক ধ্বনি তুলে সেই শোক ও কষ্টের পানির ধারা খেয়ে নিচ্ছে বিকার নেই ॥[৭৮]

PvKv নাটকে নাট্যকার স্বাধীনতা-পরবর্তী সামরিক শাসনামলে ধর্মের ব্যবহারকে রাষ্ট্রযন্ত্রের খুব সূক্ষ্ম একটি অস্ত্র হিসেবে দেখেছেন। সাধারণ মানুষ ধর্মভীরু, সরল প্রাণ। তাই বিনিময় মুদ্রায় ধর্মের ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত সুকৌশলে। স্বৈরতন্ত্র ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। নাট্যকার

PvKv নাটকে লাশ বহনকারী গাড়োয়ানদের প্রদত্ত পঞ্চাশ টাকার নোটে বিষয়টি দেখেছেন গভীর পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিতে :

> গাড়োয়ান মসজিদ খচিত পঞ্চাশ টাকার গোলাপী নোট দেখে যতটা না নোটে আঁকা মসজিদ দেখে শূন্যে তাকায় কোন মৌলভী স্রষ্টা প্রসঙ্গে মহিমা রহমত গজব ও আবাবিল পাখী প্রসঙ্গে আকাশে তাকান না॥ এই নোটে মসজিদ থাকাতে তার সরল হৃদয় ঈশ্বর মৃত্যু ও মৃতের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়॥ লেনদেনের ফাঁকে ফাঁকে খিলান গম্বুজ মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেবার এও এক কৌশল বটে॥[৭৯]

মসজিদ খচিত একটি পঞ্চাশ টাকার গোলাপী নোট হাতে লাশ বহনে প্রথমাবস্থায় বাধ্য হয় বাহের গাড়োয়ান। এই নোটে মসজিদ থাকাতে তার সরল হৃদয় স্রষ্টা, মৃত্যু ও মৃতের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। একজন গাড়োয়ানের ভুবনে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট অনেক আশার আলো বিকিরণ করে। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত সমাজ মানুষের বিপন্ন মানসরূপ ফুটে ওঠে। হাসপাতালের ডাক্তার পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে গাড়োয়ানকে ঠিকানা মাফিক লাশ পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেয়। তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া ঠিকানাটি ছিল অস্পষ্ট। গন্তব্যে পৌঁছে দিতে গাড়িতে ওঠানো হয় লাশ। নাটকের প্রধান চরিত্র লাশ হোসেনালি এই প্রথম বাহের গাড়োয়ানের দুর্বিসহ জীবনের উপর চেপে বসে। সাঁওতাল ধরমরাজের মনে হয় এই লাশটি তাদের দেবতা ধরমঠাকুরের পোড়ামাটির মূর্তি। তাই লাশের প্রতি তার অপরিসীম ভক্তি। সে নৃত্য করে লাশ এগিয়ে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল ঠিকানায় প্রেরিত লাশটিকে সে দেবতা জ্ঞান করেছে। মদ্যপানে হুঁশহারা হলেও ধরমরাজের এই উপলব্ধি মানবিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ধরমরাজকে নাচতে নিষেধ করে উচ্চারিত গাড়োয়ানের উক্তিও দার্শনিকতায় উজ্জ্বল– 'নাচানাচি করেন ক্যা? লাশে গুনা দিবু। হু* ।'[৮০] এই সংক্ষিপ্ত সংলাপে লাশের প্রতি মানবিকতা ও স্বীয় ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা তথা গাড়োয়ানের আজন্মের সংস্কার এখানে বিশিষ্টতায় দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। গাড়োয়ানের সঙ্গী দুই পইরাত আকমল ও শুকুরচান। পৈরাত আকমলকে জীবিকার সন্ধানে যাওয়ার পরিবর্তে লাশ বহনের অজানা আতঙ্কে পেয়ে বসে। তবে অপঘাতে মৃত যুবকের প্রতি সেও সহানুভূতিশীল। নিজের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে ক্রুদ্ধ হয়ে বাহের গাড়োয়ান চরম বিরক্তির সঙ্গে লাশ বহনে অস্বীকৃতি জানায়। এ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার কিছু পরেই ধরমরাজের সঙ্গে তার বাদানুবাদের সূচনা। এক পর্যায়ে ধরমরাজ বাহেরকে সরকারি লাশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গন্তব্যে না পৌঁছালে পুলিশের ভয় দেখায়। বাহের আরও ক্ষিপ্ত হলে যুবক ও প্রৌঢ় বাহেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তাকে উদ্দেশ্য করে

বলেছে– 'আর লাশ না পৌঁছালে হু হু ছোয়াব পাবু নাকিরে বাহের। অপঘাতে মরলি পরে না খোদার হু হু ফেরেশতা কান্দে* করম হলে চলে না ধরমও লাগেরে বাহের।'[৮১]

বাহের নিজের জীবনের অন্তহীন সমস্যায় দুঃখে দারিদ্র্যে শোকে পরাভূত। তাই প্রথমাবস্থায় সে থাকে অনড়। প্রৌঢ় বলে– 'এমন করিস না বাপ* হাজার ফিরিশতারা এই লাশের পাশে* যাকের কান আছে শুনতি পায় চোখ আছে দেখতি পায়। সহসা বাহের একপাক ঘুরে নেয় বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে লাশটিকে দেখে বলে– 'হাজার ফেরেশতা?'[৮২] অন্যদিকে ডোম ধরমরাজ একাই যখন লাশ কাঁধে বহন করতে চায়, তখন সম্বিত ফিরে পায় বাহের। বাহের তাকে লাশ ছুঁতে নিষেধ করে। মদ্যপান করে পবিত্র লাশ ছোঁয়া নিষেধ। অনামা লাশের প্রতি গাড়োয়ানের এই প্রথম গভীরশ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। ফসলের মতো লাশের মর্যাদাও তার কাছে কম নয়। প্রান্তিকবাহের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। ধর্মের গভীর অনুভূতি ও বিশ্বাস তার মজ্জাগত। তাই ধরমরাজের প্রতি তীব্র ক্ষোভ নিয়ে এগিয়ে যায়: 'খবদ্দার ছুঁবে না বুইলতেছি ধস্তাধস্তি শুরু হয়* বাহের সহসা কোমরে গামছা পেঁচিয়ে তার আসনের নীচে চটের ঝোলানো থলে থেকে ঝকঝকে দা বের করে আনে। আয় আয় দেখি নাপাকের বাচ্চা মদ খেয়ে লাশ ছুঁবি?'[৮৩]

দরিদ্র গাড়োয়ান অভাবের তাড়নায় স্ত্রীর পরামর্শে কিছু বাড়তি আয়ের আশায় গরুর গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দিল সোহাগীর বিলে ধান বহন করে অর্থ উপার্জন করবে। তাই ধানের গাড়িতে লাশ বহনে তার প্রথমে আপত্তি ছিল। তবে প্রৌঢ় পৈরাতের কথায় তার মধ্যে সহানুভূতি ও মানবিকতাবোধ জাগ্রত হয়, যা নাটকের শেষপর্যন্ত অটুট থাকে। উত্তরবঙ্গে মানুষের জীবিকায় অবলম্বন হিসেবে গরুর গাড়ির প্রাধান্য দেখা যায়। রাস্তায় সচরাচরই গরুর গাড়ির দেখা মিলে। নাট্যকার এখানে অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনি নির্মাণ করেছেন। এ নাটকের বিষয়ভাবনায় অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত গরুর গাড়ি আসলে নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার শিল্পিত রূপ। এ প্রসঙ্গে তাঁর সহধর্মিনীর বক্তব্যে থেকে জানা যায় :

> তিরাশি সালের দিকে পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ গ্রাম থিয়েটারের কাজে বগুড়া যাবার সময় পাবনার কাছাকাছি কোথাও দূরে উঁচু রাস্তার উপর দিয়ে চলমান দূরগামী সারি সারি গরুর গাড়ি দেখেছিল নাট্যকার। মনে হয়েছিল অন্তহীন সে পথযাত্রা। এরপর সাতাশির গণআন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনের মৃত্যু তাঁকে আলোড়িত করে। তিরাশিতে দেখা গরুর গাড়িতে আসীন হন সাতাশির শহীদ নূর হোসেন।[৮৪]

PvKv নাটকে আছে রাজশাহী, দিনাজপুরের সাঁওতাল পল্লি, খয়ের গাছ, ছাতিম গাছ, রিঠা গাছ, হিম সাগর, গোপালভোগ, বৃক্ষের ছায়ায়-ছায়ায় যে কৃষক পল্লি গড়ে উঠেছে তার নাম নয়নপুর নবীনপুর। দিল সোহাগীর বিল, কাকেশ্বরী নদী, এলংজানিগঞ্জ পার হয়ে সে জীবন আঁকা-বাঁকা পথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলের অচেনা অসংখ্য জনপদে। তবে এর মর্মমূলে রয়েছে নাট্যকারের শেকড়সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি। ধরমরাজ জাতে সাঁওতাল ও মাতাল। মৃত লাশটিকে ধরমরাজ সাঁওতাল দেবতা ধরম ঠাকুরের পোড়ামাটির মূর্তি কল্পনা করে। আসলে এর মাধ্যমে সাঁওতাল পুরাণ কথার পাশাপাশি নাট্যকার 'একটি অবক্ষয়িত জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় না'[৮৫] করেও তার সঙ্গে এঁটে দেন অবলীলায় PvKv নাটকে। সেলিম আল দীনের নাট্যচিন্তার একটি মৌল প্রবণতা ছিল দেশীয় জনপদের বিভিন্ন অবহেলিত নৃ-গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়কে মঞ্চে উপস্থাপন করা। অন্ত্যজ ধরমরাজ মাতাল হলেও মানবতায় পরিপূর্ণ তার অন্তর। সে নাচে গানে পোড়া মাটির দেবতাতুল্য লাশের সঙ্গে মাঠ-প্রান্তর গ্রাম পেরিয়ে যায়। এখানে নাট্যকার সাঁওতাল পুরাণ ব্যবহার করেন। হঠাৎ তার মনেও প্রশ্ন জাগে, ক্ষোভের সঞ্চায় হয়। সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে : 'ধরমরাজ এবার চেঁচায় এই দেবতারে খুন কইরেছে কে। এইপোড়া মাটির পুতুলটারে ভেঙেছে কে। বলতে হবে বলতে হবে।'[৮৬]

সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির এই ধরমরাজের মনে নানা আলোড়ন হয়। এই হত্যার কারণ সে জানতে চায়। তার অন্তরে মৃদু প্রতিবাদের সুরও ভেসে ওঠে। এদেশে সামরিক শাসনে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের। বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে যারা শহিদ হন, তাঁদের শব যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে না রাজনৈতিক জটিলতার কারণে, এই উপলব্ধি PvKv নাটকের বিষয় থেকে অনুধাবন করা যায়। বাংলাদেশে দীর্ঘসময়ে সামরিক শক্তির স্বৈরাচারী শাসনে বিচলিত হন সাহিত্যিকগণ। PvKv সেই স্বৈরতন্ত্রের কালো অধ্যায়ের ধারক ও বাহক। গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রত্যাশী জনগণের কণ্ঠ বুলেট প্রয়োগ করে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল সামরিকজান্তা। এখানে উল্লেখ করা যায়, ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন শহিদ হন। তাঁর পিঠে লেখা ছিল 'স্বৈরাচার নিপাত যাক/ গণতন্ত্র মুক্তি পাক'। এ নাটকে গণঅভ্যুত্থানের শিল্পিত প্রয়াস লক্ষণীয়। PvKv নাটকের মৌলবিষয় প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> ১৯৮৪-৮৮ সালের গণঅভ্যুত্থান আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হলে অন্য সবার সঙ্গে আমিও সমান বিচলিত হই। রাজনৈতিক দলের বাদানুবাদের আবর্তে শহীদদের শব নাম পরিচয়হীন দিগন্তের দিকে ভেসে যায় এরকম বেদনা এই 'চাকা' নাটকের মূলে আছে।[৮৭]

গাড়োয়ান কাকেশ্বরী নদীর তীর থেকে বেতাগী গ্রাম পাড়ি দিয়ে লাশ নিয়ে এগিয়ে যায়। খয়ের গাছ, রিঠা গাছের ছায়ায় তারা লাশটি নিয়ে বিশ্রাম নেয় আর কখনও ক্ষুধার্ত গাড়োয়ানরা তাদের সঙ্গে থাকা সামান্য খাবার খেয়ে নেয়। একটি কুকুরও তাদের সঙ্গী। পচনধরা লাশের প্রতি যেন কুকুরও হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল। বাহের গাড়োয়ান ভক্তির সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় গাড়ি। যদিও তার মনে পরিবার পরিজনের জন্য দায়িত্ব পালনের বোঝা চেপে আছে। পরিবারের জন্য তাকে ক্ষুধার অন্ন যোগাতে হবে। তবে তার কাছে শস্যের চেয়ে লাশের মূল্য কোনো অংশে কম নয়। যেমন :

> এর মধ্যে পাকাধানের আঁটি বোঝাই ভেজাভেজা গন্ধ ছড়ানো দুই ফসলের গাড়ি এদের অতিক্রম করে চলে যায়* হঠাৎ আত্মতৃপ্ত বাহের ঘাড় ঘুরিয়ে সে দিকে তাকায়* ভাবে শস্যের চেয়ে কি লাশের মূল্য কম। না শস্যের চেয়ে লাশ বহনকারীদের অহঙ্কারও কম নয় কারণ নয়ানপুরের যে গৃহে আজ শোকধ্বনি উঠবে উত্তীর্ণ প্রদোষে সে শস্য সহজে ফলে না।[৮৮]

জীবনযুদ্ধে তেতো বিরক্ত গাড়োয়ান জাগতিক নিয়মের শতগ্রন্থি বন্ধনে বাঁধা মানুষ। কর্তব্যবোধ থেকে গাড়োয়ান বুঝতে পারে ভোর থেকে সংঘটিত সারাদিনের প্রতিটি ঘটনা তাকে নিজ কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেছে। দিশেহারা বাহের তবু জাগ্রত চেতনায় এ সত্যের স্বরূপ অনুধাবন করে :

> আজ ভোরে যা ঘটে গেছে তাকে এবং আশপাশে যা ঘটবে কিছুই ফেরানো যাবে না। তখন মনে হয় আপন চটের আসনে সেঁটে গেছে সে* ইচ্ছে করলেই এখন আর গাড়ি থামানো যায় না খ্যাপের লাশটি ফেলে রেখে যাওয়া যায় না* গলা ছেড়ে চিলমারী বন্দরের সেই গানও গাওয়া যায় না।[৮৯]

এই বিবেচনাবোধ বাহের গাড়োয়ানের মানবিকতাপ্রসূত এবং বাস্তব। বাহের গাড়োয়ানের একমাত্র মেয়েটির জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনাটি রচয়িতার কৌশল রূপেই বিবেচ্য। কিন্তু বাহেরের বাহ্যিক আচরণ থেকে এরূপ অনুমান দুঃসাধ্য যে তারও হৃদয়ে নিত্য রক্তক্ষরণ হয় এবং অপঘাতে মৃত্যুর দহন যে কত বড় ভয়ংকর সে মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করে। কষ্ট ও বেদনাকে ক্রোধের আড়ালে ঢাকতে চায় বলেই সে ক্রোধান্ধ হয়ে হলাঙ্গা ফকিরের ষাঁড় দুটিকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করে। বাহের গাড়োয়ান এক পর্যায়ে ষাঁড়ের সঙ্গে কথা বলে। লাশের ভেদ বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। কারণ মানুষ স্বার্থের পঙ্কে নিমজ্জিত, কিন্তু পীরের সেবায়িতের ষাড় তা নয় বলেই তারা মৃতের কষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম এই বোধ জন্ম নেয় বাহের গাড়োয়ানের মনে।

কায়িক শ্রম স্বীকার করে গাড়োয়ান লাশ নিয়ে এগিয়ে যায় নয়ানপুরের দিকে। লাশটি তার স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিলে তবে ছুটি মিলবে তাদের। অনেক রাতে তারা নয়ানপুরে পৌঁছায়। আর্থিক দীনতায়

গ্রামেই অনেকেই শহরমুখী হয়েছে জীবিকার তাগিদে। সে গ্রামের ষাট বছরের এক বৃদ্ধা লণ্ঠন হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে লাশটি দেখে। তার একমাত্র পুত্র সোনাফরের মুখ খোঁজে অনামা লাশের দিকে তাকিয়ে। এখানে পৌঁছানো মাত্র এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। আপনজনের লাশ ভেবে ছুটে আসে কলেজ ছাত্রী রেহানা, ধলুর বৌ শরবতী, জব্বারের বাপ যাদের আপনজন গ্রামের বাইরে নারায়ণগঞ্জ, ঈশ্বরগঞ্জ বা অন্য কোথাও শহরে কাজ করে। মৃতের দুঃসংবাদে তারা বিচলিত হয়। এ সময়ে সেখানে উপস্থিত হয় স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাস্টার। চাটাই খোলার পর তিনি টর্চ জ্বালিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন লাশটি। পচে গলে বিকৃত হয়ে যাওয়া লাশটি চেনা দুঃসাধ্য হয়। তবু সবাই চেষ্টা করে। সোনাফরের মা গাড়ির পাটাতনে মাথা কুটে বিলাপ করে। তখন হেড মাস্টার গম্ভীর কণ্ঠে বলেন– 'না এ তোর ছেলে না সোনাফরের মা।'[৯০] আর এই লাশকে নিজের সন্তান ভেবে সোনাফরের মায়ের বুক ভাঙা আর্তনাদ– 'হামাকে মিছা কথা দিয়ে ভুলাতে চাস এইতো সোনাফর আ হা হা।'[৯১] এবার হেডমাস্টার বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে বলেন– 'বুলতেছিত এ তোর ছাওয়াল না– এই নয়ানপুরে এরে দেখিনিক কুনোদিন।'[৯২] শিক্ষক হয়েও তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাণহারানো এক প্রতিবাদী যুবকের লাশ গ্রহণে সাহস দেখান নি। স্বৈরশাসন এমনই ভগ্নদশা সৃষ্টি করেছিল সমাজদেহে। এমন সময় ধরমরাজ ঝোলা থেকে খুঁজে ঠিকানা বের করে। হাসপাতাল থেকে দেওয়া ঠিকানা: 'নয়ানপুর নবীনপুর হানিফালি কী হোসেনালি পিং মোঃ আজাফর এভাবে নামঠিকানা সরকারী লেখার গুণে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠে।'[৯৩] অস্পষ্ট ঠিকানা পড়ে হেডমাস্টার জানিয়ে দেন, ভুল ঠিকানায় তারা এসেছে। দু মাইল দূরে নবীনপুর নামে একটি গ্রাম আছে, সেখানে চোর ডাকাতের বসতি। সেই গ্রামের কারো লাশ হতে পারে এমন অনুমান হেডমাস্টারের। গাড়োয়ান লাশ নিয়ে আবার নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পেছনে ধ্বনিত হয় সোনাফরের মায়ের বাপজান বাপজান বলে চিৎকার। হোক অনামা কিংবা ভুল ঠিকানায় আসা লাশ, কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের অশ্রু ঝরছে অবিরাম। যেন সত্যিকার অর্থেই তার পুত্র সোনাফর। নিজের সন্তানের নির্মম মৃত্যুর আতঙ্ক তাকে ঘিরে রাখে। দিগন্ত বিস্তারিত মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে চাঁদের আলোয় ক্ষুধার্ত গাড়োয়ান চলছে গাড়ি নিয়ে। কর্তব্য একটাই লাশটি তাদের স্বজনদের কাছে পৌঁছাতে হবে যথাসময়ে। লাশের সঙ্গে আত্মকথনে অতিপ্রাকৃতভাব ছাপিয়ে মানবিক দায়বোধে উজ্জ্বল বাহের গাড়োয়ানের মনোবেদনা ফুটে ওঠে– 'তবে তুকে নিয়ে যামো কোঠে। কেবা তোমার মাতা কহ কেবা তুমাকের পিতা গো। আহা ভদ্র লোকের পিতা গো। আহা ভদ্র লোকের গাঁয়ে হামাকের এট্টু পুছ করল না এ ভাই ক্ষিদা পায় নাই তোমাকের।'[৯৪]

ধরমরাজ ভুল ঠিকানা এনেছে বলে রেগে ওঠে বাহের গাড়োয়ান। তাকে গালমন্দ করে। যুবক পইরাত ধৈর্য হারা হয়ে যায়। যখন রাতের অন্ধকারে লাশ দাফন ছাড়া মাটি চাপা দিতে চায় তখন বাহের অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। সে রাজি হয় না। বরং মানবের প্রতি মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় তার মন। লাশ প্রিয়জনের কাছে নিয়ে যাওয়া তার গুরুদায়িত্ব। মৃত লোকটি তাদের কেউ নয়, এটা তারা এখন আর মনে করে না। যদিও লাশটি তাদের স্বজনদের কেউ না, কিন্তু সঙ্গে থাকতে থাকতে জনম জনমের সঙ্গী হয়ে ওঠে। এই গ্রাম-বাংলার কোনো মায়ের বীরসন্তান। যদিও বাহের জানে না রাষ্ট্রযন্ত্রের গভীর ষড়যন্ত্রের কথা, স্বৈরশাসকের দমন-পীড়নের কথা। তাদের লাশের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। লাশের কোনো রকম অমর্যাদা হতে দিবে না গাড়োয়ান। লাশটি গাড়িতে রেখে তারা বিশ্রাম নেয়। প্রৌঢ় পইরাত কারবালার পুঁথি পড়ে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও এই যুবকের হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র আপন মনে আবিষ্কার করে। এখানে নাট্যকার ইসলামি পুরাণ ব্যবহার করেছেন। তাদের মধ্যে সীমাহীন করুণা জাগ্রত হয়, ব্যথায় অন্তর ভরে ওঠে। এই যুবককে যারা হত্যা করেছে তারা ঘৃণ্য পাষণ্ড এজিদ স্বরূপ। লাশটিকে তাদের প্রিয় নবির দৌহিত্র ইমাম হোসেনের মতই আপন মনে হয়। যেমন :

> এখানে এই তিন জনের মনে মনে খেজুর পাতার চাটাই মোড়া লাশটি ইমাম হোসেনের মতই কবন্ধ হয়ে উঠে* আম বাগানের ছায়া নেই কারবালার প্রান্তরে* বিশ্বনিখিল ধূসর বালুময়* জলের অভাবে মরলেন নবীর দৌহিত্র ঠিকানাও কি আজ এই মৃতের মতই অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় নয়।[৯৫]

গভীররাতে নীরবতা ভেদ করে লাশকে ঘিরে অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। মনে হয় কেউ যেন কথা বলছে তাদের সঙ্গে। অন্ধকারে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাতে বাহেরের মনে হয় হঠাৎ লাশটি যেন খেজুরের চাটাই বাঁধ ছেড়ে অস্পষ্ট কালো মূর্তি ধারণ করেছে। আর সেই মূর্তির সঙ্গে কথা বলে বাহের গাড়োয়ান :

তুমার মন খারাপ নাকি গো।
তারও চে বেশী
আমার শরীলটা গোরে ছেপে না দিলে
শান্তি পাই না পচন ধইরেছে গো
হামাকের সঙ্গীগণের বমি আসে তোমাকের পচা গন্ধে
মোর পচা গন্ধে মোরই বমি আসতেছে
তবে বমি কর ধুয়ে মুছে দেমো

কিন্তুক মোর পেট শূন্য নাড়ি ভুড়ি
ফুসফুস গুর্দা পেট ফেউড়ে তার মাঝে
সান্ধায়ে দেছে গো।[৯৬]

উপর্যুক্ত অংশে লাশের সঙ্গে কথোপকথন ও আত্মোপলব্ধিজাত মানবিক দায়বোধের সিদ্ধ বাহের গাড়োয়ান যেন মহাকাব্যের নায়কের চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করে।

স্বৈরাচার সরকারের অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ লাশ। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরায়ণতার চরম নিষ্ঠুর কর্মযজ্ঞ হত্যা। গাড়োয়ানদ্বয় সেই হত্যার লাশ নিয়ে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করে নবীনপুরের উদ্দেশ্যে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। তাই লাশটিকে কেউ গ্রহণ করে না। গ্রামের পথ ধরে চলছে গরুর গাড়ি। ষাঁড় দুটোকে বিশ্রাম দেয় গাড়োয়ান, ক্ষণিকের জন্য তারাও বিশ্রাম নেয়। হঠাৎ একটি ষাঁড় গাড়ির পাটাতনের কাছে আসে। খেজুর পাতায় মোড়ানো লাশ শুঁকে ফোঁস ফোঁস করে। ষাঁড় হঠাৎ লাফিয়ে ছুটতে থাকে। 'এই দুঃসময়ে ষাঁড় কেন এমন করে। একি ওই মর্গের অন্ধকার থেকে আসা যুবকের অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে ষাঁড়ের ক্রোধ।'[৯৭] মানুষের পাষণ্ড কর্মে পশুর অন্তরও কি ব্যথিত হয়? বিমানবিকতায় ইতর প্রাণির কাছে মানুষের যেন পরাজয় হয়। নাটকের তৃতীয় লম্বকের প্রথম তরঙ্গে লাশটি নিয়ে তারা পৌঁছে যায় নবীনপুর গ্রামে। হাঁসলী নামে একটি মেয়ের বিয়ের গান বেজে চলছে মাইকে। শুভবিবাহ অনুষ্ঠানে লাশের গাড়ি পৌঁছালে ক্ষুব্ধ হয় বাড়ির লোক। তারা ঠিকানা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং গালমন্দ করে তাদের। গ্রামবাসীর বক্তব্য– এ লাশ এই গ্রামের কেউ না। নবীনপুর বাসীর নিষ্ঠুর আচরণে তখন ক্রোধে গাড়োয়ান নিজের স্বজন হিসেবে লাশটির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যেমন: 'ঠিক আছে না চিন না চিন এ লাশ হামাকের স্বজনের লাশ* ব্যাস জিরয়ে লিবার লিগে এসেছিলাম ... ব্যাস।'[৯৮]

নবীনপুরবাসীর দুর্ব্যবহারে গাড়োয়ান তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। আসলে অপঘাতে মৃতের লাশ কেউ নিতে চায় না। ভীত বিহ্বল গ্রামবাসী। ১৯৮৬-৮৭ সালে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলন উত্তাল রূপ ধারণ করে। উল্লিখিত সময়ে নূর হোসেন, বাবুল, ফাত্তাহসহ গণ অগণিত মানুষ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আত্মাহুতি দেন। গণতন্ত্রের এই রক্তাক্ত ইতিহাস PvKv নাটকের বিষয় থেকে অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> রাজনৈতিক দলের বাদানুবাদের আবর্তে শহীদের শব নাম পরিচয়হীন দিগন্তের দিকে ভেসে যায় ক্রুর ও নির্মমভাবে। এলংজানি, বেতাগি, নয়ানপুর, নবীনপুর, জনপদ হতে জনপদ, দিগন্ত হতে দিগন্ত

> শূন্যে নির্বাক মিলিয়ে যায়, সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সনাক্ত ও বরণ করার কোন সাহসী, দায়শুদ্ধ, প্রেমোজ্জ্বল ব্যক্তিজনের সন্ধান মেলে না। আর তাই শহীদ যুবকের ফুলে ওঠা অতি প্রাকৃতিক পুরাণ বর্ণিত দেবক্রোধের আকার গ্রাহী ওই ক্রোধ ও ধিক্কার কেবল তাদের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকে না, যারা তাকে হত্যা করেছে, যারা তাকে ভুল ঠিকানায় দিকে দিকে প্রেরণ করেছে, যারা পেট চিরেছে হত্যার কারণ গোপন করেছে এই ক্রোধ ও ধিক্কার শহীদ সন্তানের শনাক্তি স্বীকৃতি দানে অক্ষম, ভীত, দুর্বল, পৌরুষরিক্ত, পলায়নপর একটি জাতির নিস্পৃহ চেতনাকেই অভিশপ্ত করে তার চেয়ে অনেক।[৯৯]

PvKv নাটক নাট্যকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অনুপম সৃষ্টি। স্বদেশপ্রেমিক লেখকের লেখা স্বজাতির জন্য পাথেয় হয়ে থাকে। কালিক নানা ঘটনাপ্রবাহ শিল্পিমানসে প্রভাব ফেলে। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলি বিশেষত নামহীন শহিদদের শবের মর্যাদাহীনতা নাট্যকারকে এ নাটক লেখায় তাড়িত করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে তিনি লেখার সময় বিষয়টিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে মানবিক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে নাটকে একটা সর্বজনীন ও মানবিক চিত্র এঁকেছেন। এ নাটকের রাজনৈতিক বিষয় প্রসঙ্গে নাট্যকারের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> রাজনৈতিক অভিপ্রায় নাটকের শরীরে নেই শিরায় হয়ত আছে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই সমাজমনস্ক রাজনীতি পিপাসু পাঠক নাড়ি ধরে পাবেন কিনা তেমন উদ্বেলিত স্পন্দন তাদের নিজ নিজ ঘড়ি মিলিয়ে না পেলে আমার অস্বস্তি নেই এ জন্য যে সমকালীন রাজনৈতিক আবেগ তাতে তাড়িৎ ক্রিয়া করে না। আমি যদ্দুর জানি আমার কবি স্বভাব। আর স্বভাব বিরুদ্ধ শিল্পকর্ম অন্য যাদের সন্তুষ্ট করুক নিজেকে বাঁচায় না। সেদিক থেকে বলতে পারি 'চাকা' নাটকের একটি নিজস্ব নৈসর্গিক অর্থ আছে। দর্শক শ্রোতা তাতেই তৃপ্ত হবেন। এবং লেখায় আমারও মনে হয়েছে সমকালের বেদনাও রচনায় বহুদূরে নানা বাঁক ঘুরে ভিন্ন শিল্প ভাষায় এসেছে। ধরা যাক আমি বাস্তবেই একটি গল্প বলতে চেয়েছি সে গল্পের শববাহী চাকার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে। এ কাহিনীতে ক্ষেত মজুরদের হাতে কবর খনন হলে অনামা মৃতের গতি হল। কেউ যে চিনতে পারল না তার কষ্ট নির্ধারিত হল জানাযা ও কবরের পরে। সে আনন্দ ও শোকের যদি কোন মানবিক তাৎপর্য থাকে তবে তাতেই আমি খুশি হবো।[১০০]

আলোচ্য নাটকে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে লাশ তা সরকারের নির্দেশ গ্রামে যাচ্ছে। সরকার বাহাদুর নিজে লাশের বাদী। ময়না তদন্তের পর লাশ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। এসব বাস্তব ঘটনা বর্ণনা নিঃসন্দেহে নাট্যকারের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় জ্ঞাপক। নাটকের

রাজনৈতিক বক্তব্য প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য-'রাজনীতি সচেতন নাট্যকার সমকালের রাজনীতিকে এড়াতে পারেননি বলেই নাটকের শরীরে না হলেও শিরায় তাকে তুলে ধরেছেন।'[১০১]

PvKv নাটকে বর্ণিত ঘটনাংশে সরকার, ডাক্তার, গুদারাঘাটের মাঝি, নবীনপুর, নয়ানপুর বাসিন্দাদের নিষ্ঠুরতার তুলনায় সমাজের প্রান্তিকশ্রেণির শ্রমনিষ্ঠ মানুষের মানবতা, সহানুভূতি, স্নেহপরায়ণতা খুব বেশি। চাটাই মোড়া হোসেনালির লাশ রূপ পেল যেন জীবিত হোসেনালিতে। লাশটি দুই দিন ও একটি রাত তাদের সঙ্গে থেকে রক্তের বন্ধন না হয়েও মানববন্ধনে একাত্ব হয়ে যায়। গাড়োয়ানদের অতি প্রিয় স্বজন হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নাটকের একাংশ :

> মাইলের পর মাইল এক সঙ্গে চলেছে ওরা কাজেই এই মৃতকে আর অপরিচিত ঠেকে না। চাকার আবর্তনে অপরিচিত থেকে পরিচয় ক্রমে গাঢ় ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। চাকা যত পথের ভেতরে প্রবেশ করেছে লাশটিও ওদের অন্তরে ততদূরে ভেতরে চলে গেছে। সঙ্গে থাকতে থাকতে সঙ্গী হয়ে উঠে এই মৃত।[১০২]

নবীনপুরের মক্তবের কাছে যখন বাহের গাড়ি রেখেছে তখন অজস্র লোকের ভিড় জমে। এ সময় লাশ থেকে পচা গন্ধ বের হয়। পৈরাত একজন গ্রামবাসীকে অনুরোধ করে বলেছে, একটু সরকারি জায়গা পেলে এবং একজন হুজুর পেলে তারা জানাজা পড়িয়ে অনামা লাশ কবরস্থ করতে ইচ্ছুক। উপর্যুক্ত মর্যাদায় তাকে অন্তিমশয়ানে রাখতে চায়, শেষবিদায় জানাতে চায়। তবে গ্রামবাসীর মধ্যে সাহস দেখা যায় না, তারা অনড় থাকে। এখানে কবরের ব্যবস্থা করলে পুলিশি ঝামেলা হতে পারে এই ভয়ে ভীতু কাপুরুষ লোকেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এমনকি ভাত রেঁধে খাওয়ার জন্য সময় চাইলে তাতেও তাদের মন টলে না। তারা অজানা অচেনা লোকদের লাশ বহন করা গাড়ি তাড়িয়ে দেয়। সামরিক শাসনে তাদের মধ্যে মেরুদণ্ডহীনতাই প্রত্যক্ষ করা যায়। নবীনপুরের অধিবাসীরা পীরের থানের সেবাইত ষাঁড় দুটিকে আঘাত করে। এদিকে গাড়িতে গলিত লাশের পচন ধরেছে এবং ডাই পিঁপড়ে মাংসের লোভে ভীড় করছে। পরম মমতায় বাহের গাড়োয়ান, পৌঢ় পৈরাত ও শুকুর চান ডাই ঝাড়তে থাকে। তাদের মনে লাশের জন্য কষ্ট ও গভীর সহানুভূতি জাগ্রত হয়। ধর্মবোধ ও মানবতার চূড়ান্ত নিদর্শন তারা রেখেছে। মনুষ্য লাশকে তারা জীব-জন্তুর খাবার হতে দেয় নি। এরপর গাড়োয়ান লাশ নিয়ে সামনের দিকে অজানা গাঁয়ের বাজারে চলে যায়। সেখানে তারা ক্ষুধার জ্বালায় নেতিয়ে পড়ে ও ভাত রান্না করে খায়। বাজারের উৎসুকজনতা লাশ দেখে নানান প্রশ্ন করলে তারা বলে, 'হামাকের ভাই ঠাটা পইড়ে মরেছিল।'[১০৩] তারা চায় নি আর লাশটিকে ঘিরে কোনোরকম অমর্যাদার বাণী বর্ষিত হোক। দীর্ঘসময় লাশবহন করে দেখেছে

কারোই মমত্ববোধ জাগ্রত হয় না অপঘাতে মৃতের প্রতি। সবাই যেন নয়ানপুর কিংবা নবীনপুরবাসীদের মতোই মমতাশূন্য, পাষণ্ড ও দায়িত্বহীন।

সেলিম আল দীন সৃষ্ট নাটকের চরিত্র মানবীয়বোধে অনন্য। ক্ষমতাধর, স্বার্থান্বেষী ও অশুভ শক্তির বিপরীতে তিনি সৃষ্টি করেন তাদের। †Ki¨gZg½j নাটকের কেরামত কখনো মুক্তিযোদ্ধা, কখন নির্যাতিতার স্বামী, কখনো নিষ্পাপ ভ্রূণের পিতা। অন্ধ হয়েও কেরামত মানুষের জন্য কাজ করে যায়। PvKv নাটকের বাহের গাড়োয়ান তেমনি এক চরিত্র। সেলিম আল দীনের নাটকে শ্রমনিষ্ঠ দরদি, আত্মদানকারী চরিত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক হাসান আজিজুল হকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়। যেমন :

> সেলিমের নাটকের চরিত্রগুলো আসলে কোথা থেকে আসে? খোঁড়া হোক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাটি, তার পুরনো দিনের কথা উঠে আসবে, হাড়গোড় উঠে আসবে, সেই হাড়গুলো যাদের তাদের অনেকেই সেলিমের নাটকের চরিত্র। বাংলাদেশে আগামী সময়ে, তা আজ থেকে যতো পরেই হোক, তখন যদি কেউ শিল্পের সমন্বয়ে এদেশের মানুষকে খুঁজতে যায় তাহলে সেলিম আল দীনের নাটক নিশ্চয়ই তার বড়ো একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা দেবে।[১০৪]

রাষ্ট্রের নির্মম মৃত্যুর শিকার অনামা লাশ নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়ে গাড়োয়ানরা। শ্রমজীবী ধানকাটার শ্রমিকরা অমানুষের মত নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে নি, পারে নি লাশটিকে ফেলে যেতে। ময়না তদন্তের ফলে পচে গলে লাশটি বিকৃত হয়ে গেছে। পড়ন্ত বিকেলের শেষ সূর্যের প্রভায় লাশের রূপটি যেন প্রতিবাদী কোনো চিত্রকলায় পরিণত হয়। নাট্যকারের নিজস্ব একটি বোধের বহিঃপ্রকাশ আছে। আর তাই সে উপলব্ধি থেকে লাশটি নিজেই যেন ধিক্কার দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে :

> পৃথিবীতে অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন মৃতের যদি ক্রোধ ও ধিক্কার কোনদিন প্রকাশ পায় তবে তার আকৃতি নিশ্চিতই এরকম হবে। মানবিক মুখের আকার ও প্রকার অতিক্রম করে এই মুখ পশ্চিমাকাশে বিশুষ্ক প্রায় গাঙের ওই পাড়ে ধূ ধূ চরের মাথায় টুকরো মেঘের রূপ ধারণ করে। কিংবা পুরাণে বর্ণিত দেবতার ক্রোধের যদি কোন আকার আঁকা যায় তবে হয়তো তা এ মুখের রূপ পাবে।[১০৫]

PvKv নাটকে মূলত স্বৈরশাসনে গণমানুষের অসহায়ত্ব ও ভীতি–বিহ্বল অবস্থা ফুটে উঠেছে। গ্রামের কেউ লাশটি গ্রহণ করে না। অন্যায়ভাবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কোন সুরাহা হয় নি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য: 'স্বৈরাচার কবলিত সমাজ রাষ্ট্রে অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ধিক্কার প্রকাশিত হয়েছে চাকা নাটকে।'[১০৬] কাকেশ্বরী নদীর পার থেকে লাশ নিয়ে যে যাত্রা করেছিল গাড়োয়ান,

অবশেষে অবসান ঘটে পরিশ্রান্ত গাড়োয়ানদের। দুই দিন পর সন্ধ্যায় আরেক গাঙ্গের বালুর চরে গাড়োয়ারের সঙ্গী প্রৌঢ়ের জানাজা পড়ানোর পর লাশ কবর দেওয়া হয়। শস্য ফলানো মাটির সন্তানের কাছে শস্য ও লাশের মর্যাদা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা তাদের গুরুদায়িত্ব পালন শেষ করে। এরপর সকলে মিলে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করে যেন তাদের আপনজনের অন্তিম ঠাঁই হয়েছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় :

> মাটি চাপা দেয়া হলে সবাই পিছনে দীর্ঘ ছায়া সমেত পাড়ে উঠে। হঠাৎ কি ভেবে গাড়োয়ান দৌড়ে যায়* হাটু গেড়ে বসে কবরের পাশে* ঝুরঝুর বেলে মাটি প্রচণ্ড আবেগে খামচে ধরে।। আহা আহা করে কাঁদে* কেন। সে জানে না* এই মৃতের প্রতি দুর্ব্যবহার পরিচয়হীন করুণ কবর কিংবা তারই পথ চলার এক সঙ্গী চিরকালের জন্য ধূলিমাটির নীচে চলে যাওয়া।[১০৭]

অনামা লাশের জন্য অব্যক্ত বেদনায় অশ্রুপাত করে গাড়োয়ান। মৃতদেহ সমাহিত করে তারা তিনজন ধান কাটতে চলে যায় তাদের গন্তব্য দিল সোহাগীর বিলের পথে। মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাকেন্দ্রিক PvKv নাটকে উঠে এসেছে প্রান্তিক গাড়োয়ানের চিরায়ত মানবতাবোধ। তাই শেষপর্যন্ত তারা বেওয়ারিশ যুবকের মৃতদেহকে শেয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে দেয় নি। তারা গ্রামের ঠিকানা খুঁজে পায় নি, কিন্তু লাশটিকে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সত্যিকারের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে। যথার্থ মানবিক কাজটি তারা করতে দ্বিধা করে নি বা ভুলে যায় নি।

PvKv নাটকে নাম ঠিকানা গোত্র পরিচয়হীন একটা লাশ মানুষের দ্বারে দ্বারে নিয়ে ফিরেছে নিরক্ষর গাড়োয়ানগণ। এ এক মর্মান্তিক চিত্রকল্প। মানবের অপমৃত্যু হৃদয়বানকে যন্ত্রণাক্ত করে। নাট্যকাহিনিতে মূলগল্পে দুইদিন একরাত্রি লাশ বহন করে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পাড়ি দেবার সময় লাশের সঙ্গে গাড়োয়ান এবং তার সঙ্গীদের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এখানে মানবিকতা ও সহমর্মিতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়। জীবিত ব্যক্তিগণ মৃতকেও নিজের অবস্থানে দাঁড় করায় এবং তাদের মধ্যে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটে যে, মৃত মানুষটি যে এখন গলিত লাশ সে আর কখনও এই পৃথিবীতে খাদ্য ও শয্যা গ্রহণের নিমিত্তে আসবে না। ফলে গাড়োয়ানগণ পচনশীলতা থেকে পিঁপড়ার খাদ্য হওয়া থেকে লাশটিকে রক্ষা করে। এমনকি মাতাল ধরমরাজকে পর্যন্ত লাশ স্পর্শ করে অপবিত্র করতে দেয় না। স্বজনের মতো তার নিয়তির জন্য নিজেরাও শোকার্ত অশ্রুপাত করে। সমগ্র নাটক জুড়ে জীবন এবং মৃত্যু লেখকের কুশলী বর্ণনায় হাত ধরাধরি করে পরিণতিমুখী হয়েছে। লাশের প্রতি সহমর্মিতার কারণে যেন মনে হয় কুকুরটি পর্যন্ত তাকে পাহারা দেয় কিন্তু খাবলে

ছিঁড়ে খায় না। গল্পের সমস্ত বিষয় ছাপিয়ে ওঠে মানবতার শাশ্বত বাণী। সেই সঙ্গে ঘাতকের প্রতি সকলের অজ্ঞাতেই জাগে প্রচণ্ড ঘৃণা। ঠিকানাবিহীন লাশটিকে যারা দাফন করতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিবেকশূন্যতা ঘৃণার যোগ্য। গাড়োয়ান নিরক্ষর অথচ আলোকিত মানব। এরাই মূলত মানবতার জীর্ণ মলিনপতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আছে সভ্যতার। জন্তুর আচরণে মানবের হার্দিক সহানুভূতির প্রকাশ পায়, অথচ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তারা মানুষ হয়েও অধম। রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তির নিমর্ম খেলার শিকার নিহত হোসেনালি অজ্ঞাত থেকে গেল। তার স্বজনেরা পেল না তার লাশটি। রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যার সঙ্গে শোষণ-পীড়নে বিপন্ন সামাজিক জীবনের ছবি PvKv। 'জীবনের অজস্র আয়োজন অমানবিকতা ও মানবিকতাবোধ এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘূর্ণনশীল চাকার আবর্তনের মধ্য দিয়ে অবিস্মরণীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে।'[১০৮]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বলা যায় যে, মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-৭১) Kei (১৯৫৩) নাটক যেমন ভাষা-আন্দোলনকে প্রতিনিধিত্ব করেছে, তেমনি সেলিম আল দীনের PvKv নাটকটি নব্বই-এর গণআন্দোলনের। সমকালীন রাজনীতি ও সমাজের চিত্র রূপায়ণে PvKv এক অনন্য শিল্পকর্ম। বর্তমান বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা সঠিক ও যথাযথভাবে এগিয়ে যাবে এবং স্বৈরতন্ত্রের করতলে বাংলাদেশ আর কখনও মাথানত করবে না– এই বোধকে সমুন্নত রাখার অব্যাহত প্রয়াসই হবে PvKv-এর হোসেনালির জীবনদানের সার্থকতা। হোসেনালির রক্ত ও সোনাফরের মায়ের গগনবিদারী চিৎকার বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর বেয়ে জাতীয় পতাকায় এসে মিলে গেছে নিঃসন্দেহে। আমাদের জাতীয় জীবনে তাই PvKv নাটকের বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সুষ্ঠুসমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিনির্মাণে এদেশের মানুষ দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদের মৃত্যু যেমন তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর মসনদ কাঁপিয়ে তোলে, তেমনি স্বাধীনদেশে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতন ত্বরান্বিত করেছে নূর হোসেনের মৃত্যু। ১৯৭১ সালে এদেশের সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র ও মুক্তির সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন। ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পতাকা এদেশের স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে বারবার রক্তাক্ত হয়েছে। সামরিক শাসন ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনার পরিপন্থী। PvKv নাটকের অনামা লাশ বা নামাঙ্কিত হোসেনালির মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অজস্র রক্তের নদী অতিক্রম করে এসেছে গণতন্ত্র। আর সেখানেও সাধারণ মানুষই জীবন উৎসর্গ করেছে। দেশের মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় তাই নব্বই-এর গণজাগরণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগরণ। PvKv নাটকের প্রেক্ষাপট যদি মূল্যায়ন করি তাহলে

বলতে হবে, গণতন্ত্রের ইতিহাস পাঠে PvKv নাটক একটি মাইলফলক। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> PvKv কথানাট্য মধ্য ৭০ হতে ৮০'র দশকের অন্তিম কালের বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক প্রাণস্পন্দন ধারণ করে হয়ে ওঠে এক কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্ম, যা মানুষের সহজ ও মুক্ত জীবনকে প্রার্থনা করে তীক্ষ্ণভাবে, আর তীব্রভাবে ছুঁড়ে দেয় ক্রোধ, ঘৃণা, ধিক্কার 'পৃথিবীর সমস্ত অপমৃত্যুর' নেপথ্য ক্রীড়ানকদের মুখে।[১০৯]

নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের অঙ্গীকার ছিল সংসদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন, রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশ গণতন্ত্রের নানা চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। সেলিম আল দীন PvKv নাটকে তাঁদের স্মরণীয় করে রেখেছেন যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য শহিদ হয়েছেন। তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ধারণে PvKv নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

সেলিম আল দীনের কথানাট্য ধারার দ্বিতীয় নাটক ^heZx Kb¨vi gb (১৯৯১)। নাটকের বিষয়বস্তু দুজন প্রান্তিক নারীর কাহিনি। তাদের একজনের নাম কালিন্দী, আরেকজনের নাম পরী। কালিন্দী মধ্যযুগের নারী, অমিত শিল্পবাসনায় নিজেকে হত্যা করেছিল। পরী সমসাময়িক কালের মানুষ। প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা এক নারী পরী শিল্পী জীবনের অধোগামিতায় হনন করে নিজেকে। কালের বিবেচনায় কয়েক শত বছরের ব্যবধানে জন্ম তাদের, নামেও দুই ভিন্ন মানুষ। তবুও রচয়িতা তাদের একই জন বলে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন– 'তুমি দুই নামে দুই কায়া কিন্তু একই যৈবতী কন্যা।'[১১০]

^heZx Kb¨vi gb নাটকের প্রথম খণ্ডটির নাম কালিন্দী পর্ব। মধ্যযুগের গীতিকা পালার নারী কালিন্দীর জীবনকথা এই অংশে প্রাধান্য পেয়েছে। কালিন্দীর জন্ম মনসা পূজারি শ্রীকরের ঘরে। শ্রীকর খ্যাতিমান গায়েন, আসরে আসরে মনসার পালা পরিবেশন করে। তার চতুর্থ কন্যা কালিন্দী আশৈবব মনসার কৃত্যাদি পূজার মধ্যে পূজারির ভক্তি গদগদ চিত্তের অকুণ্ঠ নিবেদন প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু স্বীয় অন্তরে অনুরূপ আত্মবিস্মৃত ভাবাবেগ ও শ্রদ্ধান্বিত বিশ্বাসের ভিতে চির ধরে। ইতোমধ্যে সোমেশ্বরীর ধানকুঁড়া গাঁয় জ্যেষ্ঠ বোন শলপীর বাড়ি আসে কালিন্দী। নট শ্রীকরের আশ্রিত পিতৃমাতৃহীন শঙ্করের সঙ্গে কালিন্দীর বিয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শ্রীকর কন্যাসহ তাদের চরচন্দ্রানীগাঁ থেকে ধানকুঁড়া আসে। যাত্রাপথে বাবার সাথে চৈতন্য ভগবতের আসরে নিমাই সন্ন্যাসীর জীবনকথা উপভোগ করে কালিন্দী। বড় বোনের শ্বশুর বাড়ি এসে গীতিকার পালা রচক

আলালের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কালিন্দীর। কালিন্দীর রূপে গুণে মুগ্ধ আলাল বলে, 'আপনের পা দুইটা পূজা করতে ইচ্ছে করে। এত সোন্দর।'[১১১] গীতে-পালায় দেব-দেবীর বন্দনা না করে মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে গীত রচনা করায় আলালের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় কালিন্দী। ক্রমে পালা রচক আলালের কাব্য সাধনার শক্তিতে পরিণত হয় কালিন্দী। তাইতো আলাল বলেছে :

> আমি নিরঞ্জন আল্লাহ মানি-কিন্তুক মনে রাখবেন তারপরও পূজার লাইগা দেবী লাগে একজনা। কেউ মনসা– কেউ চণ্ডী– কেউতে লক্ষ্মী– কেউ সরস্বতী– কেউবা গাজী বদর। আমার খালি আপনে আছেন। সহসা কালিন্দীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে– দু'হাতে পা জড়িয়ে ধরে– প্রচণ্ড আবেগে মুখ ঘষতে থাকে– 'দুইটা চরণ গো কালিন্দী তোমার দুইটা চরণ– এই কাঙাল আলালের আর কিছু চাই না।[১১২]

আলালের নতুন পালার মোড়কের অভ্যন্তরে নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে কালিন্দী। আলালের গীতে নিজের বন্দনা শুনে কালিন্দী তার মনসার পূজার ঘট ভেঙে ফেলে, ছুঁড়ে ফেলে দেয় শঙ্খ। মনসা নয় চণ্ডী নয়, তবু জগতে তার পূজা হয়। এই বোধ তাকে ক্রমাগত মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে। সে ভুলে যায় শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। গায়েন আলালের প্রেমে কালিন্দীর সুখ চূড়ায় পৌঁছে যায়। ফলে এক নির্জন দুপুরে আলালের ডাক 'যাবেন আমার নগে।' ... যদি যান নগে– আর কুনদিন ফেরত আসবেন না স্বজাতির ভিটায়।'[১১৩] উপেক্ষা করার আর কোনো উপায় থাকে না। আলালের ছোট পানসীতে উঠে বসে কালিন্দী। সম্পর্কের প্রবল আকর্ষণে শ্রীকর নটের কন্যা কালিন্দী মুসলমান পালা রচয়িতা আলালের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে। এরপর আলালের সঙ্গে ঘর বাঁধে ধলমূল গাঁয়ে। গাঙের কূলে কূলে আসরের পর আসরে ঝমঝমিয়ে কড়ি এলেও তাদের প্রেম বাঁচে নি বেশি দিন। এক আসরে শরীয়তপন্থীদের আক্রমণে আহত হয় আলাল ও দোহার শুকুর। হাত ভাঙে আলালের। একই সাথে আসে গাজীর গানের প্রবল স্রোত। শস্যহানীতে, বালাইতে ঘরে ঘরে গাজীর গানের বোল উঠে। ফলে ইহকাল পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নেই বলে আলালের গানের কদর কমে যায়। এই দম্পতির জীবনে এরপর ক্রমাগত দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা নেমে এলো। প্রান্তিক জন-মানুষ এখন নদী ভাঙন, শস্যের বর্ধিত উৎপাদন কামনায় কিংবা রোগ বালাই থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ঘরে-ঘরে গাজীর গান শুনতে চায়। 'যে গানের মঙ্গল নাই– ইহকাল পরকালের ভালাই নাই সে গান দিয়া আমাগরে কি। গাজী বাগ সামলান– অকাল প্রসব ঠেকান।'[১১৪] আলালের গান শোনার মতো রসিকজন নেই। এর বড় কারণ, আলালের গানে ধর্ম কথা নেই। এই কল্যাণবোধ ও বস্তুগত লাভালাভের চিন্তার নিকট পরাজিত হয় মুক্ত মানব রসের পালা গীতিকা। দুর্ভাগ্য যে ঠিক তখনই ওঠে

হিন্দু-মুসলমান বিভক্তির ঝড়। আর সে সময় মারা যায় দোহার শুকুর। আলালের গীতিকা পালাও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সময়টা তখন– 'মানষে মানষের খবর জানতে চায় না কেমুন আজব কাল নামছে। হিন্দু যারা– মনসা শিবের গানে রাইতের আকাশ ভারী করে– আর মুসলমানগরে ঘরে ঘরে গাজীপীর মাদারপীরের সেবা– পালামু কোথায় কালিন্দী।'[১১৫]

আলাল ক্রমে পীরের মুরিদ হয়ে যায়। জীবন ও জীবিকার দায়ে আলাল আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো এবং সেও গাজীর গান ধরলো। ধীরে ধীরে আলালের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়, সেও বিশ্বাস করতে শুরু করলো পীরের বাণী, পরকাল ও কবর ছাড়া সব কিছুই অর্থহীন। কালিন্দীর কপাল ভাঙে– গীতিকার নারী কালিন্দীর কাছ থেকে আলালকে হরণ করে গাজীপীর। সেলিম আল দীন তৎকালীন সমাজের ঐতিহাসিক সত্যকে এখানে তুলে ধরেছেন। গীতিকার পালা রচক আলাল গাজীপীরের মুরিদ হলে পীর মাহাত্ম্যমূলক সাহিত্যের নিকট পরাজয় গটে গীতিকা সাহিত্যের। কালিন্দীর প্রেমেরও পরাজয় ঘটে। এখান থেকেই আলাল-কালিন্দীর দাম্পত্য জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি। প্রতিবাদ করে কালিন্দী, মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী মানবী কালিন্দী পরাজয় স্বীকার করে না। আলালের পরিবর্তন তার নিকট অধঃপতন রূপে প্রতিভাত হয়। ক্রুদ্ধ অভিমানাহত নিঃস্ব নারী প্রেমহীন তার শাস্ত্র অসম্মত অসামাজিক দাম্পত্য সম্পর্ক ও জীবনকে বেশ্যার জীবনের সঙ্গে তুলনা করে। 'মুহূর্তে মনে হয় সেই অঘ্রাণ থেকে এই চৈত্র আমি ভাসমান এক বেশ্যার জীবন যাপন করেছি।'[১১৬] শেষপর্যন্ত ধর্ম-দ্বন্দ্বে আলালের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে কালিন্দী আত্মধিক্কারে ফেটে পড়ে এবং গৃহত্যাগ করে। কিন্তু সে নৌকা থেকে দস্যুদের হাতে লুট হয় এবং আষাঢ়ে বিক্রি হয়ে যায় এক সওদাগরের কাছে। অবৈধ ভ্রূণ নষ্ট হয়, সর্বস্বান্ত কালিন্দী ভাদ্রে ফিরে আসে আলালের ঘরে ধলমূল গাঁয়। অতঃপর সে বিষপানে আত্মহত্যা করে। ধর্মের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসে কালিন্দী। ধর্ম ত্যাগ করেই কালিন্দী একদিন মানবতার আলালের জয়গানে মুগ্ধ হয়ে তার গলায় প্রেমের ও মহত্ত্বের মালা পরিয়েছিল। আলাল ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেও কালিন্দী প্রতিবাদ করে আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের গীতিকা পালার এক শিল্পীর কালিন্দী এভাবেই নিজের আখ্যানের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। মধ্যরাতে বিষ করবীর চূর্ণবীজ খায় কালিন্দী। ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে তার কাছে বড় ছিল মনুষ্যত্ব ও প্রেম। হাজার বছরের ঐতিহ্যর মধ্যে বাংলা নাটকের রূপ ও রসকে ধারণ করবার অভিপ্রায়ে যে যাত্রা নাট্যকার শুরু করেছিলেন, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ ˆheZx Kb¨vi gb। ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত ˆheZx Kb¨vi gb এর প্রথম প্রদর্শনীর স্যুভনিরে নাট্যকারের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> যৈবতী কন্যার মন কথানাট্যের প্রথম খণ্ডে অষ্টাদশ শতকে ধর্মকাব্যের সঙ্গে গীতিকা পালার দ্বন্দ্বের ছবি আঁকতে চেয়েছি। সেই শতকে মঙ্গল কাব্যধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও তা লোক আচার বিশ্বাসের নানান স্তরে বেঁচেছিল। গীতিকার মত পূর্ণাঙ্গ মানব রসসিক্ত প্রবল ধারার কালে এদেশে পীরাদি পূজার প্রচলন হয়েছিল। কেন। কোন পশ্চাৎমুখী টানে ক্ষয়িষ্ণু ধর্মতান্ত্রিকতায় গীতিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। কালিন্দী ধর্মবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল প্রাণ ও প্রণয়ের টানে অথচ সেখানে অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সে দাঁড়াতে পারল না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাকৃত জীবনের গন্ধমাখা এক নারী পরী। শিল্পের ভেতর দিয়ে যে অহং তৈরী করল তা আত্মবিনাশী। শিল্প ও জীবনকে প্রায় এক বিন্দুতে মেলাতে চেয়েছিল সে। কিন্তু দুই নারী এক নারীকল্প কেন। এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। হয়তবা এরকম উত্তর দিতে পারি যে– এক নারী কিন্তু দুই ভিন্নকাল বিধায় দু'নারী বলে ভ্রমের উৎপাদন হয়। অথবা নারী চিত্তের বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের আস্বাদের আবেগ জেগেছিল কবির।[১১৭]

^heZx Kb¨vi gb নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে পরী নামের আরেক প্রান্তিক নারীকে ঘিরে। মূলত কালিন্দীর নবজন্ম ঘটে শিল্পসাধক পুতুল নাচের মাস্টার মাজেদুল হকের ঘরে। তাই কালিন্দীর নব নাম পরী। পরীর পূর্বপুরুষ ছিল নিকারী, সমুদ্র মোহনায় বিষখালী নদীর তীরের গাঁ মহীপুর থেকে এসে মাজেদুল হকের মা ভিটেমাটি বিক্রয় লব্ধ অর্থে মৌরাবি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। মাজেদুল হক কৈশোর ও যৌবনের একটা বিরাট অংশ যাত্রাদলে কাটায়। যাত্রাদলের মেয়ে মনিরা বেগমকে বিয়ে করে সংসারী হয় এবং পুতুল নাচের দল করে। দলের নাম মৌরাবি পুতুল নাচ। পুতুল নাচ মাজেদুল হকের হাতে ভিন্ন মাত্রার শিল্প হয়ে ওঠে। পরীর জীবনে আছে নানা ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। সে মিশনারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। তারপর মায়ের অসুস্থতায় তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কিশোর বয়সে একবার সে ঘুড়ির দোকানি শাহামালের সাথে ঘুড়িগাছ দেখার লোভে পালায়। এরপর কবি যশঃপ্রত্যাশী অনিন্দ্যর প্রেমে উদ্বেল পরী দ্বিতীয় বার বিক্ষত হয় আভিজাত্যের নিষ্ঠুর আঘাতে। যাত্রাদলের নিচুজাতের সঙ্গে অনিন্দ্যর বিয়ে হবার নয়। ফলে দুমড়ে মুচড়ে যায় পরীর প্রেম। একদিন পিতা মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারে নেমে এলো দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা। অভাবের তাড়নায় মা মনিরা বেগম স্বয়ং দলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিষখালী নদীর বাঁকে রাখাইন সম্প্রদায় আয়োজিত বৈশাখী পূর্ণিমার মেলায় তাদের প্রথম আসর বসে। এই আসরে আসার যাত্রাপথে পরী নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করে। তারপর পরী তিনশ টাকার বিনিময়ে শহরের কোনো শখের নাট্যদলে প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে; জীবনের মোড় ভিন্ন বাঁকে ঘোরে। আলেয়া চরিত্রে অভিনয়ের পর নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছে যায় পরী। চরম দারিদ্র্যের মুখে মনিরা বেগম পরীকে

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাত্রাদলে নির্ধারিত বেতনে পাঠাতে বাধ্য হয়। এক কালের যাত্রা শিল্পী মনিরা বেগম মেয়েকে যাত্রাদলে পাঠাতে চায় নি সমকালীন যাত্রার অধঃপতিত অবস্থার জন্য। মনিরা বেগম নিরুপায় হয়ে পরীকে যাত্রাদলে পাঠায়। ইসাক চৌধুরীর যাত্রাদলের পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে পরী। নতুন নতুন পালার চরিত্র রূপে যাত্রাদলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা ও মানুষের সাহচর্যে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় পরী। বদলে যেতে থাকে জীবনের ছক। আত্মঅহংকারবশত নিজের অজান্তে শিল্পের শুদ্ধ ও পবিত্র পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়। যাত্রাদলের সাথে পরীর রাত-দিন ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতায় অতিবাহিত হয়। জীবনের প্রতি এক ধরনের ঘৃণা থেকে অতিরিক্ত মদ্যপান করে উন্মুক্ত ও বেপরোয়া জীবন-যাপনের মাধ্যমে তিলে তিলে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায় পরী। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের সংবাদ তাকে পৃথিবীর তাবৎ গৃহের প্রতি অবিশ্বাসী করে তোলে। ক্রমেই সে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং যে কোনো পুরুষ হৃদয় রক্তাক্ত করার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে :

> একদিন গভীর রাতে সুখেন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাত কাটায়। তার পরদিন সুখেন্দুকে ধুতুরার বীজ খাইয়ে দেয়। সুখেন্দু ন্যাংটো হয়ে নাচে তিনদিন। তারপর একদিন হাত ধরে বেরিয়ে যায় কারু— আবার ফিরে আসে। এর মধ্যে পরী আপনার এক অবৈধ ভ্রূণ হত্যা করে।[১১৮]

অতঃপর পরী আত্মহত্যা করে। তাই কালিন্দী ও পরী অভিন্ন জীবনের ভিন্ন রূপের অভ্যন্তরে বহমান একই মানবী-পরিণতি ও তাদের অভিন্ন। পরীর এই আত্মহননের মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রান্তিক নারীর জীবন-বাস্তবতার দুটো দিক উন্মোচিত করেছেন। একদিকে পরীর আত্ম-সম্মানবোধ অপরদিকে পরীর মায়ের নীতি নৈতিকতাহীন জীবন। উভয়ের সমন্বয়ে নাট্যকার মূলত সমাজে-সংসারে প্রান্তিক নারীর দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার চিত্রই উপস্থাপন করেছেন। নাট্যকার এখানে দুজন মৃত নারীর জীবন কথা তুলে ধরেছেন। কালিন্দী চরিত্রে মধ্যযুগে বাঙালি সমাজের নারীর জীবনবাস্তবতা আর পরী প্রতিনিধিত্ব করেছে বাঙালির আধুনিক যুগের সমাজবাস্তবতায় নারীর অবস্থান। 'ˆheZx Kb¨vi gb (১৯৯২) নাটকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কালপরিধিতে কিভাবে মুক্ত মানবরসের নাটকের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে পীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং ইতিহাস অভিব্যক্ত হতে দেখি।'[১১৯]

ˆheZx Kb¨vi gb নাটকের প্রবহমান আখ্যান সোমেশ্বরী পাড়ের ধানকুঁড়া গাঁ থেকে মেঘনা হয়ে বরগুনা পটুয়াখালী উপকূলীয় অঞ্চল ধরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই জনপদের মহাজন, ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শরীয়ত মারেফত পন্থী মুসলমান, সামন্ত চাকলাদার, নিকারী, ডোম, রাখাইন

নৃগোষ্ঠী, পালাকার, পুতুল মাস্টার, যাত্রাশিল্পী, ঘুড়ি বিক্রেতা, মাঝি, শুকরপালক, চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ইত্যাদি নানা পেশা, শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন তথা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনির কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন এক ঐক্যসূত্রে পরিধি অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। সেলিম আল দীনের রচনায় পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রবলভাবে প্রাণবন্ত রূপে উপস্থিত হয়েছে। নাট্যকার জীবনের সমগ্রতা আনয়নের প্রয়োজনে নাটকে বাঁশি, হুলো বিড়াল, পুতুল, জল, জলের ভেতরকার প্রতিবিম্ব, মাছ, লতা, জলজ উদ্ভিদ পর্যন্ত চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত। পরী কথা বলে প্রকৃতির সাথে, পুকুরের শান্ত জল, পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়, হুলো বেড়াল কিংবা লঞ্চে করে এক আসর থেকে অন্য আসরে যাবার পথে নদীর জলের সাথে তার নিমগ্ন আলাপ চারিতা চলতেই থাকে।

সেলিম আল দীন এর নাটকে মূলত গ্রামীণ নিম্নবিত্তের মানুষ ও তাদের শোষিত-নির্যাতিত যাপিত জীবনের ইতিকথা উপস্থাপিত হয়েছে। Kwig evIqwji kÎæ ev gj †‘Lv নাটক থেকে তাঁর নাটকে প্রান্তিক জন মানুষ জায়গা করে নিতে শুরু করে। তিনি এদেশের নানা জনপদের শ্রমজীবী, সর্বহারা, নিরন্ন ক্ষুধার্ত প্রান্তিক জনগণের জীবনচিত্র দেশজ নাট্যরীতিতে অসামান্য দক্ষতায় উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রামীণ সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও প্রতিনিয়ত নিগৃহীত নির্যাতিত শোষিত হচ্ছে। তিনি নারী জীবনের সেই মর্মন্তুদ কথা চিত্র wKËb‡Lvjv ও †KivgZg½j নাটকে এঁকেছেন। ˆheZx Kb¨vi gb নাটকেও সমাজের পতিত নিম্নশ্রেণির নারী জীবনের জীবনকথা মঞ্চে উপস্থাপন করেন। এছাড়া কালিন্দী অংশে মধ্যযুগের সমাজে শিল্প সংস্কৃতির পরিবর্তনে মানুষের জীবন যাপনেও পরিবর্তন সূচিত হয় তারই ঐতিহাসিক সত্য উন্মোচিত। নাট্যকার যৈবতী কন্যার মন এই দুই পৃথক সময়ের বা যুগের দুই নারী জীবনের সমান্তরাল পরিণতি এঁকেছেন। উভয় নারীর জীবন ঘটনার ঐক্য সাদৃশ্যমান। বঞ্চিত, নিপীড়িত, দারিদ্র্য জীবনে অস্তিত্বের সংকট প্রগাঢ় হয়ে দেখা দেয়। এ নাটকে নারীর সামাজিক অবস্থান সুস্পষ্ট করা নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। নাট্যকাহিনিতে মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগের দুই নারী কালিন্দী ও পরীর অসীম বেদনা ও জীবনজিজ্ঞাসায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যের চিত্র উঠে এসেছে। এই দুই নারীর আত্মকথনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাঙালি সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক পারিবারিক অবস্থান ব্যক্ত করেছেন সেলিম আল দীন। দুজন নারী সমাজের অবহেলিত, নিগৃহীত ও উপেক্ষিত মানুষ হিসেবে উপস্থাপিত। নৈঃসঙ্গ্যতার যন্ত্রণায় ও অস্তিত্বের সংকটে তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ˆheZx Kb¨vi gb নাটকে স্পষ্ট হয় যুগ-যুগান্তরে সমাজ ও ধর্মকেন্দ্রিক জীবনে নারীর বাঁচার লড়াই অভিন্ন।

সেলিম আল দীন বাংলা জনপদের গ্রামীণ জীবন অবলোকন করেছেন পরম মমতায়। আর সেই জনগোষ্ঠীর সহজ-সরল মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের ইতিবৃত্ত নাট্যকাহিনিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচিত niMR (১৯৯২) নাটকেরই বিষয়বস্তু ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত বিধ্বস্ত এক গ্রামের নির্মম দৃশ্য। ১৯৮৯ সালের গ্রীষ্মকালে মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ নামক এক গ্রামে প্রলয়সদৃশ্য ঘূর্ণিঝড় হয়, সেই ভয়ানক ঝড়ের তাণ্ডব গভীরভাবে আলোড়িত করে নাট্যকার সেলিম আল দীনকে। নাট্যকার niMR এর ভূমিকায় জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় ও তৎপরবর্তী একদল শহুরে ত্রাণকর্মীর উদ্ধার কাজে অংশ গ্রহণ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নাট্যকাহিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর এ নাটকে হরগজের ঝড়ের পরবর্তী প্রতিটি ঘটনা এবং তথ্যাবলি ছিল সত্যাশ্রয়ী। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের সহধর্মিনীর বক্তব্য স্মরণীয় :

> প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলকে দল ছাত্ররা যেত ত্রাণসামগ্রী নিয়ে আর ফিরে এসে সালঙ্কারে বর্ণনা করত ওদের অভিজ্ঞতার কথা। কী করে একটি বিশাল ওজনের ভারবাহী ট্রাক নদীর এপার থেকে ওপারে গিয়ে দিব্যি দাঁড়িয়েছিল, ভরা পুকুরগুলোতে একবিন্দু পানি অবশিষ্ট ছিল না, সবটুকু পানি মাছ ও জলজ প্রাণীসহ কী করে উঠে এসেছিল শস্যক্ষেত্রে, কীভাবে কর্তিত খণ্ডিত দেহাবশেষগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিল এখানে-সেখানে, খেজুর গাছ থেকে কী করে উদ্ধার করা হয়েছিল কাঁটাবিদ্ধ মহিলার মৃতদেহ।[১২০]

ইছামতি নদীর তীরবর্তী কৃষিপ্রধান বর্ধিষ্ণু গ্রাম হরগজ। আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে শত শত মানুষ সেখানে প্রাণ হারায় এবং গ্রামটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সেবা সংস্থা থেকে একটি স্বেচ্ছাকর্মীর দল ত্রাণকার্যে হরগজ পাড়ি দেয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষ, বেসরকারি উন্নয়ণ সংস্থা যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্র পরিচালনাকারীরা অনেক ক্ষেত্রে ঠিক এতটা সক্রিয় ভূমিকায় থাকে না। niMR নাটকে ধ্বংসযজ্ঞের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থাপনা মাত্র। সেবা সংস্থার উদ্ধারকারী দলের সদস্য ডা: মান্নান হাওলাদার, আবিদ, রাজ্জাক সুলতান, নিজাম, মিল্লাত, সাজেদুল প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে হরগজের সমগ্র চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ত্রাণকার্যের এই দলটির মুখ্য চরিত্র আবিদ। আলোচ্য কাহিনির কথক চরিত্রও সে। হরগজের উদ্ধার পর্বের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের কার্যকারণসম্পর্ক, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় এবং প্রত্যেকটি ঘটনার দার্শনিক ব্যাখ্যা, মানবিক দায়বোধ এবং নিরাকৃত সেই ভূগোলের বিচিত্র ঘটনার দর্শক হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া উক্ত চরিত্রের জবানিতেই বর্ণিত। উদ্ধারকর্মী প্রধান আবিদ নির্দেশ দিয়েছিল ত্রাণ বিতরণের; কিন্তু গ্রামের কাউকে জীবিত পায় নি ত্রাণকর্মীরা। শেষপর্যন্ত ত্রাণকর্মীর দল প্রান্তিক মানুষগুলোর মৃতদেহগুলো একত্রিত করতে চেয়েও পারে নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে হরগজ গ্রামের মর্মান্তিক বাস্তবতা দৃষ্টে আবিদের হৃদয়ে

মানবতাবোধ জেগে ওঠে। সে ভাবে এই ধ্বংসস্তূপ যেন এক অসামান্য নিপুণ শিল্পকর্ম। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী গ্রামটি এক বিভীষিকাময় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গ্রামময় মানবদেহ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাটকে বর্ণিত অংশ :

> কোন সন্দেহ নাই যে তিনটাই বালকের মাথা। তবে ধড়গুলা গেল কোথায় ধড়গুলো খুঁজে দেখ নিজাম। ... আবিদ প্রায় ঘোষণার মত করে বলে– যখন একটা মানুষের শরীরের কোন অংশ শুধু পাওয়া যাবে তখন সেই পোর্শনাটকেই পুরা মানুষ ধরে নিতে হবে। ... এই অসম্ভব ঘোষণা একমাত্র উন্মাদই দিতে পারে। কাজেই খানিক বাদে সে আবার বলে টুকরা টাকরি যা পারে যদি মেলান যায় মিলায়ে নিয়ে দাফন করা যাবে।[১২১]

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে হরগজের ঝড়ের তাণ্ডবের ভয়াবহতা উপলব্ধ হয়। সেলিম আল দীন niMR নাটকের 'কথাপুচ্ছ' অংশ উক্ত স্থলে টর্নেডোর ফলে সৃষ্ট বাস্তব ধ্বংসযজ্ঞের একটি বস্তুগত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। niMR নাটকের পটভূমি প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> সে টর্নেডোর ফলে তদঞ্চলে এক সমৃদ্ধ কৃষিজীবী জনপদের প্রায় সামগ্রিক বিনষ্টি ঘটে। উড়ন্ত ঘরের টিন, বৃক্ষ ছিন্ন শাখা, মৃত পাখি-পশুদি সহস্র হত-আহত মানবের দেহ ও খণ্ডাংশ প্রভৃতি প্রাক্কলিত স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ ছিল টর্নেডো উত্তর সে স্থলের সমগ্র প্রান্তর। ... চাক্ষুষ দেখেছে যারা তাদের বর্ণনা মতে হরগজের ঝড়ের যেন বা হাত-পা-চোখ বুদ্ধি এবং মস্তিষ্ক সবই ছিল। একটা বিপুলকায় মহিষ উড়ে এসে আটকে ছিল এক আমগাছের উপর তিন দিন। প্রলয়ঙ্করী সেই ঝড়ে একটা পুষ্করিনীর সমস্ত সঞ্চিত পানি ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল। কোনো কোনো গাছের গুঁড়িতে বিদ্ধ হয়েছিল মানবদেহের নানা খণ্ডিতাংশ। একটা ট্রাক নদীর এপার থেকে ওপারে উড়ে গিয়ে পড়েছিল। মনোয়ারা বেগম (২৫) নামে এক গৃহবধূর লাশ বাড়ি থেকে বহুদূরে গাছের ডালে মৃত ও ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। লোকমান মোল্লা (৬৫) বেলগাছের শাখায় মৃত ও লম্বমান ছিল। পাহালির (৫০) বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে তার ছিন্নভিন্ন শরীর পাওয়া যায়। ছায়াদুর রহমান সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র বিশালকায় কাঠবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। কাদের মিয়া (৩৫) শ্যালো মেশিন ঘরে কাজ করত দূর ধানক্ষেতে তার শরীর ছেঁড়া খোঁড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ফিরোজা বেগম (৩৫) পেট বরাবর উড়ন্ত টিন এসে আঘাত করে, ফলে সে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। রাবেয়া খাতুন (৪০) উড়ন্ত ঢেউটিনের আঘাতে মাথা থেকে ধড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১২২]

প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমি বাংলাদেশ– নিসর্গের সবুজ সৌন্দর্যে চোখ পুড়ে গেলে হয়তোবা ঈর্ষা জেগে ওঠে ঝড় কিংবা জলদেবতার। আচমকা আঘাত হানে জনপদে। নিশ্চিহ্ন করে যাবতীয়

প্রাত্যহিক জীবন এবং সুখ। এই বাস্তবতায় বেড়ে ওঠেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে যাঁর জন্ম। যিনি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে নিরন্তর বোঝাবুঝিতে কাটিয়েছেন কৈশোর। যাঁর লোকালয়ে হ্যারিকেন ও টর্নোডো এক জীবন্তসত্তার অধিক ধ্রুব। তিনি তাঁর পিতামহীর বর্ণনায় পেয়েছেন প্রাকৃতিক তাণ্ডবের মাঝে এক জৈবিক সত্তার উপস্থিতি। তাঁর এলাকায় ঝড়ের অপদেবতার ক্রোধ উপশমের জন্য বাড়ির উঠানে শিলপাটা এবং রসুন ছুঁড়ে দেওয়া হতো। আবার কখনও আজানও দেওয়া হতো। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াইয়ের এই প্রতিবেশ নাট্যকারের মনোজগতে শিল্পের যে অনিবার্য সত্তার জন্ম দিয়েছিল, সেখানেই niMR এর উন্মেষ। ক্রুদ্ধ খেয়ালি প্রকৃতি মুহূর্তের প্রলয় নৃত্যে আধুনিক সভ্যতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিত করে দেয়। হরগজে ধ্বংসের পূর্বে সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল গ্রাম ছিল। হরগজের ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য প্রসঙ্গে নাটকে বর্ণিত হয়েছে :

> সে গাঁয়ের ঢোল-খোল তৈয়ারের সুনাম আছে। অল্পবয়সী ছেমরিরা সুতা কাটে না মাকড়ের আঁশ। নিশি পোহায় তাঁতের শব্দে। সান্দার লাউয়া আছে গেরামের পূর্বে। আর সে দেখেছে মহররমে ঘোড়ার নাচ। তলোয়ার হাতে নাচে গাঁয়ের যুবকেরা। হরগজের মেয়েদের কী নাম ডাক রূপের। আর সব মেয়ে কি রকম অতিথি মনস্ক তা বলে বুঝানো যায় না। তারা বৃষ্টি নামানোর গান গাইতে গাঁয়ের পথে নামে যখন দল বেঁধে তখন যুবকেরা পছন্দ করে নেয় মনে মনে একেক জন মেয়েকে। এমনকি পান বানানোটাও তাদের দেখার মতো। বিয়ের সময় একটা ছোট্ট বানানো পুকুরে সোনার আংটি লুকিয়ে রাখে যদি সত্যি বউকে ভালবাসে তবে তা পাবেই খুঁজে।[১২৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্যে হরগজের প্রকৃতি ও জন মানুষের যে চিত্র তা ধ্বংস পূর্বকালীন রূপ এবং ঐশ্বর্য। আকৃতির ভুবন এর অব্যবহিত পরেই উপস্থাপিত হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত গাঁয়ের শ্রীহীন নিরাকৃতি রূপে। উক্ত বক্তব্য নিম্নরূপ চিত্রভাষ্যে ধরা পড়েছে :

> এমন সময় নিজাম চেঁচিয়ে বলে– পাওন গেছে স্যার আবারও দুইটা মাথা। আবিদ ছুটে যায় টিনের চালের অভ্যন্তরে। একটা মুণ্ড কিশোরের অন্যটা প্রৌঢ়ের ফর্সা। সঙ্গী আরেকজন চেঁচায় পা নাই স্যার তবু পুরা মানুষ পাওন গেছে একজন। মাঝির শায়িত দেহের সঙ্গে একটা কার মাথা মিলানো হলে এক এক রকমের মানুষ তৈরি হয়। কিশোরের মুণ্ড লাগাতেই প্রৌঢ় মাঝির শরীর মনে হয় এক কিশোর ইতর বন্যতায় অকস্মাৎ দৈত্য প্রায় আকার ধারণ করেছে। আবার প্রৌঢ়ের সৌম্যমুণ্ড লাগাতেই মুণ্ডের বর্ণ আর মাঝির শরীরের বর্ণ আরও ভয়ঙ্কর হয়। এই দুটা ছিন্নমাথা আরও দুটা অদেখা শরীরের সম্ভাবনাকে জোড়া দেয়। হারানো শরীর দাবি করে এই ছিন্ন মাথাকে তার কাঁধের

> উপর। কিন্তু কোথায় তাদের ধড়। কাটা-পায়ের লাশটাকে পেয়ে সঙ্গী ত্রাণকর্মী নিজামকে বলে- টুকরা মানুষ দেখতে দেখতে গোটা মানুষের আকার ভুইলা গেছিলাম স্যার।[১২৪]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে যে দৃশ্যমালা বীভৎস ও করুণ রসের সমন্বয়ে চিত্রিত তাতে ধৃত বাস্তবতা স্বাভাবিক দৈনন্দিনতায় অকল্পনীয়। কিন্তু টর্নেডো বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট জনপদের বাস্তবতায় মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আকৃতির জগতে শৃঙ্খলাই মুখ্য কিন্তু নিরাকৃত বিশ্বে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খলতাই প্রকৃত সত্য। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বিশ্বরাজনীতির চরম ভাঙনের মুখে niMR নাটকটি রচিত। পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন বিশ্ব রাজনীতিতে যে অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় তা ভারসাম্যহীন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয় বিশ্ববাসীকে। যেন সভ্যতায় এক ভয়াবহ ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হলো– যার হিংস্র ছোবলে সহস্র বছরের সকল মূল্যবোধ নিমেষে ছিন্নভিন্ন অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। বার্লিন প্রাচীর ভাঙা, মহামতি লেনিনের ভাস্কর্য শক্তিশালী ক্রেনের সাহায্যে গুড়িয়ে দিয়ে তাঁকে অপমানিত করবার মধ্যে যেন সেই ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেন সেলিম আল দীন। niMR নাটকটিকে উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। এর সমর্থনে নাট্যকারের ভাবনার একটি সাযুজ্য সাপ্তাহিক fvlK পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত হয়েছে :

> niMR এর বিষয়বস্তু একটু অন্য ধরনের। এই নাটকে আমার মৃত্যুচিন্তার স্বাক্ষর থাকতে পারে। এই সময়ে রাশিয়ার ভাঙনে বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার ভবিষ্যত নিয়ে একটি শঙ্কাও উপস্থিত হয়েছিলো। সম্ভবত niMR রচনাকালে রাষ্ট্রভাঙনের রাজনৈতিক ঘটনাগুলো নেপথ্যে সক্রিয় ছিলো। আমার কাছে কখনো কখনো এমনও মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সৈন্যদের গণহত্যার স্মৃতি এ নাটক রচনাকালে হয়তো বা জাগ্রত ছিলো। niMR রচনাকালে আমি এক ভয়ঙ্কর বোধের মুখোমুখি হয়েছি।[১২৫]

niMR নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৭১ সালের মৃত্যু আর ১৯৯১ সালে রাশিয়ার ভাঙন। নাট্যকার সেলিম আল দীন niMR এর ঘটনা জীবনাভিজ্ঞানের গভীরতায় মূর্ত এবং বিমূর্ত ভাবনায় আবিষ্কার করেছেন। niMR-এ নাট্যকার টর্নেডো বিধ্বস্ত একটি জনপদের মাধ্যমে এক নিরাকৃত ভুবন নির্মাণ করেছেন। নাটকটি এক বিধ্বস্ত জনপদের ইতিবৃত্ত। আকৃতির চরম বিলুপ্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নিরাকৃত বিশ্ব। নাটকের সমাপ্তিতে উদ্ধারকর্মী আবিদের মানসভুবনে নিরাকৃত জগতের এক অচিন্ত্যপূর্ব রূপ সৃষ্টি হয় যার ফলে এক রাতে চারশো বছরের সকল কথা তার বুকে লাগে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> niMR (১৯৯২) বাস্তব ইতিহাস অবলম্বনে রচিত আকৃতি নিরাকৃতির নাটক। মানুষের সহস্র বছরের নিরন্তর প্রয়াসে বিনির্মিত সভ্যতা যেন প্রকৃতিকে মানুষের এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। প্রকৃতি সচরাচর সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্ররোষ যদি কখনও প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোভাব নিয়ে আবির্ভূত হয় তবে তার ফল হয় ভয়াবহ। সহস্র বছরের প্রয়াসে সৃষ্ট সভ্যতার সকল অর্জন এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হরগজে সংঘটিত টর্নেডো তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সেলিম আল দীন প্রকৃতির স্বাভাবিক একটি ঘটনাকে নাটকের বিষয়রূপে নির্বাচনপূর্বক স্বীয় প্রত্যক্ষণ ও উপলব্ধির সূক্ষ্মতায় নবতর ব্যাখ্যা প্রদান করেন।[১২৬]

niMR নাটকে এক দার্শনিক বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়, মহাজগতের এক রহস্যময়তাকে অনুসন্ধান করেছেন নাট্যকার। গূঢ়ার্থে বলা যায়, মহাজগতের দৃশ্যমান রূপ যে শৃঙ্খলা ও অনাবিল সৌন্দর্য নিয়ে মূর্ত তার একটি বিশৃঙ্খল বীভৎস বিপরীত এবং অনভিপ্রেত রূপও আছে। সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না। কখনও আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক কারণে সেই রূপটি নানা অভিজ্ঞতায় কল্পনাতীত ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে।

সেলিম আল দীনের weï Kgv‡ii cZj bvP নাটকটি এদেশের ঐতিহ্যবাহী কুমার পেশার লোকদের দুঃখ-দুর্দশার ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত। কুমার সম্প্রদায়ের বিশু ও তার স্ত্রী ফুলমতি মাটির হাড়ি পাতিল বিক্রি করে এক সময় তাদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন কাটাতো। এই দম্পতির জীবন ছিল হাসি আনন্দে ভরপুর। টুপকার চরের এই কুমার পেশার লোকেরা বর্তমানে চরম দুর্দিনে দিন যাপন করছে। মহাজনের ঋণে তারা জর্জরিত। তাদের মাটির তৈরি জিনিসপত্র আর পূর্বের ন্যায় বিক্রি হয় না। গ্রামে গ্রামে আসে ভ্রাম্যমাণ এনামেলের তৈজস পত্র বিক্রেতারা। কারখানার এনামেলের দ্রব্যাদি ভাঙে না সেগুলো টেকসই। মাটির তৈরি দ্রব্য বিক্রেতা কুমার সুহেন অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করে। সে মহাজনের ঋণের বোঝা সহ্য করতে পারে নি। অবশেষে সে আত্মহুতি দিয়ে এ পেশা থেকে বিদায় নেয়: 'হায় হায়রে হায় হায়রে। সুহিন ফাঁসি নুইছে। তিনদিন উপাস থাইকা সুহেন ফাঁসি নুইছে।'[১২৭]

টুপকার চরের কুমারদের গ্রাম থেকে উত্তরে চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। জীবিকার তাগিদে তাদের চৌদ্দ পুরুষের বসত ভিটা ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যায়, যেখানকার মানুষ এখনও মাটির তৈরি হাঁড়ি পাতিল ব্যবহার করে। এসব অঞ্চলে এনামেলের জিনিসপত্র পৌঁছেনি। বিশুর অভাবের সংসারে স্ত্রী ফুলমতি গোদরোগী। গ্রাম ছেড়ে অনেকে চলে গেলেও বিশু যায় নি। সে মুখোমুখি হয় ভ্রাম্যমাণ এনামেল তৈজস পত্র বিক্রেতার। তবে হাল ছাড়ে না। সে রঙ দিয়ে, নকশা দিয়ে কারুকাজ করে

দ্রব্যাদি বানাবে। মাটি নিয়ে সে সাত বরণের খেলা খেলবে। সে দৃঢ় ও সাহসী হয়ে ওঠে। দরকারের জিনিসে একটু রঙ দিবে। বিশুর ধারণা মানুষ জন্তু নয়, রঙ দেখলে মাটির জিনিসের কদর তারা করবে। সে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। নাটকের শেষে বিশু ও মূল গাতকের ভাবনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার একটি সদর্থক চিন্তায় উপনীত হন। কুমার সম্প্রদায়ের জীবনে সুখ-শান্তি, আনন্দ- ফিরে আসবে, এই প্রত্যাশায় নাট্যকার নাটকের পরিসমাপ্তি করেন। যেমন :

> বিশু। তাইলে বেবাক কুমারগরে ফিরায়া আনি। কমু উত্তরের দেশে কেউ যাবা না। মা বসুন্দরা ঝিনাই নদীতে দেহ ধইরা কয়া দিছে বিশু পাগলরে তোরা যন্ত্রের নগে নারাই কর। তারা খালি দরকারের জিনিসরে হেলা কইরা বানাইস না। তোরা যদি কলসির গায় লীল বরণ রঙ মাইখা শাদা কলমী লতা আঁইকা দেস মাটি মা জননীর তাতে রূপ খোলে। কমু রসিকলাল-খবদ্দার ভিটা ছারবা না। আমরা দরকারে জিনিস সোন্দর করুম আর সোন্দর জিনিসরে দরকারি কইরা তুলুম। এহন না পারি তহন পারুম। করতে করতে পারুম। যাও টেকা ফেরত দিয়া আহ মহাজনের। ভিটা আমরা ছারুম না।[১২৮]

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার মধ্যে পুতুল নাচ একটি প্রাচীন নাট্যধারা। এ শ্রেণির নাট্যে কুশীলব হিসেবে মানুষের পরিবর্তে মাটি, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে তৈরি সুসজ্জিত পুতুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুতুল নাচের ক্ষেত্রে মানুষ কর্তৃক অভিনীত বা পরিবেশিত হবার বিষয়টি হয়তো প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয় না। তবে পুতুলের অভিনয়কে পর্দার আড়াল থেকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তিনি মানুষ। এছাড়া পুতুল নাচের আসরে সামনে উপস্থিত বর্ণনাকারী, যিনি পুতুলের সঙ্গে বিভিন্ন সংলাপ ও কথোপকথনে অংশ নেন তিনিও মানুষ। মূলত বিভিন্ন জাতীয় দিবসকেন্দ্রিক নাগরিক মেলাতে এবং সকল গ্রামীণ মেলাতে পুতুল নাচের আসর বসে। তবে, বৈশাখী মেলাতেই সবচেয়ে বেশি পুতুল নাচ প্রদর্শনী হয়ে থাকে। পুতুল নাচ এক সময় একটি জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যম ছিল কিন্তু বর্তমানে এই শিল্পটি আর পূর্বের ন্যায় মানুষকে বিনোদন দিতে পারে না। কারণ পুতুল নাচের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পুতুল নাচের ক্ষেত্রে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও পৌরাণিক ভাবালুতার পরিহার করে তাকে অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের পাশে টিকে থাকতে হবে। এর সংস্কার সাধন করে পুতুল নাচকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। মূলত সেলিম আল দীন মনে করেন পুতুল নাচের ক্ষয়িষ্ণু দশা থেকে তাকে রক্ষা করা যেমন জরুরি তেমনি কুমারদের মাটির তৈজস পত্রকে বিলুপ্তির থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা কারুকাজে সমৃদ্ধ করা। ‡eï Kgv‡ii cZj bvP নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যবাহী পেশার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ধারণা ব্যক্ত করেন :

> এছাড়াও আমি পুতুল নাচের ক্ষেত্রে পৌরাণিক ভাবালুতারও পক্ষপাতি নই। আধুনিক জীবন থেকে চরিত্র ও কাহিনী গ্রহণ ব্যতিরেকে এই শিল্প মাধ্যমটিকে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। উপরন্ত পৌরাণিক চরিত্রসমূহকে আধুনিক তাৎপর্যে উদ্ভাবিত না করলেও পুতুল নাচের পক্ষে আধুনিককালের যান্ত্রিক গণমাধ্যমের সঙ্গে পেরে উঠা মুস্কিল হবে। এই ভাবনা থেকে রচনা করেছি 'বিশু কুমারের পুতুল নাচ'।[১২৯]

সেলিম আল দীন রচিত একটি জনপ্রিয় নাটক ewmb। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারে বিভিন্ন সংগঠনের সর্বাধিক মঞ্চস্থ নাটক ewmb। নাটকের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাজি আন্দোলনের কথা। অপর দিকে সমসাময়িক সমাজের ঘৃণিত যৌতুক প্রথার শিকার এক বর্গাচাষীর কন্যার আত্মহত্যার করুণ চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুর গ্রামে হাজি শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও অচিরে তা ইংরেজ ও তদসৃষ্ট জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে এক বিরাট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফরিদপুর-পাবনা-বরিশাল-ময়মনসিংহ-নোয়াখালী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান কৃষকেরা এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ব্যাপক অংশ গ্রহণ করেন। উনিশ শতকের তিরিশ দশকে শরিয়তউল্লাহর পুত্র দুদু মিয়ার মৃত্যু হলে এ আন্দোলন ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে ঐতিহাসিকভাবে ধর্মীয় আন্দোলন রূপে প্রমাণিত করার চেষ্টা চলেছে। আসলে এটা ছিল বৃটিশ শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ এবং সংগ্রাম। ewmb নাটকের কাহিনি এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। আন্দোলনের নিহত কোনো এক ফরাজির ব্যবহৃত বাসন একটি কৃষক পরিবার বংশানুক্রমে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রক্ষা করে আসছিল। বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্ন বাসনটি একজন রাজনৈতিক ব্যবসায়ীর প্রত্নসংগ্রহের লোলুপ দৃষ্টির শিকার হলে গ্রামবাসীগণ তা সমবেতভাবে রক্ষা করে। এই কাহিনিকে ঘিরে ewmb নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলে। এখানে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারি প্রথার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়। নাটকে লক্ষ করা যায়, জমিদার পুত্র আজিজ ঢাকা শহর থেকে গ্রামে আসে। প্রত্নসংগ্রহ করা তার শখ। তার পূর্বপুরুষ ছিল জমিদার, মানুষের উপর শাসন ও শোষণ করত তারা, করত নির্মম নির্যাতন। আজিজ গ্রামে এসে নিজেই বর্গাচাষি আশেকের বাড়িতে একবেলা খাবারের নিমন্ত্রণ সাগ্রহে নেয়। আশেকের পুত্র জমির আজিজকে আজাজীল বলে গালমন্দ করে, তাকে সে পছন্দ করে না। তাই তার পরদাদার ব্যবহৃত খাওনের বাসন ঐ জমিদারকে দেবে না। এমন কি কড়ির তৈরি বাসনটিতে জমিদারকে ভাত খেতেও দিতেও অস্বীকৃতি জানায়। এই নিয়ে

পিতা আশেক ও পুত্র জমিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব। জমির যুক্তি দিয়ে বলেছে তার জমিদারদের প্রতি ঘৃণার কারণ। এরই মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয় এ অঞ্চলের সংগ্রামী মানুষের ইতিহাস :

> আমার পর দাদা ইংরেজগো বিরুদ্ধে নাড়াই করেছে। জমিদারগোরে নিজের হাতে জবাই করছে– বাজানইতো এই সব কিচ্ছা শুনাইছে ছোডোকালে। তিন চাইর কুড়ি বছর আগে জমিদারেরা বাহাদুরপুর গাঁয়ের এক চাষীর ম্যায়া ধইরা নিয়া গিয়া জ্বেনা করছাল। পরদাদারা এক জোট হয়া তার শোধ নিছাল। ফরাজিগো নগে জমিদার গো নাড়াই বাইজা গেল ঐ গোরার গুষ্টি ইংরেজ অত্যাচারী জমিদারগো পক্ষ নিলো।[১৩০]

আজিজ আশেকের বাড়িতে খেতে এসে শুনতে পায় জমিদারকে খুনের কারণে তার পরদাদার ফাঁসি হয়েছিল। আজিজ যাবার বেলায় বলে যায়, তোমার পরদাদার চিহ্ন বাসনটা নজরানা দাও আমাকে। কেননা এ বাসন বিদ্রোহী বাসন। দুই হাজার টাকার বিনিময়ে বাসনটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত হয় এবং এই টাকা নিয়ে আশেক তার মেয়ে কৈতরিকে যৌতুকসহ শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে। একদিকে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া এবং অপরদিকে ঐতিহ্যের শেষ চিহ্ন বাসনের জন্য দরদ। আশেকের পুত্র জমির বাপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বাসনের কারণে পাগল হয়ে গেল সে। মেয়ের দু হাজার টাকা জোগার করা সম্ভব না হওয়ায় মেয়েটি বিষ খেয়ে মারা গেল। কৈতরির লাশের সঙ্গে বাসনটি দিতে চেয়েছিল কবরে কিন্তু সমবেত জনতার জন্য দিতে পারে নি। জমির প্রতিশোধ নেয়, সে আজিজের বাড়িতে আগুন দেয়। আজিজ পালিয়ে যায় শহরে। এই বাসন সাহস সঞ্চার করেছে সকলের মধ্যে, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এভাবেই জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রূপায়িত হয়েছে evmb নাটকে।

সেলিম আল দীন রচিত MwŠKMY K‡n নাটকটি এদেশের যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে রচিত। এক কথায় বলা যায়, যাত্রা শিল্পের সামগ্রিক অবস্থার এক নিখুঁত দলিল। এদেশের ঐতিহ্যবাহী যাত্রা শিল্প আজ কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব যাত্রাপালা এক সময় মানুষের বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল। নানা ধরনের চমকপ্রদ নাম ছিল সেসব যাত্রাদলের। 'দি নিউ ঘোষাল অপেরা' র কাহিনি নিয়ে নাটকের শুরু। এসব যাত্রা পালায় মঞ্চস্থ হয় লোকজ নানা কাহিনি মধুমালা মদনকুমার, গুনাই বিবি, রহিম রুব্বান, রাম-রাবণের পালা, বেহুলা-লখিন্দরের পালা প্রভৃতি। বর্তমানে যাত্রা শিল্পীদের নানা দুঃখ কষ্টে, আর্থিক টানাপোড়নে দিন কাটে। শত কষ্টের মধ্যে তারা এ শিল্পকে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের নিজেদের অভিনেতার সংকট, ব্যক্তিগত নানা দ্বন্দ্ব, যাত্রার মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা সবই আলোচ্য নাটকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান যুগে যাত্রা শিল্পের ধ্বংসের জন্য দায়ী যুগের

হাওয়া। পশ্চিমাধাচের নাচে গ্রামগঞ্জের মানুষও আনন্দ খুঁজে পায়। আর এ কারণে যাত্রাগানে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায় এই শিল্প তার স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। নাট্যকার বাঙালির যাত্রা শিল্পের ক্ষয়িষ্ণু অবক্ষয়িত রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনেতিক কাঠামোতে এনেছে পরিবর্তন, তেমনি পরিবর্তন এনেছে একাত্তর পরবর্তী নাটকের বিষয়-চেতনায়। সেলিম আল দীন সেই সময়ের সহযাত্রী। তাঁর প্রস্তুতি পর্বের নাটকে বিষয় হিসেবে প্রধান্য পেয়েছিল নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের চাকরি সমস্যা, পারিবারিক-আর্থিক অনটন, সংসারের দুঃখকষ্ট, মান-অভিমান, যুব সমাজের হতাশা, যুদ্ধোত্তর-বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, কালোবাজারি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রভৃতি। কিন্তু তাঁর বিকাশ পর্যায়ের নাটকে চিত্রিত হয়েছে বিশাল বাংলার অকৃত্রিম রূপ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলা ও বাঙালির চিরন্তন সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঐতিহ্যের রূপায়ণ। সমাজের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের দ্রোহচেতনা, শোষক-গোষ্ঠীর নিপীড়ন, লোকায়ত জীবনের বঞ্চনা ও ক্রূরতা নাটকের বিষয়ভাবনায় অধিক মাত্রায় সংযোজিত করে নাট্যকার তুলে ধরেন লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি। বিকাশ পর্যায়ের নাটকের বিষয় উপস্থাপনে এবং নাট্যঘটনায় নারী চরিত্রের উপস্থিতি একটি বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজে নির্যাতিত নিপীড়ত নারীর প্রতিনিধি তারা। wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n‘vB, ˆheZx Kb¨vi gb প্রভৃতি নাটকে নারীর ধর্ষিত রূপ ও ভ্রূণ হত্যার প্রসঙ্গ একের পর এক এসেছে। wKËb‡Lvjv-এর ধর্ষিতা বনশ্রীর আত্মহত্যা, †KivgZg½j-এর নূরজাহানের মৃত্যু, ˆheZx Kb¨vi gb-এর কালিন্দী ও পরীর আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘটনা প্রসঙ্গত সমাজে নারীর অবস্থান স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, সেলিম আল দীনের নাটকে সামাজিক লিঙ্গভেদের সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj 'xb iPbvmgM- 2 (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬) পৃ. ৮১

২. Z‡'e, পৃ. ৮৩

৩. Z‡'e, পৃ. ৮২

৪. সেলিম আল দীন, "আলাপনে সেলিম আল দীন", বিপ্লব বালা গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সম্পা., Knb K_v (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০০৮) পৃ. ১৭০

৫. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", পৃ. ৮৭

৬. Z‡'e, পৃ. ৮৭

৭. Z‡'e, পৃ. ৯৬

৮. Z‡'e, পৃ. ৯৬

৯. evsjv‡'‡ki †jvKR ms¯'wZ MŠgvjv, মানিকগঞ্জ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪) পৃ. ২৯৯

১০. মেহেরুন্নেসা সেলিম, "নাটকের সাথে বসবাস", মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ mI'v (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১১২

১১. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", পৃ. ১২৭

১২. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", প. ১১৮

১৩. Z‡'e, পৃ. ১৬৪

১৪. cmwjg Avj 'xb iPbvmgM- 2, পৃ. ৩৩৮

১৫. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", পৃ. ১৬১

১৬. রাহমান চৌধুরী, ivR‰bwZK bvU¨wPšÍv I ¯'vaxbZv cieZx evsjv‡'‡ki gÂbvUK (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ৪৩৪

১৭. মো: জাকিরুল হক, 'B evsjvi bvU‡K cwZev'x †PZbv (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭) পৃ. ২২২

১৮. আফসার আহমদ, g‡Âi wU‡jvRx I Ab¨vb¨ ceü (ঢাকা: গ্রন্থিক, ১৯৯২), পৃ. ৭৫

১৯. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj 'x‡bi bvUK (ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২), পৃ. ৬০

২০. Z‡'e, পৃ. ২৯

২১. cmwjg Avj 'xb iPbv mgM- 2, ভূমিকা দ্রষ্টব্য

২২. cKivgZg½j, ঢাকা থিয়েটার, m¨vfwbi, ১৯৮৬

২৩. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj 'xb iPbvmgM- 2, পৃ. ২৩৯

২৪. Z‡'e, পৃ. ২৪৪

২৫. Z‡'e, পৃ. ২৪৬

২৬. Z‡'e, পৃ. ২৫০

২৭. Z‡‘e, পৃ. ২৫০-২৫১

২৮. Z‡‘e, পৃ. ২৫২

২৯. Z‡‘e, পৃ. ২৫৪

৩০. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ২৪৫

৩১. সেলিম আল দীন "কেরামতমঙ্গল", পৃ. ২৫৭

৩২. Z‡‘e, পৃ. ২৬৩

৩৩. রাহমান চৌধুরী, ivR‰bwZK bvU¨wPšÍv I ¯vaxbZv cieZx evsjv‡‘‡ki gÂbvUK, পৃ. ৪৩৬

৩৪. সেলিম আল দীন "কেরামতমঙ্গল", পৃ. ২৬৮

৩৫. Z‡‘e, পৃ. ২৭৩

৩৬. Z‡‘e, পৃ. ২৭৪

৩৭. মো: জাকিরুল হক, ‘B evsjvi bvU‡K cwZev‘x †PZbv, পৃ. ২৪৯

৩৮. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", পৃ. ২৭৮-২৭৯

৩৯. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১৪

৪০. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", পৃ. ২৮৪

৪১. Z‡‘e, পৃ. ২৮৯

৪২. Z‡‘e, পৃ. ২৯২

৪৩. Z‡‘e, পৃ. ২৯৫

৪৪. Z‡‘e, পৃ. ৩০৬

৪৫. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১২

৪৬. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", পৃ. ৩০৬

৪৭. ড. আহমদ শরীফ, mvßvwnK wewPÎv, ১৯৮৬

৪৮. সেলিম আল দীন, "হাত হদাই", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 3 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স), পৃ. ৫৯

৪৯. Z‡‘e, পৃ. ৬৫

৫০. Z‡‘e, পৃ. ৬৯-৭০

৫১. Z‡‘e, পৃ. ৮১

৫২. Z‡‘e, পৃ. ৭৭

৫৩. Z‡‘e, পৃ. ৮৫

৫৪. Z‡‘e, পৃ. ৮৮

৫৫. Z‡‘e, পৃ. ৯১

৫৬. Z‡‘e, পৃ. ৫৬

৫৭. Z‡‘e, পৃ. ১০১

৫৮. Z‡‘e, পৃ. ১০৬-১০৭

৫৯. Z‡‘e, পৃ. ১১২

৬০. Z‡‘e, পৃ. ১৩৪

৬১. Z‡‘e, পৃ. ১৪৫

৬২. Z‡‘e, পৃ. ১৫৩

৬৩. Z‡‘e, পৃ. ১৮৭

৬৪. Z‡‘e, পৃ. ২০১

৬৫. পবিত্র সরকার, "নানা গল্পের নকশি কাঁথা", মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ ml‘v, পৃ. ৫৫

৬৬. Avb›‘ wewPÎv, ৪৮ সংখ্যা ১৬-৩১ জুলাই, ১৯৮৮, পৃ. ২৫

৬৭. সেলিম আল দীন, পরিশিষ্ট, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 3, পৃ. ৫১২

৬৮. বিভাস চক্রবর্তী, "জনজীবনের বর্ণাঢ্য মহাকাব্য", মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ ml‘v, পৃ. ৫৩

৬৯. সাঈদ আহমেদ "গৌড়জনের সেলিম আল দীন", সংকলক: এস.এম. ফারুক হোসাইন, mvZ ml‘v, পৃ. ১৮০

৭০. A¨vjevg: MY Av‡›‘vjb (১৯৮২-৯০) ১ম খণ্ড, সম্পা. ইউসুফ মুহম্মদ, (চট্টগ্রাম, তোলপাড়, ১৯৯৩), পৃ. ১৩০

৭১. হোসনে আরা জলী, evsjv‡‘‡ki bvUK: welq †PZbv, (১৯৪৭-১৯৮২) (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনালয়, ২০১২), পৃ. ১৩৩-১৩৪

৭২. সেলিম আল দীন "চাকা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা. †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ১২৯

৭৩. Z‡‘e, পৃ. ১৩০

৭৪. Z‡‘e, পৃ. ১৩১

৭৫. Z‡‘e

৭৬. Z‡‘e, পৃ. ১৩২

৭৭. Z‡‘e, পৃ. ১৩১

৭৮. Z‡‘e, পৃ. ১৩০

৭৯. Z‡‘e, পৃ. ১৩২

৮০. Z‡‘e, পৃ. ১৩৫

৮১. Z‡‘e

৮২. Z‡‘e, পৃ. ১৩৮

৮৩. Z‡‘e

৮৪. মেহেরুন্নেসা সেলিম, "নাটকের সাথে বসবাস", mvZ ml‘v, পৃ. ১১৫

৮৫. লুৎফর রহমান, Kv‡ji fv¯‹i †mwjg Avj ‘xb (ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৭২

৮৬. সেলিম আল দীন, "চাকা", পৃ. ১৩৯

৮৭. সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট" সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4, পৃ. ৭৩৪

৮৮. সেলিম আল দীন, "চাকা", পৃ, ১৪২

৮৯. Z‡‘e, পৃ. ১৪৭

৯০. Z‡‘e

৯১. Z‡‘e

৯২. Z‡‘e

৯৩. Z‡‘e, পৃ. ৪৮

৯৪. Z‡‘e, পৃ. ১৪৯

৯৫. Z‡‘e, পৃ. ১৫১

৯৬. Z‡‘e, পৃ. ১৫৩

৯৭. Z‡‘e

৯৮. Z‡‘e

৯৯. সেলিম মোজাহার, ¯vaxbZv-DËi XvKv‡K»‘K gÂbvU‡K ivRbxwZ I mgvRev¯ÍeZv (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ১১৫

১০০. সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", পৃ. ৭৩৪

১০১. অরুণ সেন, "সেলিম আল দীন : নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র", ‘B evsjvi w_‡qUvi, বগুড়া, ২০০০, পৃ. ৬৩

১০২. সেলিম আল দীন, "চাকা", পৃ. ১৫৫

১০৩. Z‡‘e, পৃ. ১৫৯

১০৪. হাসান আজিজুল হক, "জন্ম জয়ন্তীর শুভকামনা", মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ mvl ‘v, পৃ. ১০১

১০৫. সেলিম আল দীন, "চাকা", পৃ. ১৬০

১০৬. অরুণ সেন, "সেলিম আল দীন : নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র", পৃ. ৬৩

১০৭. সেলিম আল দীন, "চাকা", পৃ. ১৬১

১০৮. লুৎফর রহমান, Kv‡ji fv¯‹i †mwjg Avj ‘xb, পৃ. ৬৭

১০৯. সেলিম মোজাহার, স্বাধীনতা-উত্তর মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা, পৃ. ১১৬

১১০. সেলিম আল দীন, "যৈবতী কন্যার মন", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4, পৃ. ১৬৬

১১১. Z‡‘e, পৃ. ১৮৫

১১২. Z‡‘e, পৃ. ১৮৭-১৮৮

১১৩. Z‡‘e, পৃ. ১৯৫

১১৪. Z‡‘e, পৃ. ২০১

১১৫. Z‡‘e, পৃ. ২০৬

[১১৬.] Z‡‘e, পৃ. ২০৭

[১১৭.] সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4, পৃ. ৭৩৮

[১১৮.] সেলিম আল দীন, "যৈবতী কন্যার মন", পৃ. ২৫৫

[১১৯.] লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১৫

[১২০.] মেহেরুন্নিসা সেলিম, "নাটকের সাথে বসবাস", পৃ. ১১৬

[১২১.] সেলিম আল দীন "হরগজ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4, পৃ. ৩১১

[১২২.] সেলিম আল দীন, "কথাপুচ্ছ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 4, পৃ. ৩১১

[১২৩.] সেলিম আল দীন, "হরগজ", পৃ. ২৮১

[১২৪.] Z‡‘e, পৃ. ৩০৪

[১২৫.] সেলিম আল দীন, "এক সাব্যসাচী নাট্যব্যক্তিত্ব", তাজুল ইসলাম ফিরোজী গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সম্পা., Knb K_v, পৃ. ৬৪

[১২৬.] লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১৫

[১২৭.] সেলিম আল দীন, "বিশু কুমারের পুতুল নাচ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-3, পৃ. ৪৭

[১২৮.] Z‡‘e, পৃ. ৪৭

[১২৯.] সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 3, পৃ. ৫০৮-৫০৯

[১৩০.] সেলিম আল দীন, "বাসন", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM- 3, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
প্রতিষ্ঠা পর্যায়ের নাটকের বিষয়বিচার (১৯৯৫-২০০৭)

সেলিম আল দীনের নাটক বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। তিনি আখ্যান ভাবনায় ক্রম-রূপান্তরের ধারায় অগ্রসরমান হয়েছেন। বাংলার প্রাচীন জনপদ এবং বাঙালি সমাজের প্রান্তিক মানুষের নানামাত্রিক জীবনচিত্র পরম মমতায় মহাকাব্যিক নাট্যভঙ্গিতে ধারণ করতে চেয়েছেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর চেয়ে বড় করে দেখেছেন দেশের মানুষকে। ফলে কোনো গোত্র বা গোষ্ঠীর উপস্থাপক নন নাট্যকার সেলিম আল দীন; বরং তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে সমাজের প্রান্তিক জনমানুষের রূপকার। তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরা প্রকৃতপক্ষে বাংলা-জনপদের নিচু শ্রেণির মানুষ। মূলত সেলিম আল দীন গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনমানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, শোষণ-বঞ্চনা, সংগ্রাম প্রভৃতি অত্যন্ত দরদ দিয়ে অবলোকন করেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠা পর্যায়ে তাঁর রচিত নাটকগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে এদেশে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনের নানা সমস্যা ও সংকট, আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস। তাঁর রচিত নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় লুপ্তপ্রায় বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে। এ পর্বে রচিত সেলিম আল দীনের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হলো GKwU gigv i/cK_v, ebcvsïj, wbg¾b, ¯Y‡evqvj, cvP¨, avegvb, cÎ, DIv Drme I ¯c igYxMY প্রভৃতি।

সেলিম আল দীন রচিত ebcvsïj নাটকে আদিবাসী সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। টাঙ্গাইলের সখীপুর অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষয়িষ্ণু নৃ-গোষ্ঠী মান্দাই। মান্দার বা কোচ সম্প্রদায়ের জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে ebcvsïj নাটক রচিত। এ নাটকে তাদের জীবন-সংগ্রাম, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'ebcvsïj সর্বপ্রাণবাদী কোচ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের জীবন্ত চিত্র।'[১] এ নাট্যকাহিনিতে প্রাধান্য হয়েছে অরণ্যের ভেতর রক্তাক্ত এক জনপদের প্রান্তিক আদিবাসী গোষ্ঠীর ইতিকথা। ebcvsïj এর লুৎফর মাস্টার, ফরেস্টার, সুকি, গুণীন, অনিল কোচ, মঙ্গলি, রাজেন্দ্র, সোনামুখি সবাই যেন এক অখণ্ড জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। যে অরণ্যে মান্দাইদের বসতি, তাদের জীবনের শেকড় প্রোথিত সে অরণ্যের পত্রাদি ক্রমশ ঝরে পড়ছে। নাট্যকার পত্র-ঝরার প্রতীকে নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষয়িষ্ণু জীবন এখানে উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য স্মরণীয় :

> ebcvsï j যাঁদের নিয়ে রচিত তাদের কারো কারো সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ। এই লুপ্ত প্রায় নৃগোষ্ঠী যে ভগ্ন অরণ্যে থাকেন সেই স্থলের মাটির রঙ আবর্তিত হেমন্ত, শীত ও বসন্ত শুরুর পাতা খসাবার দিনগুলির সঙ্গে আমার কত যে জানা শোনা। রাজেন্দ্র অনিল মালতিদের আমি দেখেছি।[২]

ebcvsï j নাটকের একটি অন্যতম চরিত্র সুকি। সুকি মান্দাই সম্প্রদায়ের বাল্য বিধবা নারী। ধর্ম তার জীবনে তমসাবৃত্ত সৃষ্টি করেছে। ebcvsï j এর সুকি, যার কণ্ঠের বনসংগীত আর হাতের বনদরায় মাতাল হয় বনপাংশুলগণ। প্রণয় আর পরিণয় নিষিদ্ধ এক নারী সুকি শিবের পায়ে নিবেদিত। মান্দাইগণের ধর্মাচার এবং লোকাচারের নিরিখে সুকি এক সাধারণ নারী। কিন্তু নাটকে অনিল কোচের প্রণয় আহ্বান এবং দেহের ভেতরে প্রবহমান কামপীড়ায় সুকি আর কোনো সাধারণ মান্দাই সেবাদাসী থাকে না। এক রাতে কোনো এক পাখি ডাকার অদৃষ্ট দিয়ে বেঁধে প্রশ্রয় দেয় অনিল কোচের প্রেমকে। সহস্র পিপীলিকার দংশনে নিজেকে পীড়িত করে প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে পরিতৃপ্ত করে নিজের অবদমিত কামস্পৃহা। গোষ্ঠীগত সংস্কার ও রীতি অনুযায়ী সুকি শিব-সমর্পিতা। কিন্তু যুবতী সুকির অতৃপ্ত যৌবন চন্দ্রাহত রাতে তাকে মানবিক করে তোলে। সে অনিলের সঙ্গিনী হয়ে রীতি ভাঙে। তারপর ধর্ম-সংস্কার অতিক্রম করে সুকি ফিরতে পারে না স্বাভাবিক জীবনে। অতৃপ্ত নারী সুকির মানবিক আর্তনাদে বিদীর্ণ হয় মান্দাই অরণ্যের পত্রাদি। মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর শিব সমর্পিতা নারী সুকি শেষপর্যন্ত তার অপমান, অবমাননা ও জীবনবাস্তবতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, 'আমি উমা না দ্যুগা না। পরান কিসসার কুচুনী। শিবের বেশ্যা।'[৩]

বনপাংশুল শব্দটির আভিধানিক অর্থ পাঁচালি; সুতরাং নাটকে লুপ্ত প্রায় মান্দাই বা কোচের বাস্তব-জীবন নিয়ে রচিত পাঁচালি-ই ebcvsï j । মান্দাই সম্প্রদায় সাধারণ বাঙালিদের দ্বারা শোষিত নির্যাতিত। ebcvsï j-এ বাঙালি জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনের ইতিকথা বর্ণনা করেছেন নাট্যকার। মান্দাই সম্প্রদায়ের ভূমি দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের মূল দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়। এরপর তা বিস্তৃত হয়েছে সাংস্কৃতিক-পৌরাণিক বিশ্বাসের জগৎ পর্যন্ত। বাঙালিরা আদিবাসী মান্দাইদের ভূমি দখলের মাধ্যমে তাদের জাতিগত ইতিহাস-ঐতিহ্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। জাতিগত ঐতিহ্য সংরক্ষণের এ সংগ্রামচিত্র তুলে ধরে নাট্যকার নৃ-গোষ্ঠীগত প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট ও বিপন্নতাকে মূর্ত করে তোলার প্রাণপণ পেয়েছেন। তবে মান্দাই সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু নাটকের প্রান্তিক মানুষগুলোর চারিত্রিক উজ্জ্বল্য প্রতিবাদে প্রতিরোধে নবতর জীবনের কামনা করে। অগ্নিদগ্ধ হয়েও তারা পুনরায় জেগে ওঠার স্বপ্ন

দেখে। নাট্যকাহিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, ধর্ষিতা নারী সুকির গর্ভে বেড়ে ওঠা ভ্রুণে মান্দাই সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে 'সুকির গর্ভে ধর্ষণের ভ্রুণ পাপ পুণ্যের ধার ধারে না মোটেই। মানবিক নিয়মে সে বেড়ে উঠে। সুকির গর্ভেই কালো মেঘের কাজল পড়ে নেয় আরেক বনপাংশুল সে আসবে।'[৪]

ebcvsï j নাটকে অর্থলোভী বাঙালি মহাজনদের সাথে মান্দার সম্প্রদায়ের সংঘাত-সংঘর্ষ বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মহাজনদের আর্থিক শোষণ যেমন একটা দিক তেমনি বাঙালি স্কুল শিক্ষক অথবা ফরেস্টার অফিসার হাসানের মতো হৃদয়বান মানুষও তাদের পাশে আছে। কোচ সম্প্রদায়ের নিরুপায় অসহায়ত্ব এবং নিয়তি নির্দিষ্ট জীবনের অমানবিক ছবি ebcvsï j নিপুণভাবে নাট্যরূপ পেয়েছে। এখানে নাটকের একটি বিশেষ চরিত্র লুৎফর মাস্টার। তার মুখেই শোনা যায় একটি গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির হারিয়ে যাওয়ার গল্প। বাঙালিদের অত্যাচারেই এই উপজাতির মানুষ জনের মুখের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। বাঙালিদের চোখে বেজন্মা লুৎফর চায় এই মানুষগুলোর মুখের ভাষা যাতে মানুষগুলোর মতোই হারিয়ে না যায়, সেজন্য একটা ব্যাকরণ বই লিখবে।

ebcvsï j নাটকে মান্দাইদের সংস্কার-বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। অরণ্যচারী কোচ সম্প্রদায়ের জীবনে বৃক্ষ অমোঘ অনিবার্য। নানাপ্রকার বনজ বৃক্ষের শেকড়-বাকড় দ্বারা বাখড় তৈরি এবং তৈরি বাখড় দ্বারা তারা মদ চোলাই করে। তারা বৃক্ষপূজারি, মৃত্যুর পর বৃক্ষ-শরীরে মানুষের আত্মাকে বন্দি করে। নৃপেনের মৃত্যুর অংশে কোচরা প্রকৃতি ও কৃত্যের ভেতর সান্ত্বনা খোঁজে। সজীব বৃক্ষের সবাক উপস্থিতিতে আচমকা সকল বৃক্ষের শ্মশানে এক এক করে গজিয়ে ওঠা এবং মাঝরাতের আলো অন্ধকারে কথা বলতে থাকার দৃশ্যটি একটি পরাবাস্তব চিত্র। নৃপেনের গৃহ প্রাঙ্গণে সবাই বসে। আর নেপথ্যে থাকে মৃতদেহ। এসময় গুণীন বলেন :

> কাল রাইতবেলা আচানক বৃক্ষের সঙ্গে বচন হইছে আমার। বৃক্ষেরও বচন আছে যদি কেউ তা বঝে। ঘন অন্ধকারে ওই দিকের বনে মান্দাইগণের শ্মশান আর মড়া পুঁতার স্থলে নিরপেনের গর্তের ধারে। তারার আলো দেখা যায় কি যায় না। হঠাৎ দেখি নাই বৃক্ষ গজায় জনের জন। শ্মশান ভইরা উঠে বনস্থালী। জুনাক পোকার হাতের মুঠায় ভইরা সন্ধামনি ফুঁ দেয়। সারা বনে ছড়ায়ে যায় আলো। সেই আলোতে বৃক্ষ দেবতাগণের শাখা ভর্তি চোখ-নাক কান গলার শোভা দেখা যায়। আমারে কয় গুণীন। নিরপেনের মিক্র আর শ্বাস কষ্টের সুড়ঙ্গ দিয় আসছি আমরা। আর আমরা দুঃখের বৃক্ষ শোকের বৃক্ষ। তবে তোরা যতদূর যাবি উচ্ছেদ মরণ মড়ক যাব সাথে সাথে।[৫]

সেলিম আল দীন রচিত cwP¨ নাটকের কাহিনি মধ্যযুগে রচিত মনসামঙ্গল কাব্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ নাটকে নবআঙ্গিকে ঐশ্বর্যে বেহুলা-লখিন্দরের প্রণয়গাঁথা নির্মাণ করেন নাট্যকার। বলা যায়, স্বকালের প্রেক্ষাপটে তিনি পুরাণ কাহিনি পুনঃনির্মাণ করেছেন। বাংলার সর্বাধিক জনপ্রিয় একটি পুরাণকে উল্টা পুরাণে রূপান্তরিত করেছেন। cwP¨ নাটকে ঘটে বেহুলা লক্ষিন্দরের গল্পের বিপরীত চিত্র। এ নাটকে প্রধান দুই পাত্র-পাত্রী হচ্ছে সয়ফর ও নোলক। তাদের ঘিরে নাট্যকাহিনি আবর্তিত হয়েছে। নোলক সরকারের বিয়োগাত্মক প্রণয় একালের কাহিনি হয়ে উঠেছে। লোক কথার বেহুলার মতো cwP¨ নাটকের কাহিনিতে বাসর রাতে নোলক বিধবা হয় নি; বরং সদ্য বিবাহিত সয়ফর নব পরিণিতাকে হারিয়েছে। এখানে সঙ্গমরত অবস্থায় নোলককে সাপে কাটে। cwP¨ নাটক লেখার উৎসমূল ও অনুপ্রেরণার সূত্র প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> cw‡P¨i রচনাকাল ১৯৯৮ সালের জানুয়ারির মধ্যভাগ থেকে মার্চ। এ রচনার উৎসমূল একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৯৫ কি ৯৬ সালের শীতান্তে তালুকনগর যাই আজাহার বয়াতির মাঘী মেলার কাজে। যাবার দিনের প্রথম রাত্রি ভোরে শ্বশুর বাড়ির সুউচ্চ ভিটায় খড়ের পালা থেকে পালানে একটা অতিশয় দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা এর রৈখিক কর্ষিত ভূমি দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি। তাতে সে বাড়ির আশপাশের কৃষিজীবীগণ মাটি খুঁড়ে একটা বিশালকায় গোখরা সাপের নিধন পর্বের উত্তেজক বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে। এই দৃশ্যে হঠাৎ আমার মনে হল জীবনের অনিবার্য খনন কি আমরাও করে চলেছি না? এদিকে আফসার আহমদ এর কাছে ১৯৮৪-৮৫ সালে মানিকগঞ্জের জামশা অঞ্চলে বিবাহ পরবর্তী রাত্রে এক বরের ডঙ্কজনিত মৃত্যুর বাস্তব কাহিনি শুনে ভেবেছিলাম মনসা পুরাণের উল্ট দিকটা তবে কি রকম। cw‡P¨i কাহিনী [কাহিনি] সূত্রের প্রেরণা এটুকুই।[৬]

cwP¨ নাটকের কাহিনি শুরু হয়েছে নোলক সরকারের বিয়ের ঘটনা দিয়ে। প্রাকৃতিক পরিবেশ হিসেবে চিরপরিচিত বাংলা জনপদের মনোরম দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে নাটকে। ফাল্গুনের এক শেষরাতে নোলক নাক-চোখের মিলিত পানিতে স্বামী হিসেবে সয়ফরকে কবুল করে। এখানে নাট্যকার অসাধারণ কৌশলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিয়েকে কেন্দ্র করে আনন্দ উৎসব দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। এ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রান্তিক মানুষের জীবন ও সমাজ মূর্ত হয়ে ওঠে। বিয়ে বাড়ির ঘটনাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের জীবন-বাস্তবতা এখানে ফুটে উঠেছে। cwP¨ নাটকে দরিদ্র দিনমজুরের ছেলে সয়ফর অন্যদের মতো নয়। বাসর ঘরে বাস্তুসাপের ছোবলে মৃত্যুর কাছে পরাজয় ঘটে স্ত্রী নোলকের। স্বামী সয়ফর তা মেনে নিতে পারে না। নোলকের মৃত্যুতে সয়ফর অন্য পুরুষের মতো স্বল্প বিলাপের পর হয়তো অন্য কোন নোলকের মুখচিত্র মানসলোকে স্থান দিতে পারতো। কিন্তু cw‡P¨i সয়ফর সেই

বাস্তুসাপের সন্ধানে মেতে ওঠে। সারারাত্রির খনন শেষে সে ঠিকই খুঁজে বের করে সেই আততায়ী বাস্তুসাপকে। প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে ভুলিয়ে দেয় তার সব ক্লান্তি ও শোক। দীর্ঘফণা তুলে সয়ফরের সামনে দাঁড়ায় সে আততায়ী। আর পেছনে দাঁড়ানো থাকে সয়ফরের বৃদ্ধ দাদি। দাদির অনুরোধে সয়ফর ক্ষমা করে দেয় সাপটিকে। এখানে সেলিম আল দীন একজন কৃষক সন্তানকে বিশেষ ভাবনায় গড়ে তোলেন আর তা হচ্ছে ক্ষমার দর্শন। সয়ফর ও তার দাদির কথোপকথনে বিষয়টি স্পষ্ট হয় :

দাদি বলে ও সয়ফর বাবা এইটা বাস্তুসাপ। এইটারে মারিস না।

সুরুতালি বলে সয়ফর তেল ফুরায়ে আসতেছে। করবি কি। বাদ দে দাদির কথা শুন। বাস্তুসাপ যারে তারে ডংশন করে না।

সয়ফর বলে বাস্তুসাপ কি ঘরের বউ খায়। ওই শালা। চোপ॥ সে খুঁড়তে থাকে॥

দাদি কাঁদে ও সয়ফর আল্লায় যারে নেয় তারে নেয়। সাপ ত উছিলা বাপধন।

কিন্তু সয়ফর খুড়তে থাকে। প্রচণ্ড বেগে। অদূরে সপ্তর্পণে চোখ রাখে। অন্ধকারে খুঁড়ে দেয়া খড়ে হালকা স্বর্ণ আভা। সে নিশ্চিন্ত হয় যে পলায়িত সাপটি অন্তত ওদিক দিয়া বাহির হতে পারবে না। সে থামে। সহসা সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।[৭]

সেলিম আল দীন বাংলা নাট্যরীতির বর্ণনাত্মক ধারায় লিখেছেন cwP¨। এ নাটকে তিনি উপহার দিলেন বাঙালির লোকায়ত জীবন। একজন কৃষকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের গল্প নাটকে মূল্য হয়েছে। এই কৃষক হাজার বছর আগের একজন কৃষক হতে পারেন। কিন্তু এই যে, লোকবিশ্বাসগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার মধ্যে দিয়ে একজন জীবন্ত মানুষকে খুঁজে পাই, যার জীবনে সাপও একটি অনিবার্য প্রাণি বা অনুষঙ্গ। এই ভাবনাগুলো অবশ্য এদেশের থিয়েটারে সেলিম আল দীন যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত cwP¨ নাটকের স্যুভেনিয়রে মুদ্রিত নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফের কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

নাটকের মূল চরিত্র সয়ফর চান। কোন এক ভাসান পালার আসরে দেখা দর্শক সারিতে বসা নোলক নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে গেছে সে দূরগ্রাম কাজলাকান্দায়। নাটকের শুরু কনে বাড়িতে। তারপর কনেসহ বরযাত্রীদের ফিরতি যাত্রা। এই ফিরতি পথের বর্ণনাংশই নাটকে দীর্ঘতম। এই বর্ণনা সহজ ও সরল হওয়াই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু নাটকটি সেলিম আল দীনের। তাই পথে পথে বর সয়ফরের স্মৃতি ও কল্পনাকে অবলম্বন করে তা তার বিক্ষুব্ধ জীবনপথের এবড়ো-থেবড়ো পথরেখায় পরিণত হয়। সেলিম আল দীনের নাটক 'প্রাচ্য'র দর্শন হলো প্রাচ্য জনপদের হাজার বছরের জীবন দর্শনের একটি প্রতিফলন। বিষয়টিকে আমি এভাবেই দেখেছি। কিন্তু সেলিম

> সৃষ্ট উপাখ্যানটি নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ক্ষমার শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতেই হয়তো সেলিম এ রকম একটি মর্মান্তিক গল্পের আশ্রয় নিয়েছে।[৮]

cwP¨ নাটকে লেখক কাহিনির অন্তরালে প্রাচ্য দেশীয় মনোরম এক মানবীয় দর্শনকে তুলে ধরেন আর তা হচ্ছে ক্ষমার দর্শন। আমাদের বৃহত্তর লোক সমাজে বৌদ্ধদর্শনজাত 'সর্বপ্রাণবাদ' এর যে প্রভাব আছে, সেই প্রভাবের ফলেই সয়ফর সাপটিকে ক্ষমা করে। এই নাটকের আখ্যানের কথক নাট্যকার নিজেই। সুতরাং তাঁর জীবনদর্শনই প্রতিফলিত হয়েছে cwP¨ নাটকে। সম্ভবত বৌদ্ধজাতকের প্রভাব পড়ে থাকবে লেখকের মননে। বৌদ্ধ দর্শনে উদার মানবিকতা ও সর্বপ্রাণবাদী ধারণা তথা জীবকে বধ না করার ধারণা এখানে বিদ্যমান। 'ক্ষমা পরম ধর্ম'– এই প্রাচ্য দর্শনও যেন নাটকের বিষয় রূপে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সেলিম আল দীনের এক একটি নাটক তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে; তার ওপর কল্পনার মায়াজালে ছড়িয়ে দিয়ে তবে নির্মাণ করেন তাঁর নাট্যপ্রতিমা। প্রচুর পরিশ্রমে উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং দীর্ঘকালব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকেই রচিত হয়েছে তাঁর এক একটি নাটক। cwP¨ নাটকের বাস্তব প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে তাঁর সহধর্মিনীর বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> আমাদের গ্রামের বাড়িতে (মানিকগঞ্জের তালুকনগরে) একবার ইঁদুরের গর্তের সুড়ঙ্গ দিয়ে পলায়মান একটি সাপটি অনেক দূর অবধি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে তবেই নাগাল পেয়েছিল সবাই। এ দৃশ্যটিরই প্রত্যক্ষ ছায়া দেখি অতিসাম্প্রতিক নাটক cw‡P¨। কী আক্রোশ সয়ফরচানের, যে তার একমাত্র সম্বল সামান্যতম শেষ জমিটুকু বন্ধক রেখে বিয়ে করে। ভাবে ফুলের আঁচরটিও লাগতে দেবে না ফুলেল বউটির গায়ে। দিনমজুরি করে সব বায়না পূরণ করবে তার। সব দুঃখ দূর করবে। পায়ে কাঁটাটি বিধলে দাঁতে কামড়ে তুলে দেবে সে। এমনি প্রচ্ছন্ন আবেগ লালন করে সে বুকের ভেতর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বাস্তবে রূপ পায় না।[৯]

সেলিম আল দীন নাটকের বক্তব্যে খুঁজে পাওয়া যায় বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য। পৌরাণিক লখিন্দরের কাহিনির মতো cwP¨ নাটকেও খল চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বিষাক্ত সাপ। তবে gbmwg½j এর কাহিনির মতো এ সাপ অশুভ দেবী নয়, এখানে সাপের প্রতীকে নাট্যকার অশুভ শক্তিকে প্রতিস্থাপন করেছেন। এ নাটকে গল্প তাই খুব সরলও নয়, আবার খুব জটিলও নয়। জিতু মাতব্বর চরিত্রটি না আসা পর্যন্ত খুব সরলভাবেই দেখা যায় গল্পটিকে। কিন্তু এই একটি চরিত্রই পাল্টে দেয় কাহিনিকে। উঠে আসে একজন সংগ্রামী অথচ শোষিত মানুষ সয়ফরের সংগ্রাম। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে

পিষ্ট সয়ফর নিরন্তর প্রচেষ্টার পরও কিভাবে আটকা পড়ে জিতু মাতব্বরদের বিছানো জালে cwP¨ নাটকে সে দিকটিও খুঁজে পাওয়া যায়। সয়ফর জিতু মহাজনের সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে সে তার জমি গরু কেড়ে নেয়। মারা যাবার সময় জিতু মাতব্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে সয়ফর ফেরত পায় দশ ডিসিম জায়গা আর গাই গরুটা। কিন্তু জিতু মাতব্বরের মৃত্যুই শোষণের শেষ নয়, সয়ফরদের মুক্তি নয়। অনুরূপ জিতু মাতব্বরের পীড়নপীরিত সয়ফরের চোখের ওপর তারই স্থলাভিষিক্ত মাতব্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র আইজল মূর্তিমান অত্যাচারী রূপে আবির্ভূত হয়। অভিন্ন কৌশলে নির্যাতিতের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, একে একে বিনষ্ট করে তার সুখস্বপ্ন। আবহমান বাংলার সামাজিক চালচিত্র নাট্যকার ভিন্ন অর্থব্যঞ্জনায় তুলে ধরেন :

> জিতু মাতব্বর ক্ষীণ কণ্ঠে বলো– বেবাক মাতব্বর যা করে আমিও তাই করছি। জমি থাকলেই কেনা বেচা থাকে সয়ফর। আমি যাইতাছি। যে দশ ডিসিম জায়গা গাইগরু এই বছর কাইড়া নিছিলাম বেবাক ফিরত দিলাম। আমার পোলা আইজল থাকল। তুইত বছর ঘুরতে আবার জমি বেচবি তয় ঐ দশ ডিসিম তুই আইজলের কাছেই বেচিস। মাফ করলি ত বাবা। জিতু মাতব্বরের স্থলে দাঁড়ায় তার মধ্যবয়সী পুত্র আইজল। এক বিলাই সুঙসুঙির লতা বীজ থেকে যেমত রোমশ বীজের শিম আইজল ঠিক সেখানে দাঁড়ায় এবং লতা বিস্তার করে।[১০]

উপর্যুক্ত বক্তব্যে স্পষ্টতই সয়ফরের ভিটে মাটি খুঁড়ে সাপের খোঁজ করার সংগ্রাম আর ব্যক্তিগত থাকে না, হয়ে ওঠে সামষ্টিক চেতনাবাহী। সয়ফর শেষপর্যন্ত হন্তারক সাপের মুখোমুখি হয়ে সাপকে হত্যা করতে পারে না। সে ভুলে যায় এই সাপটিই তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। সয়ফরের তখন মনে পড়ে দাদির নিষেধ বাস্তুসাপ মারতে নেই। দাদির নিষেধ নিঃসন্দেহে সামাজিক সংস্কার; ফলে নাটকের পরিণতি দাঁড়ায় প্রান্তিক জনমানুষের এ ধরনের সংস্কারের কারণে আইজলের মতো সামাজিক শোষকেরা বেঁচে যায়। শোষকের প্রতিনিধি আইজল যেন সাপ হয়ে, প্রকৃতির সৌন্দর্য, হিংস্রতা ও স্বাভাবিকতার অধিকারে আপন বিবরে চলে যায়। সয়ফর তার স্ত্রীর হত্যাকারী সাপটিকে হাতের নাগালে পেয়ে প্রতিশোধ নিতে পারে না, এটিই প্রকৃত বাস্তবতা যে শোষণকারীর ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত সয়ফরের মতো প্রান্তিক মানুষ কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে না। এভাবেই বাংলার জনপদের প্রান্তিক তথা ভূমিহীন নিম্নবিত্তের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতি ইত্যাদি শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনবাস্তব তুলে এনেছেন নাট্যকার। cwP¨ নাটকে অভিব্যক্ত ক্ষমার দর্শন স্পষ্টত দৃশ্যমান। আর সামাজিক শোষণমূলক শ্রেণিগত অবস্থান নির্ণয় নাটকের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্য বাস্তুসাপটিকে ক্ষমা করার প্রসঙ্গকে তুলে ধরে

বলেছেন যে, cwP¨ একটি রূপক নাটক। 'মৌল বিষয়ের অতিরিক্ত বোধের দিক থেকে, রূপকার্থে এ নাটক স্বাধীনতা উত্তরকালের এক ঘোর সামাজিক রাজনৈতিক ক্রান্তি লগ্নে পরাজিত শক্তির দোসর দেশীয় বিশ্বাস ঘাতকদের প্রতি বিতর্কিত ঔদার্য প্রদর্শনের ঘটনায় তাৎপর্যময়।'[১১]

প্রতিভাবান লেখক সেলিম আল দীন। cwP¨ নাটকে তিনি ধারণ করেছে আবহমানকাল ধরে বহমান বাংলার প্রান্তিক মানুষের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস। নাট্যকারের চেতনায় অন্তঃসলিলে আছে প্রাচ্যদেশীয় সংস্কার বিশ্বাস। cwP¨ নাটকের উৎসর্গপত্রে নাট্যকারের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> cwP¨ পিতৃপ্রতিম অরুণ সেনের নামে উৎসর্গকৃত হল এই জন্য যে– তিনিই প্রথম প্রাচ্য পাথের স্বপ্নদ্রষ্টা নন্দনকার। এই উৎসর্গ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাঁর সম্মাননা স্মারক। প্রাচ্য পিতৃপ্রতিম অরুণ সেনের নামে উৎসর্গীকৃত হল এজন্য যে, সমকালের বাঙলা সাহিত্যের নবতর বাঁককে তিনিই তাঁর নন্দনশঙ্খ ফুৎকারে আবাহন করেছেন।[১২]

সেলিম আল দীন রচিত একটি gvigv i¦cK_v নাটকটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মিথনির্ভর রচনা। মারমা সম্প্রদায়ের একটি প্রচলিত রূপকথা 'মনরিমাংৎসুমুই'কে ভিত্তি করে আধুনিক লোকজ উপাদানে ভরপুর এক গবেষণাধর্মী নাটক GKwU gvigv i¦cK_v। এ নাটকে নৃ-তাত্ত্বিক জন-সমাজের কথা তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এ নাট্যকাহিনির মূল বিষয় হচ্ছে জন্মান্তরবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের দ্বন্দ্ব সেই সঙ্গে আছে রূপান্তরবাদের প্রসঙ্গ। নাটকটি মারমা সমাজে প্রচলিত মনোহরী রূপকথা 'মনরিমাংৎসুমুই'-এর আধুনিক রূপায়ণ। নাট্যকাহিনিতে লক্ষ করা যায়, স্বর্গরাজা ডোমারায়ের স্বর্গলোকের ঢোল ভেসে আসে লোকালয়ে। তাই স্বর্গরাজ ডোমারায়ের কৃপালাভের জন্য মনরিমাংৎসুমুইর প্রেমের কাহিনি পরিবেশন করা হয়। এই প্রণয়কাহিনি নিয়ে GKwU gvigv i¦cK_v নাটক। ডোমারায়ের একই চেহারার সাতটি কন্যা রয়েছে। স্বর্গকন্যাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে নাটকে আছে :

স্বর্গরাজ ডোমরা রায়।
ডোমারায়ের সাতটি মেয়ে॥
সাতটি মেয়ে জ্যোৎস্না ধোয়া।
বুনো ফুলের গন্ধমাখা।
গন্ধমাখা সাতটি মেয়ে।
মুখের গড়ন একই ছাঁদের॥
থুং এর আড়াল থেকে যখন

জ্যোৎস্না উঠত সন্ধ্যাবেলা
স্বর্গহ্রদে পড়ত আলো
ঢেউ এর চোখে স্বপ্ন জাগর
সাতটি বোনের সবার ছোট।
মনরি মাংৎসুমি।[১৩]

একদিন স্বর্গকন্যারা চিং চিং এর মাধ্যমে জানতে পারে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে। মর্ত্যলোকের ফুল, রোদ, হ্রদের পানি, পানিতে মাছের খেলা প্রভৃতির সংবাদ পেয়ে সেখানকার হ্রদে অবগাহনের নিমিত্তে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সপ্তকন্যা সমবেতভাবে মর্ত্যে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে পিতার কাছে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর শেষপর্যন্ত কন্যাদের ব্যাকুল আবেদন তিনি ফেলতে পারেন না। ডোমারায় তাদের শর্ত দেন যে, কঠিন চীবর দানের মতো করে তোমরা সাত বোনে মিলে একরাতের মধ্যে কার্পাস চয়নপূর্বক সাতটি গেরুয়া পোশাক বুনে দাও। এই কাজটি করতে পারলে ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন। পিতার উপদেশ অনুসারে তারা এক রাতেই কার্পাস চয়ন করে, বস্ত্র বয়ন করে সাতটি পোশাক তৈরি করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য। বোনা কাপড়গুলো তারা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। তাই রাজা শেষপর্যন্ত ওদের মর্ত্যলোকে যাবার অনুমতি দেন। নাট্যকার এখানে নৃগোষ্ঠীর বিশ্বাস-সংস্কার কৃত্যের অনুপম চিত্র তুলে ধরেন। সপ্তকন্যা পৃথিবীর হ্রদে ডুব সাঁতারের আনন্দে প্রতি সন্ধ্যায় উড়ে আসে। সেলিম আল দীনের GKwU gvigv i¦cK_v নাটকে বান্দরবানের পার্বত্যভূমির নৈসর্গিক সৌন্দর্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। ঝরনার স্বচ্ছ জলে পার্বত্য নারীদের আমোদিত চিত্তের জলক্রীড়া সূর্যের সোনালি আলোয় চলমান জীবনের চিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে। স্নানরত রাজকন্যারা বলছে :

> কি অবাক। এই কাইন, ঐ পাহাড়। আমেগ্রি দেখ সূর্যের আলো পড়ে ঢেউ এর ঠোঁটগুলো কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে।
>
> একথার সঙ্গে সকলের উচ্ছ্বসিত হাসি মিশে যায়। এক বোন আবিষ্কারের আনন্দে কল কল করে চিং যে বলেছিল রোদ আর হ্রদের গল্প ভরা চোখে চেয়ে দেখ দিদি ঠিক ঠিক মিলে গেছে।
>
> ওমা দেখ দেখ পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে ঝর্না। বুনো হাতির দল শুঁড়ে পানি তুলে শূন্যে ছিটা ঐ ঐ যে। বোনেরা হেসে ওঠে। বৃত্তাকারে সাঁতারের স্থান বদল। কিসের যেন গন্ধ পাই- আমেগ্রি। ঐ যে শাদা বেগুনী জিরামতী ফুল লতার গিঁটে গিঁটে ফুটে আছে। মনরির চোখের পাতা জোড়া লেগে যায় ফুলের গন্ধে। সে দিদিকে বলে।

> আমেগ্রি স্নানের আগে আমার কেমন ঘুম পেয়ে যায়। আমি যদি আর ঐ স্বর্গলোকে ফিরে না যাই। একথা শুনে বোনেরা শিউরে উঠে।[১৪]

একদিন এক শিকারি অবগাহনরত স্বর্গকন্যাদের দেখে পরী পরী বলে চিৎকার করে ওঠে। এরপর সে তাদের ধরার চেষ্টা করে। শিকারি নাগরাজ থেকে পাওয়া বিষের তৈরি বিশেষ জাল সংগ্রহ করে এবং সেই জালে আটকে ফেলে এক পরীকন্যাকে। সে কনিষ্ঠ রাজকুমারী মনরি। ঘটনাক্রমে শিকারী মনরির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় সে দেশের রাজ পুত্রের অর্থাৎ মারমা রাজকুমার সাথানুর। সাথানুর সঙ্গে প্রথম বারের মত বিবাহ হয় মনরির। এ প্রসঙ্গে নাটকে বর্ণিত হয়েছে :

> সাথানুর মর্ত্যগৃহে স্বর্গনারী মনরির দাম্পত্য জীবন শুরু হলো। দর্শকমণ্ডলী জন্মান্তরের গল্প সংবলিত এই পালায় এমত আছে যে,- এই জন্মের পূর্বেও সাথানু এবং মনরি একসাথে ঘর পেতেছিল। আর ঐ যে শিকারী সে ছিল তাদের দাস। যাক সে কথা। বিবাহের পরই মনরি স্বর্গ থেকে বহন করে আনা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু করল রাজপ্রাসাদে। আর তাতেই চতুর্বেদী পুরোহিতগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তাদের পূজা-অর্চনার প্রভাব হলো খর্ব। কিভাবে মনরির সর্বনাশ করা যায় অতঃপর- সেই মন্ত্রণায় লিপ্ত হলো তারা।[১৫]

ইতোমধ্যে সাথানু পাশ্ববর্তী দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায়। এদিকে ব্রাহ্মণেরা রাজপুরীতে মনরির আগমনে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য দেখে গভীর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজা একদিন এক স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সে স্বপ্ন খণ্ডনের বিধান ব্যাখ্যা দিয়ে এমন মতামত দিয়েছেন যে, সাথানুর কল্যাণের জন্য মনরিকে মন্দিরে বলি দিতে হবে। এ সংবাদ জানতে পেরে স্বর্গকন্যা মনরি নিজের প্রাণ রক্ষা করতে শিশু পুত্রকে ফেলে স্বর্গে চলে যায়। সে গহিন অরণ্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে রেখে যায় একটি অঙ্গুরি। যুদ্ধ শেষে সাথানু দেশে প্রত্যাবর্তন করে এ ঘটনা জানতে পেরে গৃহত্যাগ করে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। এসময় সন্ন্যাসীর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে নিজেকে মারমা যুবরাজ পরিচয় দিলে ঋষি তাকে মনরির রেখে যাওয়া অলৌকিক অঙ্গুরিটি প্রদান করেন। এরপর স্ত্রীর সন্ধানে স্বর্গে যান। মনরির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে সাথানুর। কিন্তু বাঁধসাধেন তার পিতা। সাথানুর সঙ্গে তিনি কন্যাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠাবেন না। তবে মর্ত্যলোকে রেখে আসা সন্তানের জন্য মনরির ব্যাকুলতায় ডোমারায় শেষপর্যন্ত রাজি হন। কিন্তু তাকে নিতে হলে স্বর্গশাস্ত্র অনুসারে আর একবার বিবাহ করতে হবে। আর এই বিবাহ সম্ভব যদি সে ডোমারায়ের দেওয়া কঠিন পরীক্ষাগুলোয় উত্তীর্ণ হতে পারে। স্বর্গরাজার দেওয়া চারটি কঠিন শর্ত হলো– (ক) ভয়ংকর জন্তু বোলের সঙ্গে সাথানুর লড়াই; (খ) রাজার বীরবাহু মন্ত্রীকে দ্বৈতরণে পরাস্ত করা; (গ) সাত কন্যার আড়াল থেকে আঙুল

প্রদর্শনে মনরির আঙুল চিহ্নিত করণ; (ঘ) আকাশে স্বপ্তকন্যার ময়ূর নাচের সময় তীর ছুড়ে মনরির অঞ্চলের প্রান্তভাগ মাত্র বিদ্ধ করতে হবে। সাথানু মনরির সহযোগিতায় সবগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহ ক্ষেত্রে ডোমারায় বাকী ছ'কন্যাসহ জামাতা ও মনরিকে রেখে আসেন মর্ত্যলোকে। পৃথিবীতে তখন প্রায় শতবর্ষ কেটে গেছে। মনরির রেখে যাওয়া সেই শিশুপুত্র এখন বৃদ্ধ। কিন্তু বুদ্ধের কৃপায় সব পূর্বকাল ফিরে আসে সুখকর বর্তমানে। শিকারী টের পায় পূর্বজন্মে সে ছিল সাথানু মনরির দাস। এখানে উল্লেখ্য যে, সাথানু মনরি পালায় শুরুতেই বলা হয় তারা ছিল প্রথম জন্মে এক জোড়া কপোত-কপোতি। গহিন অরণ্যে দাবানলে তাদের সন্তান পুড়ে গেলে এই কপোত-দম্পতি শোকাহত চিত্তে আত্মাহুতি দেয়। আর পরের জন্মে তারাই হলো সাথানু ও মনরি। বাংলাদেশে বাঙালিরা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বসবাস। দীর্ঘদিন ধরে তারা অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি রাজনৈতিক নিপীড়নেরও শিকার হচ্ছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারার বৈশিষ্ট্যতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জাতিগত মিথ সংরক্ষণ করাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। GKwU gvigv i¦cK_v নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার সেই দায়বোধের কথাই বলেছেন :

> GKwU gvigv i¦cK_v নির্বাচনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া এবং অন্যদিকে এর মাধ্যমে মারমা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত করা। বক্ষ্যমান প্রয়াস হয়তোবা জাতিগত সহমর্মিতার এক সূচনামুখী পথ উন্মোচন করতে সক্ষম। রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা অর্থনৈতিক নিপীড়নের যে দায় শতবর্ষের তার খানিকটা অন্তত বহন করুণ আমাদের কালের শিল্প।[১৬]

সেলিম আল দীনের 'ঢাকা থিয়েটার' ১৯৮৬ সালে আয়োজন করে জাতীয় নাট্যমেলার। এ মেলার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের উপকথা, রূপকথা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা। এছাড়া বিভিন্ন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সাধন এর লক্ষ্য ছিল। আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে রক্ষার প্রয়াস চালানোও এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। ঢাকা থিয়েটার পরবর্তীতে GKwU gvigv i¦cK_v নাটকটি মঞ্চস্থ করে এ সম্পর্কে নির্দেশকের বক্তব্য ছিল :

> রূপকথা হলেও এর মধ্যে মারমাদের ধর্ম সংস্কার এবং জাতিগত সংস্কার ও প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের ধারণা আধুনিককালের শিল্পমনস্কতায় কৃত্য নাটকের দিকে ফিরে তাকানো যেতে পারে। GKwU gvigv i¦cK_v‡K আমরা কৃত্যনাটকের আবরণে মঞ্চরূপ দিতে চেয়েছি।[১৭]

বাংলাদেশের প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর ছবি নাটকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সেলিম আল দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ^heZx Kb¨vi gb নাটকে রাখাইন, PvKvq সাঁওতাল এবং †KivgZg½j নাটকে হাজং ও গারো উপজাতির কিছু খণ্ডচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এসব নাটক থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি ও সংগ্রাম নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক নাট্যকারই নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার মামুনুর রশীদ সাঁওতালদের নিয়ে রচনা করেছেন ivpv0। হাজার বছরের সাঁওতাল জনপদের সংগ্রাম ও স্বপ্ন, আশা ও আনন্দ, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন, জীবন জীবিকার এক নিখুঁত চিত্র ivpv0 নাটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের একটি বৃহৎ আদিবাসী সাঁওতাল; যারা মূলত এদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বাসবাস করে আসছে। রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা প্রভৃতি জেলায় সাঁওতালদের বাস।

সেলিম আল দীনের wbg¾b নাটকটি বিশ্ব গণহত্যার প্রেক্ষাপটে রচিত। নাট্যকার 'রবীন্দ্র মহাভুবনের উদ্দেশ্যে' নিবেদন করে wbg¾b উপাখ্যান প্রকাশ করেন। তবে তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকের মত আলোচ্য নাটকের কোনো 'কথাপুচ্ছ' কিংবা 'কথামুখ' সংযোজিত করেন নি। বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁর i³Kiex নাটকের গূঢ়ার্থ ভেঙে বলতে চান নি, তেমনি সেলিম আল দীন wbg¾b নাটকের গূঢ়ার্থও তিনি ভেঙে বলেন নি; যা আছে নাটকের শরীরে লুকিয়ে। তবে অসংখ্য হত্যা গণহত্যায় wbg¾b এর পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে মৃত্যুপুরাণ। wbg¾b নাটকের বিষয় সম্পর্কে নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> খ্রিষ্টীয় ২০০০ অব্দের মধ্যে জানুয়ারিতে কোনো এক সন্ধ্যায় শিল্প সংশ্লিষ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে সেলিম আল দীনকে আমি গল্প-বিহীন একটি নাটক লেখার জন্য প্রস্তাব করি। ক্ষণিক পরে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে সেলিম বলেন– কখনও এমন ভাবিনি, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। খুব সম্ভব তখন থেকেই গল্প ছাড়া নাটক আমার এই অভাবিত প্রস্তাবটি সেলিমের মনে উন্মুখর এক সৃষ্টি উন্মাদন সৃজন সম হয়েছিল। হয়তো তারই ফসল এই wbg¾b যা খ্রিষ্টীয় ২০০০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে লেখা হয়ে যায়। তাকে মুদ্রিত আকারে হাতে পেতে লেগে যায় আরও দু'বছর। কিন্তু তখন থেকে অর্থাৎ বিগত ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ের দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা ধর্মীয় জঙ্গীবাদের উত্থান উদীচী, ছায়ানট, ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় ভয়াবহ বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং টুইন টাওয়ার আক্রমণ, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, কসভো, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও আফগানিস্তানের সৃষ্ট রক্তাক্ত অধ্যায় যা অনেকের মতো আমাকেও সমান বিচলিত করেছে। বিশেষ করে ছায়ানট এবং আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় রাস্তার উপরে

> নিহত নিরীহ মানুষের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার চোখের ক্যানভাসে এক নতুন গোয়ের্নিকার এঁকে দেয়। এ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় নিজের ভেতর থেকেই নিমজ্জনের অর্থ, সাবটেক্সট এবং দৃশ্য রূপের সন্ধান পাওয়া গেল শেষাবধি।[১৮]

wbg¾b নাটকে মোটা দাগে কোনো গল্প নেই; কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে সোনামুখী সুইয়ের সূত্রে আরেকটি অন্তর্লীন গল্পের বিস্তার দেখা যায়। কলেজের এক অধ্যাপক এবং তাঁর বন্ধু নানা প্রসঙ্গে একের পর এক হত্যা, ধর্ষণ, কারফিউ, নিপীড়ন, যুদ্ধের বীভৎসতার যোগাযোগ গেঁথে গেঁথে একটি কাঠামো দাঁড় করায় তবে তাদের নাম জানানো হয় নি। wbg¾b নাটকে সেলিম আল দীন বিশ্ব ইতিহাসের নিষ্ঠুর পথ ঘুরে মানবিক বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণহত্যাকে উপস্থাপন করেছেন সভ্যতার চলমান অহমিকার সামনে। wbg¾b নাটকে গণহত্যার ঘটনা নাট্যকার আদিবাসীদের বিশ্বাস সংস্কারের সমান্তরালে তুলে ধরেছেন। মারমা সম্প্রদায়ের কঠিন চীবরদানের অনুষ্ঠানে কুমারীদের করণীয় প্রসঙ্গের সঙ্গে সমান তালে নাট্যকার বুনে চলেন হত্যার নির্মমতা। কঠিন চীবরদানের নিমিত্তে মারমা কুমারীদের কার্পাস চয়ন থেকে শুরু করে সুতা তৈরি, রঙ মেশানো, হাতে চালানো তাঁতের মাকু টানা, বসনবোনা এবং সবশেষে বসনটি ক্যাঙে পুরোহিতের হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত সকল কিছুই তাদেরকে সম্ভব করতে হয় একটি রাতের মধ্যেই, ভোরে বনমোরগের ডাক ফুটবার আগে। তবেই কেবল সে বসন কঠিন চীবরদানে কোনো শ্রমনের গায়ে উঠতে পারে। যে বসন মারম কুমারীরা তাঁদের অতীত বস্ত্র বুনন অভিজ্ঞতায় এক রাত্রির সমগ্র নিষ্ঠা, ধ্যান ও কর্ম প্রচেষ্টায় সৃজন করবে। তার তা কঠিন চীবরদানের কৃত্যের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কোনো সিদ্ধাচার্যের গায়ে তুলে দিতে চায়, ঠিক তার সমান্তরালে সেলিম আল দীন তাঁর এই নাটকে শহরে আসা আগন্তুকের বিশ্ব ভ্রমণের ক্ষমাহীন অভিজ্ঞতা বর্ণনার কথাবুননকে সম্মুখ বাস্তবতার বসন বা পোশাক হিসেবে মিলিয়ে এক আখ্যান রচনা করেছেন। আখ্যান বর্ণনার প্রধানতম আশ্রয় হচ্ছেন– শহরে রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপককে দেখতে আসা অগন্তুক। যার রয়েছে সাধারণ রেডক্রসকর্মী, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে ধর্ষণ-হত্যা-এইডস কিংবা ম্যাডকাউডিজিজ দেখবার অভিজ্ঞতা। এই উপাখ্যানে তার সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে শহর নিমজ্জিত হবার ঠিক আগের কয়েকদিনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে প্রায় সহস্রাব্দের আরো বহু ইতিহাস ও মিথের ঘটনাকে সমান্তরালে আনা হয়েছে। পৃথিবীর তাবৎ হত্যা-ধর্ষণ আর অমানবিকতার কথামালার হাহাকার গুঞ্জরণ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হত্যাকীর্তি পেরিয়ে ফ্রাঙ্কো, মিলেসোভিচ এমন কি হালের বুশের হত্যাকীর্তি, খেলার উন্মাদনা,

বহুজাতিক কোম্পানির ফ্যাশন শো ক্যাটওয়াক ও কম্পিউটার আধুনিকতার যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত wbg¾b এর এই আখ্যান। wbg¾b এর আখ্যান শুরু হয়েছে একটি সূচনাগীত দিয়ে এরপর মঙ্গলচরণ। এতে বন্দরে আসা এবং রুগ্নবর্ণ-স্টিমারের ঘটে যাওয়া গণহত্যার ছোট একটি বিবরণ এর গণহত্যাকারীদের প্রতি প্রথমত অভিজ্ঞতা উচ্চারিত হয়েছে এবং এই আশ্চর্য নিমজ্জনের সাক্ষীদের এক একজনকে এই wbg¾‡bi কাহিনিটি আরো সাত সাতজনকে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

> গণহত্যাকারীদের ক্ষমা নাই বাতাসে মৃত্যুচাবুক শব্দ। আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ। খুব দ্রুত দাঁতে নুন কামড়ে নিয়ে আসছে সাগর তারপর সেই ছায়া স্টিমার থেকে দেবদূতদের সমবেত স্বর জোয়ারে জোয়ারে অমাবস্যার ষোলোকলা ফলাবে শশী। আর এরা পালাতে চেয়েছিল। এ শহর থেকে যেনবা আকাশ উল্টে দিয়ে নিজেদের নাম লিখে দেবে। এরা নিরস্ত্র মানুষের হত্যাকারী। যে এই আশ্চর্য নিমজ্জনের সাক্ষী সে যেন অন্য সাতজনকে বলে সেই অন্য সাত জন আরও উনপঞ্চাশ জনকে বলবে। সেই উনপঞ্চাশ জনের প্রত্যেকে আরও সাত জনকে বলুক এবং পৃথিবীর তাবৎ গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই নিমজ্জনের কাহিনী প্রত্যেক শ্রবণকারী অশ্রুত অন্য একজনকে পাঠপূর্বক তদীয় শ্রবণভূমিতে রোপণ করুক। যে সকল কবি ও চিত্রী এই উপাখ্যান পাঠ অথবা দর্শন করেন তাঁরা গণহত্যা বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী ও চিত্র রঙে সুরে ও কথায় চাষ করুন।[১৯]

wbg¾b উপাখ্যানের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় পর্বে আশীর্বাদ উচ্চারিত হয়েছে। এতে আয়ু দীর্ঘতর হবার প্রার্থনা করা হয়েছে– বিশাল বন্দরে সেই ভয়ংকর স্টিমার হত্যাকারীদের সাক্ষী আগন্তুক ব্যক্তিটির প্রতি এবং একই সঙ্গে যে অন্য দুইজন ছায়ানারী ও শিশুসহ নূহের প্লাবনকালের খড়কুটা কামড়ে ধরে স্থলভূমিতে পৌঁছেছিল তাদের প্রতি। 'তদন্তর জাতিসংঘ বিষয়ে শ্লোকে' নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণকালে কফি আনানের বক্তৃতার দম নেবার ফাঁকগুলিতে রামাল্লায় গুলিবিদ্ধ শিশু ও তুতসি কিশোরদের শুকিয়ে যাওয়াও একটা অনামা লাশের গায়ে রেডক্রসকর্মী নম্বর এঁটে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা মুখ্য হয়েছে। জীর্ণপথে মলিভূষণ রেলগাড়িটি যখন শহরে প্রবেশ করে তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। এই রেলগাড়ির কামরায় বন্ধুর চিঠির পংক্তি বহনকারী এক আগন্তুকের কামরায় স্থান নেওয়া ভুল ট্রেনে ওঠা অদ্ভুত দর্শন কাঠের পাওয়ালা ভিখারিকে দেখে মুহূর্তের মধ্যে তাকে সুদানিজ, চেচনিয়ান, উগান্ডা কিংবা মোজাম্বিক সীমান্তে ভূমি মাইন বিস্ফোরণে পা হারানোর কোনো মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার কাহিনি সূত্র ধরে আগন্তুকটিকে বিশ্ব বিহারের যাত্রী হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ নাটকীয়ভাবে ভিখারিটিকে আগন্তুক অন্য এক প্রতীকে স্থাপন করে– 'সে কি তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত আদ্দিস আবাবা থেকে ট্রেনে চেপে বসা হতভাগ্য এক ইথিতপিয়ান * যে কিনা হারারে পালিয়ে গিয়ে

হায়েনার খাবার হবে'।[২০] তারপর ইথিওপিয়ার 'হায়না ও দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষ্য মাংস ভক্ষণ' পর্বে আগন্তুকের বন্ধু মলুগেটার মুখে শোনা ইথিওপিয়ার এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের মাঝে ওলদিমেরিনা নামক এক ব্যক্তির হায়েনা পোষার শখের সঙ্গে হায়েনাকে দিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত খেতে না পাওয়া মানুষ খাওয়ানোর বর্ণনা এবং মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষতত্ত্ব উচ্চারিত হয়েছে :

> শস্যহীনতা* খরা ভূমি ও আকাশজাত। কিন্তু দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা মানুষ* শুধুই মানুষ। ... দুর্ভিক্ষ শেষ অবধি মানুষেরই একটা না একটা বিকৃতি থাকে। সেও ছিল সেই রকম। দুর্ভিক্ষের চেহারাটা গণহত্যার মুখের মতোই। তবে তা আরও ধীর শান্ত। কিন্তু নির্মমতায় সমান সমান।[২১]

'wbg¾b নাটকে বিশ্বরাষ্ট্র সমূহের মানবতা বিবর্জিত নির্মম গণহত্যার জীবন্তদৃশ্য'[২২] উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, wbg¾b নাটকের আগন্তুক এবং তার বন্ধু দ্বৈতাদ্বৈতের সাধারণ নিয়মে অভিন্ন ব্যক্তি। বিশ্বদর্শী সত্তা দৈশিক পীড়ন-নিপীড়ন এবং অত্যাচারী মানবতাবাদের বিরোধী অপশক্তির ঘৃণ্য অপতৎপরতার ভয়ংকর চিত্র বিশ্বব্যাপী গণহত্যাচিত্রের অভিন্ন ক্যানভাসে এঁকেছে। আগন্তুক চরিত্রের আচরণে অনন্য কৌশলে রচয়িতা উল্লিখিত বিশ্বদর্শী সত্তাকে আখ্যানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বন্ধুর অন্তিম শয্যার পাশে উপস্থিত করেন অর্থাৎ বাহিরকে ঘরে নিয়ে আসেন সত্তার কাছে। উক্ত কৌশলের আশ্রয়েই লেখক গোটা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের গণহত্যার চিত্র উপস্থাপন করেন। সাহিত্যের অধ্যাপক বিশ্বচারী আগন্তুকের মুখ থেকে তার মানুষের সভ্যতা সম্পর্কে ধারণাটা জানতে চায়। আগন্তুক সে কথায় তার লিমার কবিবন্ধুটির উদ্ধৃতিতে বলেন :

> সভ্যতা বলে কিছু নাই। আছে শুধু জেনোসাইড রুগন বন্ধুটি চমকে ওঠে* আর সেই সঙ্গে আমার কথাটা যোগ করা যাক। ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয় না। শুধুমাত্র গণহত্যাই পুনরাবৃত্ত হয় সাহিত্যের অধ্যাপক চমকে ওঠে একথায়* না মানে সভ্যতার ইতিহাস এতটা সংক্ষিপ্ত কি। আগন্তুক উত্তর দেয় * হয়তো একজন সাধারণ রেডক্রসকর্মী হিসেবে আমি এশিয়া* আফ্রিকা* ল্যাটিন আমেরিকা * ইউরোপজুড়ে ধর্ষণ * হত্যা * এইডস কিংবা ম্যাডকাউ ডিজিজ দেখে দেখে ধ্রুবজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।[২৩]

একবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নগ্নপদচারণায় যুদ্ধ, ফতোয়াবাজির বিশ্ব পরিস্থিতির মাঝখানে রাষ্ট্রসংঘ বা জাতিসংঘের হাস্যকর অবস্থানের প্রতি শ্লেষ ও বহুজাতিক কোম্পানীর নগ্ন প্রচারণায় বিপন্ন শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানুষের অবস্থান কোথায় তা wbg¾b এর আখ্যানে স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া এই উপাখ্যানে আরো দেখা গেছে– শোষণ, আক্রমণ, বর্ণবাদ, ধর্মীয় সহিংসতা, কৃত্যানুষ্ঠানের সূত্রে গণহত্যা এবং একদিকে স্বাধীনতাযুদ্ধ অন্যদিকে দেশদখল বা রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের সূত্রে যে

Dhaka University Institutional Repository

গণহত্যাসমূহ ঘটে বা ঘটেছে তার অমানবিক প্রভাব মানুষের স্বাভাবিক চেতনায় এবং কীর্তিমান সভ্যতার বুকে এমনই এক পরিবর্তন এনে দিতে পারে যা শেষপর্যন্ত ইতিহাসের গতিধারাকেও বদলে দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকে মন্তব্য স্মরণীয় :

> বিশ্বময় গণহত্যার ভয়াবহ রূপ মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করছে। নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ এবং নারী ও শিশুহত্যার মতো মানবতা বিরোধ কর্মকাণ্ড যখন বিশ্বময় নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিগণিত তখন সেলিম আল দীন ইঙ্গ-মার্কিন ক্ষমতাধর আদিপত্যবাদী বুর্জোয়া রাষ্ট্রসমূহের হীন ষড়যন্ত্রের অন্তর্লীন কারণ উদঘাটনপূর্বক বিশ্বময় রাষ্ট্রহীনতাকে অঙুলি নির্দেশ করলেন ﺍbg¾b নাটকে। এই সভ্যতার নিমজ্জন অর্থাৎ ধ্বংসের সমূহ সম্ভাবনা বিষয়ে নিশ্চিত হন তিনি এবং অন্যদের নিশ্চিত করেন। তাই নয় শুধু, তিনি নক্ষত্রস্পর্শী মানুষের সম্ভাবনার কথাও বলেন উক্ত নাটকে। এবং নয়া সভ্যতার সেই অমিত সম্ভাবনার দিকে সকলকে আহ্বান জানান।[২৪]

ﺍbg¾b নাটকে সেলিম আল দীনের বৈশ্বিক রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ নাটকে তিনি আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানবকল্যাণমুখী নতুন রাষ্ট্রভাবনা। ﺍbg¾b নাটকে মানব সভ্যতা বিধ্বংসী অশুভ রাষ্ট্রযন্ত্রকে মানবতার মুখোমুখি দাঁড় করালেন প্রবল ঘৃণায়। আধুনিক রাষ্ট্র কাঠমোর মানবতা বিরোধী অবস্থানের ফলে বিশ্বব্যাপী যে গণহত্যা সংঘটিত হয়, তার বিরুদ্ধে নাট্যকার ব্যক্তির মর্মবেদনা এক দার্শনিকের প্রজ্ঞায় তুলে ধরেছেন। ﺍbg¾b নাটক যেন সভ্যতার ভাঙন গড়ন, বিনাশ ও বিকাশের ক্রমাগত দ্বন্দ্বে নতুনকালের বিশ্বমানবতার নাটক। তাঁর এই গণহত্যা রোধের মৌল প্রণোদনা প্রাচ্যের অবিনাশী শিল্পভাবনা থেকে উৎসারিত। নাট্যকার সমগ্র বিশ্বে গণহত্যা বন্ধ হবে এমন প্রত্যাশা করেছেন। সারা দুনিয়া এই হত্যা ও নির্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এই ভাবনায় ﺍbg¾b নাটকের সমাপ্তি :

> হত্যা নয় হত্যা নয় নবাগতের শুভ চিৎকারে ভরে উঠুক সৌরলোক * গ্রহ গ্রহান্তর। সেইখানে সভ্যতা বৃক্ষছায়ার ভিতর নিমীলিত চোখে আরাধ্যের ভঙ্গিতে বসা। সেইখানে অন্তরতলে নিশীথের তারা কোটা অগণন। সেইখানে শুভ গ্রহলোকে মানুষের মুখগুলো হত্যাকারীর চিরায়ত রেখা মুছে ফেলে আকাশউন্মুখী হবে। চলো মানুষ চলো।
>
> চলো নতুন ভাবনাভূমিতে নব্যকালের নিশ্চিত গ্রহভূমিতে। আলোহীন উল্কাপিন্ডের গায়ে সঙ্গীতের সুর লিখে দাও রাষ্ট্রহীন দেশহীন কালহীনতার আনন্দিত সর্বমানবের মিলিত উৎসবের ভাষায়। ধূমকেতুর জ্বলন্ত পুচ্ছে ঢেলে দাও সুগন্ধের নির্যাস। চাঁদ চাষ করো। কার্পাস তুলার চাষ। সেই কার্পাসের পোশাক হোক সকল মানুষের সৌরযাত্রার বসন। চলো মানুষ।[২৫]

wbg¾b নাটকে সব অমানবিক, বীভৎস, ভয়ংকর এবং ঘৃণার্হ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাবৎ পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কর্তব্য। মানুষ সভ্য বলে আর সে অহংকার করতে পারে না, মানবিকতা মানুষের পাশবিকতায় ভূলুণ্ঠিত। নিপীড়িত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত এবং সন্ত্রাসবাদের শিকার মানুষের পক্ষে লেখকের অবস্থান সহমর্মিতায় প্রোজ্জ্বল ও সুদৃঢ়।

সেলিম আল দীন রচিত ¯Y‡evqvj নাটকটিকে নিকারীদের জীবনের কথা বলা যায়। জেলে পাড়াকে ঘিরে এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। মৎস্য শিকারীরা মাছের নেশায় ছুটে বেড়ায় বিলে-ঝিলে, খালে, নদীতে। মাছ ধরে এবং বিক্রি করে তাদের জীবন চলে। জেলে ও মাছের মধ্যে চলে লড়াই। একজন ধরতে চায় আর একজন ছুটে চলে যেতে চায়। নাট্যকার গ্রামীণ জনপদের মানুষের অর্থাৎ জেলে পাড়ার জীবন সংগ্রাম, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতি নাটকে তুলে ধরেছেন। নিকারী পাড়ার খলিশা মাঝি ও তার পুত্র তিরমন মাঝির স্বর্ণবোয়াল শিকারের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ¯Y‡evqvj নাটকের মূল বিষয়। এ নাটকে নাট্যকার পাঠককে এমন এক অভিনব আখ্যানের মুখোমুখি করেন যেখানে মানুষের সঙ্গে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে মাছ। স্বর্ণবোয়াল নাটকে সোনারঙা স্বর্ণবোয়ালকে মাছের প্রকৃত রাজা বলা হয়েছে এবং বোয়ালকে মীনরাজ্যে জলরাজ আখ্যায়িত করা হয়। মাছকে দেখেছেন এখানে বিশাল জলসিংহ হিসেবে। এ নাটকে খলিশা মাঝিকে স্বর্ণবোয়ালের নেশায় পায়। তার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ভুবনে অসংখ্য মাছ আকার, আকৃতি, বর্ণ ও স্বভাবে চিত্রিত। জেলে সম্প্রদায়ের জীবনব্যাপী সাধনায় স্বর্ণবোয়াল শিকারের স্বপ্ন শেষ অবধি স্বপ্নই থেকে যায়। খলিশা মাঝির বাবাও স্বর্ণবোয়ালের পেছনে ছুটেছে: 'খলিশা বাজান বাজান বলে কান্দে। নিকারিপাড়ার লোকেরা ছুটে আসে সেই সূর্য উঠার আগের থমথমে রহস্যঘেরা আলো অন্ধকারে। তারা দেখে বহু দূর বহু দূরে কোশা নৌকাটা। তারপর সেইটা আর দেখা যায় নাই। জনম মাঝি ফেরত আসে নাই'।[২৬] তার পিতার মতো সেও স্বর্ণবোয়ালের পিছনে ছুটতে ছুটতে এক সময় অসুস্থ হয়ে যায়। বংশ পরম্পরায় খলিশা মাঝি, তিরমনরা স্বর্ণবোয়ালের পেছনে জীবন পণ করে ছুটেছে। তাদের কয়েক পুরুষ জীবন দিয়েছে। খলিশা মাঝির অসুস্থতায় তার স্ত্রী করিমনের বিলাপে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে :

> খলিশা মাঝি সন্ধ্যার কিছু পরে ফের রক্তবমি শুরু করে। নায়েবালি বয়াতি কোথাও বায়নায় গান গাইতে গিয়েছিল ফিরতি পথে খলিশাকে দেখতে আসে। তিরমন তার শূন্য ব্যর্থ শিকারের কষ্ট ভুলতে হয়তো নির্মলদের বাড়ি গিয়েছে। তিসি তাকে দেখে বাঁকা চোখে তাকায়। করিমন বিলাপ শুরু করে। এই রে কোন দুশমনে স্বর্ণবোয়ালের মন্ত্র দিল তারার বাপধনেরে। স্বর্ণবোয়াল না শয়তান। আমার শ্বশুর বাজান গেছে এই বোয়ালের টানে ফিরে নাই– আমার মরদের বুক দিয়া রক্ত

> উথালে দিল। এই রে– আমার পোলাটার চক্ষেও না স্বর্ণবোয়ালের নেশা। সাধ কইরা করে মরণ সাধ হয়গো– ও– আল্লা কি গুনাহ করছিলাম আমি।[২৭]

সেলিম আল দীন বৈচিত্র্যময় বিষয়ে নাটক রচনা করেছেন এবং শেষপর্যন্ত মাছ নিয়েও লিখেছেন। মাছ নিয়ে তাঁর নাটক লেখার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনে সফলতা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ¯Y‡evqvj নাটকের ভূমিকা অংশে নাট্যকারের বক্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> বহুদিন আগে– এ মাছ প্রিয় কবি যথার্থ অর্থেই স্বর্ণবর্ণ-চকচকে হলদে রঙা একটি বোয়াল মাছ কিনেছিল ইসলামপুর নয়ারহাট বাজার থেকে। পরে একদিন আবিষ্কার করি যে- গাত্রবর্ণ বিচারে আমাদের দেশে তিন ধরনের বোয়াল রয়েছে। একরাতে আমার কেনা বোয়ালটি দ্যুতির সজীবতায় হঠাৎ চোখের ভেতর জীবন্ত হয়ে ওঠে। একটা প্রবল হার জিতহীন শিকার দর্শনে আমাকে প্ররোচিতও করে সেই স্বর্ণবোয়াল ছায়া। সে রাতে তার নিঃশব্দ ও সন্তর্পনী পুচ্ছ সঞ্চালন দেখেছি আমার মশারির ওপর শূন্য ঘর অন্ধকারে তাই দিয়ে গল্প। একান্তরূপেই মাছের গল্প। কিন্তু মাছতো আর আকাশ থেকে ধূমকেতুর মতো এসে পড়ে না। জলজীবীরা জানেন তাদের অপার রহস্যাবৃত জলবাসের কথা। তাছাড়া কূম মৎস্য প্রভৃতি অবতার পুরাণ তো রয়েছেই। উপাখ্যানের ধর্ম অনুযায়ী স্বর্ণবোয়ালে অন্তত একটি চরিত্র প্রায় মর্মান্তিক বাস্তবতায় এসে খুন হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে মাছ শিকারের মহৎ ও কালজয়ী উপাখ্যান আছে। আমি সেগুলোর ভেতরে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের বিশেষ প্রবণতার একটা আভাস পাই। মানুষের জীবিকা বলি পেশা বলি শিকারীর জিতে যাওয়াটাই আসল। বড়শি থেকে মাছ ছুটে গেল- তো সাধারণ চোখে তাকে মাছের সঙ্গে শিকারীর হার বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এখানে তার উল্টাটাই ঘটে গেছে। এ কাব্যের পরিণতি শিকার শিকারি কিংবা হার জিত এক অদ্বৈত নৈসর্গিক ঐক্যে বাঁধা।[২৮]

নিকারি পাড়ার যুবক তিরমন। সে স্বর্ণবোয়াল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, তিরমনের চোখে স্বর্ণবোয়ালের অবর্ণনীয় কুহক জাগে। সে বাক প্রতিবন্ধী সাঁঝমালার ফুটন্ত যৌবন খুঁড়ে তিরমন দেখেছে তার সুবর্ণ সম্পদ। তিরমন ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে খুঁজতে বের হয় সাঁঝমালাকে। বিলের ধারে কেয়াবনের দীর্ঘসারের দিকে সে সাঁঝমালাকে খোঁজে :

> সাঁঝমালার শরীরে ভেজা শাড়ি। কালো শাড়ি রূপালি পাড়। শ্যামল কপালে কালো টিপ। এত বৃষ্টি তবু খাসে নাই টিপটা, টর্চের আলোয় তার গাল খোলা দুই বাহু উজ্জ্বল শ্যামল জল চকচকে।
>
> সাঁঝমালা ব্যাঙ দুইটিকে ঘন অন্ধকারের দিকে নরমে ছুড়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসে। খপ করে কাঁধ ধরে তিরমন। ভেজা গালে তার খরখরে গাল ঘষে।- হরে চল। এইনা বৃষ্টি এই না ঘোর অন্ধকার।

> সাঁঝমালা অবশ হয়ে আসে। তিরমন তার পুরুষালি ঠোঁট ঘষে দেয় ঝোপাধরা সন্ধ্যামালতীর ভেজা পাপড়িতে।[২৯]

তিন পুরুষ খুইয়েও তিরমন মাঝি সাধনায় অটল, যে কোনো মূল্যে সে স্বর্ণবোয়াল শিকারে সফল হতে প্রতিশ্রুত। কাঙ্ক্ষিত শিকার সম্মুখে তিরমন তমিজের সঙ্গে তাকে উদ্দেশ্য করে আপন আকাঙ্ক্ষার ইতিবৃত্ত শোনাচ্ছে। অবোধ একটা মাছের সাথে মানুষের সম্ভ্রম বজায় রেখে কথা বলার অর্থ স্বর্ণবোয়াল তিরমনের নিকট বিশুদ্ধ মৎস্য নয় সে একটা প্রতীক মাত্র। সুতরাং তিরমনের সকল কর্মপ্রয়াসে স্বর্ণবোয়াল শিকার কোনো সাধারণ খেয়াল মাত্র নয়। যেমন :

> তবে স্বর্ণবোয়ালটা ছুইটা গেছেন। তিনি যাতে ছুইটা গিয়া আমার সোন্মান তাঁর সোন্মার রক্ষা করেন- আমি হেই দোয়া মাঙছি খোদার কাছে। তবে হার কি জিত কি বাজান। পাওন আর না পাওনের ভেদটা কি। আরে কতা কওনা ক্যান। ও বাজান।[৩০]

¯Y‡evqvj নাটকে স্বর্ণবোয়াল যেন মিথে পরিণত হয়। তিরমনের পিতা খলিশা মাঝির মৃত্যু হয় ঘুমের ভেতর। তার মৃত্যু নিকারির জীবিকার পথ ধরে এসেছে। পুত্র তিরমন বোয়াল মাছের সঙ্গে লড়াই করেছে বড়শি দিয়ে স্বর্ণবোয়ালকে ধরার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটি ছুটে গেছে। তবে সে সাঁঝমালাকে বিয়ে করেছে বলে অত্যন্ত আনন্দিত সে খবরই পিতাকে জানাচ্ছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তার পিতা চলে গেছে অজানা দেশে আর তারপর সাঁঝমালাও। ¯Y‡evqvj নাটকে সাঁঝমালা প্রকৃতির কন্যা। সে প্রকৃতি স্বরূপা। জন্ম থেকে বাকপ্রতিবন্ধী না হলেও পিতামাতার মৃত্যুর পর সে চিরদিনের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। সে নিকারী পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথা না বলেও তার ভাব হয় গরু, হাঁস ও মুরগির সঙ্গে। প্রাণিগুলোর সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। জঙ্গলে জঙ্গলে সে শঙ্খিনী সাপ ধরে বেড়ায় বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় আর তিরমন তার নেশায়, ভালবাসায় স্বর্ণবোয়াল না ধরার কষ্ট ভুলে যায়। তিরমনের কাছে সাঁঝমালাই সত্য। তবে সাঁঝমালার মৃত্যু নিয়তি নয় পরিণতি। ঘর পালানো মেয়ে পালক পিতার ভ্রমে মাছের পরিবর্তে হাতের সুতলি বাঁধা বড়শি কোঁচে বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। 'হায় হায় সেই তো সাঁঝমালা। চিৎকার করে ছলিম হায় রে একি করলাম তোরে আমি সাঁঝমালা।'[৩১] তার পিতা ভেবেছিল শরবনে বোয়ালের হুটোপুটি। সাঁঝমালার মৃত্যুর খবর শুনে ছুটে আসে তিরমন, শোকার্ত হৃদয়ে আকুল হয় নিকারি পাড়ার বাসিন্দীদের সঙ্গে তিরমনও। 'খলিশা মাঝি ও তিরমন মাঝিরা পুরুষ পরম্পরায় স্বর্ণবোয়াল শিকার করতে গিয়ে ভ্রমবশত আত্মজাকে পর্যন্ত হত্যা করে কিন্তু স্বর্ণবোয়াল রয়ে যায় অধরা।'[৩২]

¯Y‡evqvj নাটকে জেলেদের ধর্ম-সংস্কার, সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। জেলে পাড়ার লোকেরা কূর্মপূজা করে। কালচে পানিতে জবা-সিঁদুর শাপলা এবং খই নৈবেদ্যরূপে ভাসতে থাকে। অবইন জলদাস ধৃত কাছিমটাকে সিঁদুর পরায় তারপর বিষ্ণুমূর্তির সামনে প্রণত হয়। জীবনের মাঠ থেকে স্বর্ণফল আহরণের যে আকাঙ্ক্ষা নিকারীপাড়ার খলিশা মাঝির রক্তে তার সন্তানের মধ্যেও তা সঞ্চারিত, স্বর্ণবোয়াল শিকার পিতা-পুত্রের জীবন স্বপ্নের হয়ে ওঠে। 'জেলে জীবনের নানান অভিজ্ঞতা, নানান প্রজাতির মৎস্যশিকারের কায়দা, জেলেপাড়ার নৈমিত্তিক জীবন প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর ভিন্নতা বিষয় হয়ে ওঠে ¯Y‡evqvj নাটকে।'[৩৩]

সেলিম আল দীন রচিত avegvb নাটকে সোমেশ্বরী নদীর তীরবর্তী বাঙালি ও গারো পল্লির মান্দিদের জীবনাচরণের নানাদিক ফুটে উঠেছে। এ নাটকের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে একটি বোবা ষাঁড়কে কেন্দ্র করে। সোমেশ্বরী নদীর পূর্বপাড়ের সাধুটিয়া গ্রামের নহবতের ষণ্ডবয়ার সোহরাব। এই মোষটিকে ঘিরে লোকজ জীবনের নানা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। বাঙালি ও উপজাতি গারোদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বিরোধও নাটকে ঠাঁই পেয়েছে। avegvb নাটকের বিষয় সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য স্মরণীয় :

> আমি দেখলাম আমাদের সাহিত্যে পশু পাখি নিয়ে কোনো কিছু নাই। 'কেরামতমঙ্গল' এ একটা ষাঁড়ের গল্প আছে, সেখানে মানুষের সাম্প্রদায়িকতার পাপের বিরুদ্ধে যেন বা একটা ষাঁড় বিদ্রোহ করে বসে। ষাঁড় তো ওখানে সত্যের সিম্বল। হাজার হাজার বছর ধরে সে মানুষের পরিশ্রমের সঙ্গী মানুষের শ্রমকে লাঘব করার সঙ্গী কোনো দেবদূত নয়, একটা চারপায়ী পশু, সহস্র সহস্র বছর ধরে ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছে, হাড্ডি, শিং দিয়েছে, মাংস, দুধ দিয়েছে ... অথচ একটা গল্পও তাদেরকে নিয়ে নাই। তাই আমি avegvb রচনা করলাম। ওটা সোহরাব নামে এক মোষ-সেই মোষের গল্প। আমি অদ্ভুতভাবে লিখলাম, একটা জায়গায় আছে মোষের মা হামেলা পাহাড়ী গয়াল দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে। সুতরাং গারোরা ভাবছে যে, বাঙালিদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের যে বোঝাপড়া সেটা সমাধানের জন্য সোহরাবের আগমন ঘটেছে, যাকে তারা পূজা করে। যখন মোষটাকে লিল্লাহর মোষ হিসেবে কসাইরা জবাই করতে এসেছে, তখন মোষটা বিদ্রোহ করলো। বিদ্রোহ করে পালাতে শুরু করলো, কয়েকটা মানুষ মেরে ফেললো। নদী পার হলো সীমান্ত অতিক্রম করার সাথে সাথে বি.এস.এফ. গুলি করে, একটা গুলি লেগে গেছে, শেষপর্যন্ত ব্যাক করেছে রক্ত ঝরিয়ে। মোষটা শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। আমি শেষে বৌদ্ধের বাণী দিয়ে avegvb শেষ করেছি।[৩৪]

নহবতালির প্রথম স্ত্রীর বিয়োগ ঘটলে তার তিন বছর পর সুসং দুর্গাপুরের সুবতীকে সে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। সে বউ এর সঙ্গে পেয়েছিল একটি বকনা বাছুর আর তারই শাবক হামেলা। এক

সময় হামেলা গারো পাহাড়ে বুনো গয়াল কর্তৃক গর্ভবতী হয়। সুবতী ও নহবতের ঘরে আসে হামেলার সন্তান সোহরাব। নহবত খুশী হয়ে ভাবে পড়শি মিয়ার বাজপঙ্গীর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে তার মোষটি। আর মান্দি পাড়ার মুনীন্দ্র মারাক ভাবে অন্য কথা– সে আসবে মান্দি নগদিগরে বিবাদ মিটিয়ে দিতে। সোমেশ্বরীর তীরে বসবাসরত মানুষের মধ্যে চলে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ। পাহাড়ি বা আদিবাসী এবং নগদিদের বা বাঙালিদের মধ্যে লড়াই লেগেই থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসীরা কোনো সহযোগিতা পেত না ফলে তাদের উপর চলত লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যা। মান্দিদের ক্ষেত, ঘরবাড়ি, গরু, মোষের বাথান সবই দখল হয়েছে মুসলমান নগদি কর্তৃক। অথচ গারো পল্লির মান্দিরা সোহরাবের জন্মের পর তাকে নিয়ে নৃত্য করেছিল। কারণ সোহরাবের পিতা অরণ্যেব এক বুনো মোষ। তার গায়ে পাহাড়ের রক্ত।

avegvb নাটকে একটি বোবা ষাঁড় মানবিক গুণাবলির অধিকারী। সুবতী নহবতালির পরিবারের আরেক সদস্য হয়ে দাঁড়ায় সোহরাব। যদিও নহবতালির প্রথম স্ত্রীর গর্ভের প্রতিবন্ধী সন্তান এসাক রয়েছে, সে পায়ের সমস্যার জন্য চলাফেরা করতে পারে না। এসাকের দিনে দিনে বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম হয়ে ওঠে সোহরাব। নহবত তার মোষটিকে সন্তানের মতোই সঙ্গী করে নানা জায়গায় নিয়ে যায়, তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়। নহবত তার মোষটিকে সাঁতার শেখায় সোমেশ্বরীর জলে। এছাড়া সে সোহরাবকে মান্দিদের রে রে গানে নিয়ে গিয়েছিল। রে রে হচ্ছে গারোদের প্রেমের গান। এভাবে তার নৃত্য ছন্দ ও গান শিক্ষার প্রথম পাঠ শেষ হয়। এরপর সোহরাব ধীরে ধীরে লড়াই করতে শেখে। নহবত সাধুটিয়া ফ্রি প্রাইমারি স্কুলের অনতিদূরে একটি তরুণ কাঁঠাল গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সোহরাবকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। আবার নহবত মোষটিকে বাঙালি ও মান্দিদের ধর্ম উপাসনালয়েও নিয়ে যায়। নহবত শুক্রবার বাড়ির খানিক দূরে মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে যায় এবং সঙ্গে থাকে সোহরাব। সে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানের কাছে আরেকটি উদাল গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখে সোহরাবকে। সোমেশ্বরী নদী পার হয়ে নহবত একদিন ভোরে গীর্জার চত্বরে সোহরাবকে নিয়ে হাজির হয়। তার উদ্দেশ্য হলো সোহরাবকে সে ধর্ম কথা শোনাবে। এছাড়া মান্দিদের ওয়ানগাল্লা উৎসবে নহবত ও সোহরাব যোগ দেয়। এরপর একদিন সোহরাব রণসাজে সজ্জিত হয়। মোষের লড়াইয়ে রক্ত ঝরিয়ে সে সোনার মেডেল জিতে যায়। একদিন আকস্মিকভাবে ঘটে এক ঘটনা, যা সোহরাবের জীবননাশের সংবাদ। প্রতিবন্ধী এসাক স্বপ্নে দেখে সোহরাবকে জবাই করে গ্রামবাসীকে ভোজ দিলে তবেই এসাকের পা ভালো হয়ে যাবে। নহবত শেষপর্যন্ত সন্তানের জন্য আরেক সন্তান তুল্য সোহরাবকে বধকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। বাড়িতে চারজন কসাই এলে মোষটি তাদের আঘাত করে ছুটে পালিয়ে যায়। লিল্লাহর মোষকে কেউ সহজে আঘাত করে না। সকলে

ধাবমান হয় সোহরাবের পেছনে, একজনকে হত্যাও করে সে। এরপর আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়ে মোষটি মান্দি পল্লিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গারোরা তাকে দেবতার আসন দেয়। তাদের মনে হয় যেন বাঙালি ও গারোদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেওয়ার জন্য মোষটি ছুটে এসেছে। এরপর সোহরাব বর্ডারের কাছে গেলে বিএসএফ তাকে গুলি করে। রক্ত ঝরিয়ে পুনরায় মান্দিপল্লিতে ছুটে আসে। এদিকে বাঙালিরা ছুটে আসে মান্দিপাড়ায়। আবার পালায় সোহরাব, শেষপর্যন্ত মোষটি প্রভুর বাড়িতেই ফিরে আসে। সে আর বাঁচার চেষ্টা করে না, কসাই তাকে জবাই করে। এভাবেই সোহরাবের জীবনাবসান হয়। এ নাটকের দার্শনিকভাব প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> যে পরিবারে সে লালিত-পালিত হয় সেই পরিবারের সকলের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রণয়ের। জগতে ভালোবাসারও মরণ আছে– ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসাকে মরতে হয়। তা সত্ত্বেও সোহরাব মৃত্যুকে রোধ করতে অবিরাম ছুটতে থাকে– মৃত্যু ও জীবনের রয়েছে চির বৈরিতা। মৃত্যুর জীবনকেই চাই সে কারণে মৃত্যু সদাই জীবনের পশ্চাতে ধাবমান। কিন্তু শেষাবধি মৃত্যু এসে জীবনকে নিয়ে চলে যায় শত প্রয়াস প্রচেষ্টায়ও জীবন নিজকে রক্ষা করতে পারে না।[৩৫]

সেলিম আল দীনের cÎ নাটকের কাহিনি কৃষিজীবীদের জীবন ও জীবিকা কেন্দ্রিক হলেও আখ্যানে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। মাইট্যাল সিয়াজ ও তার স্ত্রী যমুনাবতীর সন্তান হারানোর বেদনার্ত ঘটনা নাটকের মৌল বিষয়। গলায় ফাঁস দিয়ে আম গাছের সঙ্গে একমাত্র পুত্র সন্তানের মৃত্যু ও পরবর্তী শোকার্ত হৃদয়ের হাহাকার cÎ নাটকের আগাগোড়া বিস্তৃত। যমুনা পাড়ের যমুনাবতী বা আবছা কুড়ি বছর আগে যুবক স্বামীর হাত ধরে আসে কাঠপুর গ্রামে। আবছার পুত্র আম গাছের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে আত্মাহুতি দেয়। সেই গাছটি কেটে নিয়ে গেছে মহাজন কিন্তু গাছের মোটা শেকড়গুলো রয়েছে। গাছের সেই শেকড় জ্বালিয়ে শীতের রাতে আগুন পোহায় স্বামী-স্ত্রী। আর গাছের শেকড় দেখে মা মৃত সন্তানের স্মৃতি মনে করে দুঃখ পায়। মায়ের মনে পড়ে পুত্র মানিকের প্রথম বাল্যশিক্ষা নিয়ে স্কুলে যাওয়া ও ছড়া পড়া- 'ভোর হল দোর খোল'। শীতে ছেলেটি হলদি বরণ চাদর আর বর্ষায় নীল রঙের ছাতা আবদার করত। অভাব দারিদ্র্যের সংসারে ছেলের আবদার, দুরন্তপনা, মাছধরা, পুকুর কাটার স্বপ্ন ইত্যাদি আবছাকে ভীষণভাবে কষ্ট দেয়। আর আম গাছের শিকড় পুড়তে পুড়তে সিরাজের মনে পড়ে ছেলের মৃত্যুর স্মৃতি :

> ওপর থেকে একটা মোটা দড়ি ঝুলছে আর লোকটি দুলছে ঘুরছে। তাতে দক্ষিণে হাওয়া মোচড় দিলে টর্চের আলো ফেলে সে চমকে ওঠে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে চোখ স্ফীতকায়। গায়ে মলিন ফুল হাতা শার্ট। সে চিৎকার করে ওঠে। ওরে আয়রে কেয়া জানি ফাঁসি নুইছে বেতের বনে মধু আম গাছটাতে।[৩৬]

সন্তান হারানোর ব্যথা বেদনায় দুজনই কাতর। তবু একে অপরকে দোষারোপ করে মনের ভার কিছুটা হালকা করে। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সন্তান সাদা মেঘ, কাশফুল নীল আকাশ, চিল সবই তাকে আকর্ষণ করত। মায়ের কাছে ঘুড়ির জন্য দুইশ টাকা চেয়েছিল কিন্তু তার মা তাকে দুইশত টাকা দেয় নি। সিরাজ আবছাকে বলে তুমি দুইশ টাকা দিলে মানিক আর ফাঁসি নিত না। আর আবছা সিরাজকে বলে তুমি তার স্বপ্নের পুকুরটা কাটলে না কেন? ঝগড়ার এক পর্যায়ে একটি শেকড় হাতে নিয়ে আবছাকে আঘাত করে। তাকে কটাক্ষ করে বলে, তুই যুবনাবতী; তুই অপয়া, পুত্রখাকী মা। আর আবছাও তাকে বলে আমার ছেলের পুকুরের খায়েশ মিটাবার সাধ্য নেই তোমার। তার দুর্ভাগ্য যে, এমন বাপের ঘরে সে জন্ম নিয়েছে। এক পর্যায়ে তারা শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। সিরাজ বিলাপ করে বলেছে, আমরা বাকী জীবন কি নিয়ে বাঁচব? এর উত্তরে আবছা বলেছে 'ক্যান যমুনাবতী চর দিবে।'[৩৭]

আবছা একুশ বছরের সংসার ভেঙে দিয়ে চলে যাবে একা বাপের দেশে। তার শূন্য বুকে হাহাকার ওঠে। সে আরেক পুরুষ জাতির অপেক্ষা করে। যে তাকে সন্তান দিবে কন্যা হলেও সন্তান তার চাই। সিরাজ তাকে বারণ করে। আবছা যমুনার ডাক শুনতে পায় শাদা সোনার চর তাকে ডাকে। সিরাজ আবছাকে নিবৃত্ত করতে পারে না, আবার তালাকও দিতে পারে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাইন তালাক দিয়ে আবছাই বেড়িয়ে পড়ে যেখানে মাইট্যাল সিরাজ আর মানিকের কবর নেই। 'যমুনাবতীর মতো খরতর নারী সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেনো বা খড়গহস্তা। যে নারী এক ভাঙন থেকে আর এক ভাঙনে ধাবিত হয় ক্রুদ্ধ ফাণিনীর মতো।'[৩৮]

সেলিম আল দীন রচিত DIv Drme লঘু নৃগোষ্ঠীকে নিয়ে রচিত। এ নাটককে অভিহিত করা হয়েছে নাট্য-নৃত্য-গীতি নামে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য wPÎv½'v (১৮৯২) এর মতো লোকজ ফর্মে DIv Drme নির্মিত। এ নাটকে মান্দি মিথকে আধুনিক ভাবনা বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুনতর ভাবনায় উপনীত করা হয়েছে। 'ছু আর খ্রাম' উভয় স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আবর্তনের এক আশ্চর্য মিথ DIv Drme এ সমকালীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ নাট্যে দীর্ঘকাল নির্যাতিত এক নৃগোষ্ঠীর ঘুরে দাঁড়াবার কাব্য। মান্দিরা নতুন করে বাঁচার স্বপ্নের বীজ বপন করেন। এখানে নাট্যকার সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে মান্দিদের রক্তপাত, অর্থনীতি ও ধর্ম ধ্বংসের ভয়ালদর্শন চিত্র নাট্যকার এই নাটকের সীমানায় আবদ্ধ করেন। সেলিম আল দিন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মান্দিদের মিথকে মঞ্চে উপস্থাপন করেন আর তারই ফলে মান্দি দেব-দেবীরা হাজির হন স্বনামে। যেমন– তাতারা, রাবুগা, আসা, মালজা, সুসেমি, সালজং প্রভৃতি। দীর্ঘকাল যাবৎ খ্রিষ্টান মিশনারি মান্দিদের অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের কাজ করেছে। অনেক মান্দি ধর্মান্তরিত হয়েছে। ফলে আদিবাসীদের

ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়, তাই নাট্যকারের অবস্থান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পক্ষে। ফলে প্রত্যক্ষ করা যায়, চার্চকেন্দ্রিক উৎসবের বিপ্রতীপে মান্দি ধর্মের উৎখাতের পাঁয়তারা। এই নাট্যের চরিত্র 'চিদুয়াল' যেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক বিভিন্ন সময় অস্বীকার করা লঘু নৃগোষ্ঠীসমূহ। যারা নিরাপত্তা বাহিনী আর জবরদখলকারীদের অত্যাচারে ভূমিহীন উদ্বাস্তু হয়ে যায়। কেউ প্রতিবাদ করে আবার কেউবা সীমান্তের বেষ্টনী পার হয়ে পালায়, সেই জীবন থেকে কিংবা রাষ্ট্র থেকে, সংবিধান, সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতার অজুহাতে নির্যাতিত হয়েছে লঘু নৃগোষ্ঠীসমূহ। ফলে তারা নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকে। সেলিম আল দীনের DIv Drme মান্দি জাতিসত্তার মিথ। এ নাট্যে লক্ষ করা যায়, নাট্যকার মান্দি জাতিসত্তাকে গারো পরিচয়ে উপস্থাপন করেছেন। মান্দি সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে গারো নামের পরিচয়টি তাদের গা থেকে খসিয়ে মূল পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার লড়াইয়ে লিপ্ত। ব্রিটিশ উপনিবেশ তাদের সাংসারিক ধর্মকে লুপ্ত করে খ্রিষ্টানে পরিণত করেছে এবং তাদের আদি পরিচয়কে লুপ্ত করে দিয়েছে। মান্দি সম্প্রদায়ের যে বাৎসরিক উৎসব 'ওয়ান্না' তা চার্চের অধীনে 'ওয়ানগালা' উৎসব হিসেবে খ্রিষ্টীয় ভঙ্গিতে উদ্‌যাপিত হয়। নাট্যকার অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মান্দিদের জীবনের রূপান্তর তুলে ধরেছেন। DIv Drme ও ¯c igYxMY নাট্যদ্বয়ে আদিবাসী জীবনের সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস-আচার, ধর্ম ও সংস্কৃতির নানাপ্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ¯c igYxMY নাটকের মূল উপজীব্য রাজনীতির কারণে রাষ্ট্রে সংঘটিত ক্ষত; যাকে আমরা মুছতে পারি না। রাষ্ট্রের নামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে নাট্যকার ক্ষুব্ধ। কিন্তু এই ধ্বংস প্রবণতার মাঝে স্বপ্ন সন্ধান করেন তিনি। কল্যাণমুখী রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সংখ্যক আইন কানুনের সমষ্টি না হয়ে জনকল্যাণের আধার হবে। আদিবাসী মারমা ও মান্দি জীবন ও সংস্কৃতির উপাদান নাটকে তুলে ধরে নাট্যকার প্রত্যাশা করেন নতুনতর সম্ভাবনার :

ফাটাতো পাথর বিচূর্ণ ওড়নে যাও– যে মতো বৈশাখে
তুলা বীজ কেটে মহিষ বরণ
মেঘেদের দিকে উড়ে যায় শিমুল বীজেরা।
তোমার গুপ্ত কেন্দ্রীয় কণা ফেটে
ঝরুক স্বপ্ননারীরা। প্রতি ভোর হত্যামুখ এখানে-
প্রতিভোর সূর্যোদয় রক্তগন্ধী হওয়া।
স্বপ্নরমণীগণ ঢেকে দাও এই অপঘাত ইতিহাস।[৩৯]

তথ্যনির্দেশ

১. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK (ঢাকা : নান্দনিক, ২০১২), পৃ. ২৮৬

২. সেলিম আল দীন, “পরিশিষ্ট”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-5 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৬০৪

৩. ঐ, “বনপাংশুল”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-5, পৃ. ৩১৭

৪. Z‡‘e, পৃ. ৫২২

৫. Z‡‘e, পৃ. ৩৭৮

৬. সেলিম আল দীন, “পরিশিষ্ট”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvgM-6 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৫৬৫

৭. ঐ, “প্রাচ্য”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৯৯

৮. ঐ, “পরিশিষ্ট”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৫৬৮

৯. মেহেরুন্নেসা সেলিম, “নাটকের সাথে বসবাস”, মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ ml‘v (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১১৬-১১৭

১০. সেলিম আল দীন, “প্রাচ্য”, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৪৭

১১. অরাত্রিকা রোজী, evsjv‡‘‡ki bvUK (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২৭

১২. সেলিম আল দীন, “পরিশিষ্ট”, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৫৬৭

১৩. ঐ, “একটি মারমা রূপকথা”, সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯), পৃ. ৯৭

১৪. Z‡‘e, পৃ. ১০৩

১৫. Z‡‘e, পৃ. ১১০

১৬. Z‡‘e, পৃ. ৮৫

১৭. Z‡‘e, পৃ. ৭৮

১৮. সেলিম আল দীন, “পরিশিষ্ট”, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৫৬৯-৭০

১৯. ঐ, “নিমজ্জন”, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ১০৫

২০. Z‡‘e, ১১১

২১. Z‡‘e, ১১২

২২. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ২৯১

২৩. সেলিম আল দীন, “নিমজ্জন”, পৃ. ১৭১

২৪. লুৎফর রহমান, পৃ. ১৬

২৫. সেলিম আল দীন, “নিমজ্জন”, পৃ. ৩০৩-৩০৪

২৬. ঐ, “স্বর্ণবোয়াল”, †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৩৩৩

২৭. Z‡‘e, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

২৮. Z‡‘e, পৃ. ৫৭৪

২৯. Z‡‘e, পৃ. ২৫৬

৩০. Z‡‘e, পৃ. ৪২৮

৩১. Z‡‘e, পৃ. ৪২৯

৩২. লুৎফর রহমান, পৃ. ১৭

৩৩. Z‡‘e, পৃ. ৩৪

৩৪. সেলিম আল দীন, "কথাপুচ্ছ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6 (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৫

৩৫. লুৎফর রহমান, পৃ. ১৭

৩৬. সেলিম আল দীন, cÎ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ৩৬

৩৭. Z‡‘e, পৃ. ৩৩

৩৮. লুৎফর রহমান, পৃ. ৩৪

৩৯. সেলিম আল দীন, "স্বপ্ন রমণীগণ", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ৫২৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রীতি বিচার

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে সেলিম আল দীন নাটকের শৈলী নির্মাণে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তাঁর শিল্পীসত্তা ছিল বহুমুখী। বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে তিনি বেছে নেন আপন লেখনীর ভুবনে। একারণে বলা যায়, তাঁর নাটকের বিষয় আরোপিত নয়, তিনি এদেশের সমাজে বহমান সমস্যাবলি, রাজনীতির ক্ষয়িষ্ণুদশা, শ্রেণিশোষণ, স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে বুর্জোয়াদের শোষণ প্রভৃতি নাটকে রূপায়িত করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়। তিনি নাটকের তাই বিষয় নির্বাচনে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে সন্ধান করলেন বাঙালির চিরায়ত জীবনধারাকে। ফলে তাঁর নাটকের আঙ্গিক, ভাষা, পরিবেশনা শৈলী সবকিছুতেই দেখা যায় পরিবর্তন, নতুনত্ব। নাটকের আঙ্গিক গঠনে ঔপনিবেশিকতাকে পরিহার করে নিজস্ব সাধনায় নিরলস নিমগ্ন ছিলেন। ফলে তাকে চিহ্নিত করা হয় বাংলা নাট্যবোধের অনুসন্ধানী নাট্যকার হিসেবে । বাংলার চিরন্তন নাট্যধারাকে আবিষ্কার ও সমকালে তা গভীর প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেলিম আল দীন কেবল নাট্যরচনা ও শিল্পতত্ত্ব প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। নিজস্ব অভিনয়রীতি চর্চার নিমিত্তে স্বপ্রতিষ্ঠিত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে চালু করেছিলেন গায়েনরীতির অভিনয় অনুশীলনী ক্লাসের, তার নাম দিয়েছিলেন কখনো গৃহাঙ্গণ থিয়েটার, কখনো বৈঠকী রীতি এবং শেষে নাম দিয়েছেন আসর। পরবর্তীকালে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাঙ্গিকে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির অনুশীলনে বেশ কিছু গবেষণা নাট্য প্রযোজনা করেছেন বিভাগের থিয়েটার ল্যাবে ক্লাসরুম থিয়েটার নামকরণ দিয়ে। সেলিম আল দীন তাঁর আবিষ্কৃত ও সৃজিত আঙ্গিক ও অভিনয়রীতির অনুশীলন এবং নিজস্ব নন্দনভাবনা ও শিল্পতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গবেষণাগারে নির্মাণ করেন নানা ধারা ও রীতির নাট্য প্রযোজনা। ঔপনিবেশিক আমল থেকে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ফ্যান্টাসি গল্প, অতি নাটকীয়তাপূর্ণ সংলাপ ও অভিনয়রীতি, অঙ্ক বা দৃশ্য সজ্জা, দৃশ্য পরিবর্তনে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি পরিহার করে নতুন করে নাট্য পরিবেশনার ধারণা ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়ামনির্ভর তিন দেয়াল ঘেরা মঞ্চ নয়, বরং তিনি বৈঠকখানা ধরনের বা আসর ধরনের মঞ্চ নির্মাণ কৌশল প্রাধান্য দিয়েছেন।

সেলিম আল দীন আধুনিক কালের নাট্যকার ও আধুনিক নাট্যকার। তাঁর নাটকের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রীতির বিচারের পূর্বে আধুনিক বাংলা নাটকের আঙ্গিকের সংক্ষিপ্ত একটি ক্রমধারা উল্লেখ

করা হলো। কেননা সেলিম আল দীনের নাটকের বিষয় নিয়ে কোনো বির্তক না থাকলেও তাঁর নাটকের আঙ্গিক নিয়ে রয়েছে নানা অভিমত। তাই বাংলা নাটকের আঙ্গিকের ধরন স্মরণ করেই সেলিম আল দীনের নাট্য নিরীক্ষা মূল্যায়ন করা সম্ভব। মূলত অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি হতে নাটকের উৎপত্তি। অনুকরণ প্রবৃত্তি মানুষের আদিম স্বভাবজাত। মানুষ অপরের কথা, ভাব ও ভঙ্গি লক্ষ করে পুনরায় তা নকল করতে ভালবাসে। যদিও আদিম সমাজে লোকদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্ম হয় নি তবুও তারা সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে তাদের অনুকরণ প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করে তুলত। নৃত্য মানুষের ইতিহাসে প্রাচীনতম কলা। আদিম সমাজে নৃত্যের মধ্য দিয়ে লোকে ধর্মভাব এবং হৃদয়ভাব প্রকাশ করত, সমস্ত প্রকার ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে ধর্মসাধনা এবং কলাচর্চা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। ধর্মাসাধনার বিচিত্র প্রকাশ উপায়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কলার বিকাশ ঘটত। নাট্যকলার উদ্ভবও এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে হয়েছিল। গ্রীকদেশে দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল তা হতে ট্রাজেডির উৎপত্তি এবং ঐ দেবতার উৎসবে হাস্য পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সংগীত হতে কমেডির সৃষ্টি। ভারতীয় নাটকের মূলও ধর্মের মধ্যে নিহিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রথম শতাব্দী হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের গৌরবময় যুগ ছিল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে মূলত সব শ্রেণির মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল না। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। অন্য কোনো শ্রেণি ও বর্ণের প্রভাব এতে আশ্রয়লাভ করতে পারে নি। নাটক প্রণয়নের পর এর অভিনয়ও মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির সম্মুখে হত। গ্রীক দেশে উন্মুক্ত আকাশতলে ত্রিশ হাজার দর্শক সমবেত হয়ে যেমন মানব জীবনের নিগূঢ় সমস্যা দেখতে পারত; ভারতের জনসাধারণের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। সংস্কৃত কবি জয়দেবের MxZ‡Mwe›`-এ লোকাভিনয়ের ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। MxZ‡Mwe›`-এর কাহিনি বিন্যাসরীতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে নৃত্যগীতময় নাটকের বিভিন্ন অংশের প্রমাণ মেলে। এ কাব্যে কবি স্বয়ং অধিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অধিকারীর বিবৃতি, একভাষী সংলাপ, আবৃত্তিমূলক পদ্যাংশ ও নৃত্যগীত এই অংশগুলি এর মধ্যে রয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদের মধ্যে স্থানে স্থানে নৃত্যগীত ও নাট্যাভিনয়ের কথা আছে। চর্যাপদের কালে (৬৫০-১২০০ খ্রি.) বাংলা নাটক ও অভিনয়ের অস্তিত্ব ছিল তারও প্রমাণ একাধিক চর্যাপদে দেখা যায়। যেমন ১৭নং চর্যায় বর্ণিত হয়েছে : ব্রজধরের নৃত্য, দেবীর গীত অর্থাৎ নৃত্য ও সংগীতের মিলিত প্রয়াসে বিসম বা সম্পন্ন হয়েছে নির্বাণ দেবতা বুদ্ধের নাটক। এছাড়া তন্ত্রী বীণা, ঢোল, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ যন্ত্রীদের অভিনয়ে অংশগ্রহণের তথ্য চর্যার একাধিক পদে

পাওয়া যায়। এছাড়াও ১০ সংখ্যক চর্যায় আছে- অভিনয়ের সাজসজ্জা ও প্রসাধন দ্রব্যাদি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল নানা জায়গায় গিয়ে অভিনয় করত সে সব প্রসঙ্গ। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য kxKòKxZb-এর (১২০১-১৪০০ খ্রি.) অভিনয়যোগে পরিবেশনার বিষয়টির প্রমাণ মেলে। সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত পদ আশ্রিত সংলাপসমূহ তিনটি চরিত্রের সংলাপ ও গায়েন দোহারের গীত সহযোগে আসরে পরিবেশিত হত। এ থেকে আদি মধ্যযুগে বাংলা নাটকের গঠনরীতি ও অভিনয় সূত্রের স্পষ্টরীতি চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং kxKòKxZbও যে গীতিনাট্য রূপে অভিনীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌতূহল উদ্দীপক অবিচ্ছিন্ন কাহিনি ধারার মধ্যে যে নাটকীয়তা রয়েছে শুধু তা নয়, এতে অধিকারীর ভূমিকা, উক্তি, প্রত্যুক্তি ও গান রয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রেরণা ও প্রভাবে যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে সংস্কৃত নাটকও রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকের শুরুতেই প্রথমে নান্দীতে কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের বন্দনা, প্রস্তাবনার পরেই মূল নাটকের আরম্ভ। পরিশেষে ভরত বাক্য উচ্চারণ। সংস্কৃত নাটক ছিল 'দশ' অঙ্কযুক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে সংস্কৃত শিক্ষার ধারা যেমন সংকুচিত হয়ে আসে, তেমনি সংস্কৃতসাহিত্য রচনার ধারাও ক্ষীণ হয়ে পড়ল। সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে নাট্যরচনাও মধ্যযুগে বিলুপ্ত হয়ে গেল। সেই জায়গায় প্রচলিত হলো গীতিনৃত্যধর্মী লোকাভিনয় বা যাত্রাভিনয়ের ধারা। 'অতীতে কোনো দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ গানের সহিত সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত। ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল।'[১]

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে নাটকের অস্তিত্ব ছিল। চর্যাপদের রচনাকাল সপ্তম বা দশম-দ্বাদশ শতক যাই নির্দিষ্ট হোক না কেন তা থেকে একথা বলা যায়, চর্যাপদের রচনাকাল বা তার পূর্বেই বাঙালির সংস্কৃতি চর্চায় নাটকের অস্তিত্ব ছিল। নাটক রচনার অব্যাহত প্রয়াসের ফলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা নাটকের কতিপয়রীতি গড়ে ওঠে। তার মধ্যে বহুল পরিচিত এবং নন্দিত রীতি হচ্ছে– পাঁচালি, লীলানাট, গীতনাট, নাটগীত প্রভৃতি মৌখিক রীতির বাংলা নাটক। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এসে এগুলো আর মৌখিকরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি– মঙ্গল নাট, রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ইত্যাদি লেখ্যরূপেরও প্রচলন হয়। বাংলা নাটক প্রাচীনযুগ উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে এর সুনির্দিষ্ট একটি গঠনরূপও প্রাপ্ত হয়। এটা একান্তই বাঙালির নিজস্ব শিল্পীসত্তার আশ্রয়ে গড়ে ওঠা। পরিবেশন রীতির প্রেক্ষিতেও বাঙালির এ সকল নাট্যআঙ্গিক উল্লেখ করার মতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, gqgbwmsn MxwZKv ও cee½ MxwZKv-এর প্রসঙ্গ। ক্ষিপ্র

Dhaka University Institutional Repository

গতি, সীমিত পাত্র-পাত্রী ও বাস্তব ঘটনার আশ্রয়ে রচিত হয়েছে এসব পালা। ময়মনসিংহ অঞ্চলের এই পালাগুলিকে (১৬০১-১৮০০ খ্রি.) বাংলা নাটকের বিচিত্র নাট্যরীতির একটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা যায় পালাগুলি আধুনিক নাটকের ন্যায় সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। এই পালাসমূহ আসর বন্দনা, ঘটনার বর্ণনা, সংলাপ ও সঙ্গীতের বিমিশ্রণে অভিনয়াশ্রয়ী পরিবেশনামূলক। এই সকল পালা পরিবেশনায় প্রাধান্য লাভ করে অভিনেতা। নারী-পুরুষ সকল চরিত্র গায়েন বা দোররা অভিনয় করেন। ইংরেজ শাসনামলে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যখন তীব্র হয় তখনও এদেশীয় সংস্কৃতির দৃঢ় মূলের পরিচয়টি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। একই সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রবল জোয়ারের মুখেও ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণির বাইরে সাধারণ লোকসমাজে সদর্পে টিকে থাকে লোকনাট্য। আদি মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যকীর্তির সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা kxKòKxZb বাঙালির নিজস্ব নাট্যপ্রতিভা এবং রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর তেরোটি উপাখ্যানের প্রত্যেকটি যেমন স্বতন্ত্র রূপে বিবেচ্য তেমনি সমগ্র কাহিনিটি সর্বগুণে গুণান্বিত একটি অখণ্ড নাটক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের মধ্যে ইউরোপীয় অর্থাৎ বিদেশি রঙ্গালয়ের সূচনা হয়েছিল। যিনি সর্ব প্রথম বাংলা নাট্যশালার দ্বার উদঘাটন করলেন তিনি হলেন হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ দেশীয় বিদেশি। তিনি 'Bengally theatre' নামে একটি নাট্যশালা স্থাপন করলেন এবং তাতে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের দ্বারা 'Disguise' and 'love is the best Doctor' নামক দুইটি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ করিয়েছেন। প্রহসন দুইটি মধ্যে বাঙালি দর্শকের রুচি অনুযায়ী অনেক দৃশ্য ও চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছিল। ইংরেজদের দ্বারা কয়েকটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই সব রঙ্গালয়ে সাধারণ বাঙালি দর্শকের যাতায়াত ছিল না, এর অভিনেতা ছিল ইংরেজ। নাট্যশালা স্থাপনের চেষ্টা শুধু ইংরেজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, নাট্যপ্রিয় ধনশালী বাঙালি এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এতে Rwjqvm wmRi ও উইলসন অনূদিত DËiivgPwiZ এর অভিনয় হয়। বাঙালি পরিচালিত নাট্যশালায় প্রথম যে বাংলা নাটকের অভিনয় হয় তার নাম হলো we'¨vm›'i। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় নাটকটি অভিনীত হয়। বাংলা নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালার প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে ব্যাপক হতে লাগল। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ নাট্যশালা স্থাপনায় সচেষ্ট হলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা পায়। তাদের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা,

পাথুরিয়াঘাট বঙ্গ নাট্যালয়, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য বাংলা নাটকের চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা নাট্যসাহিত্যের আঙ্গিনায় নাট্যকারগণ এসে আসন গ্রহণ করতে লাগলেন। নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পর হতে মিশ্র এক বাংলা নাটকের জন্ম লাভ হয়। তৎকালীন বাংলা নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন :

> উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে কলকাতায় যে নাট্য রচনার ও নাট্য অভিনয়ের প্রচলন হল তাতে আমাদের দেশের ঐতিহ্য সাহিত্য নাট্যকর্মের অনুসরণ নেই। সে হল নতুন আমদানি বিদেশী রীতির আত্মসাৎ করণের চেষ্টা। সংস্কৃতনাটক ও ইংরেজি নাটক মিশিয়ে তাতে কিঞ্চিৎ যাত্রাগানের ফোড়ন দিয়ে বাঙলা নাটক তৈরী হল।[২]

আধুনিক বাংলা ট্রাজেডি নাটকের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)। তিনি প্রথম পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসরণে নাটক লেখা শুরু করেন। কিন্তু তার আগে মোটামুটি সংস্কৃত রীতিতেই নাটক লেখা হয়েছিল। এই সংস্কৃত রীতির নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন রামনারায়ণ। সংস্কৃত নাটকে শুধু অঙ্ক বিভাগ থাকে, দৃশ্য বিভাগ থাকে না। সংস্কৃত নাটকের পরিণতি বিয়োগান্তক হয় না। সংস্কৃত নাটকে থাকে দীর্ঘ উক্তি, উচ্ছ্বাস ও কাব্যময়তা। এছাড়া দশ অঙ্ক পর্যন্ত বিভাগ থাকে। মধুসূদন মৌলিক নাট্য প্রতিভা। তাঁর পূর্বে বাংলা নাটকের যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় নি। কারণ সে সময়ের বেশির ভাগ নাটক ছিল অনুবাদ নাটক। অনুবাদক নাট্যকারগণ ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাটক থেকে অনুবাদ করেছেন। তবে সংস্কৃত নাটকের রীতি ও আদর্শই এই সময় অনূদিত বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। অনুবাদক নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন। মধুসূদনই সর্ব প্রথম সংস্কৃত নাট্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তা বর্জনপূর্বক পাশ্চাত্য নাট্যরীতিতে বাংলা নাটক নির্মাণ করেন। শেক্সপীয়ার বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন। তাঁর প্রভাব আমাদের এদেশের নাটক ও নাট্যমঞ্চে লক্ষ করা যায়। বাংলা নাটকের বিষয়, আঙ্গিক ও রসের ধারা শেক্সপীয়রীয় নাটকের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। মধুসূদন শেক্সপীয়রের পঞ্চাঙ্কের দৃশ্য বিভাজন নাট্যরীতি অনুসরণ করে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র সচেতনভাবে শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর পাশ্চাত্য নাট্যপ্রভাব সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে। পাশ্চাত্য নাটকের বৈশিষ্ট্য সাধারণ ঘটনার তীব্রবেগ, প্রবল নাট্যোৎকণ্ঠা, চরিত্রগুলির বলিষ্ঠ ট্রাজিক রূপ, বহির্দ্বন্দ্বের সঙ্গে কঠোর অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাবেশ, সংলাপের কবিত্ব সম্পদ প্রভৃতি। মধ্যযুগীয়

নাট্য সাহিত্যের আঙ্গিকটি এঁদের হাতে চর্চিত হল না, বরং তাঁরা পাশ্চাত্যরীতিতেই নাট্য নির্মাণ করলেন। এরপরই বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ভাবধারা নিয়ে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) নাট্যচিন্তা ও মঞ্চচিন্তায় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পূর্বসূরিদের মতো ইউরোপীয় নাট্যধারায় অবগাহন করেন নি। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি গভীর মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নাটকের পঞ্চাঙ্কের আঙ্গিকের বাঁধন ভেঙে দিলেন। এমন কি তিনিই প্রথম রূপক ও সাঙ্কেতিক রীতিতে নাটক লিখেছেন এবং নাটকের মঞ্চ প্রয়োগের ব্যাপারেও আঙ্গিকের বাহুল্য বর্জন করে, সরল স্বাভাবিক যাত্রারীতি অবলম্বন করেছেন। তবে তাঁর প্রথম পর্বের নাটকের মধ্যে শেক্সপীয়রের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ivRv I ivbx ও wemRb পুরোপুরি শেক্সপীয়রের প্রভাবে রচিত। গভীর ভাবসমৃদ্ধ ও ট্রাজিক রসাত্মক নাটক এ দুটো। রবীন্দ্রপ্রতিভা বহমান নদীর মত। তাঁর নাটকের মধ্যে আছে গীতিকাব্যের প্রভাব। তিনি রূপকতত্ত্বময় নাটক রচনা করেছেন। যুক্তি, আবেগ, দর্শন ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র নাটক বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাটকেরই বিবর্তিত রূপের স্বাক্ষর। উনিশ শতকের দেশি ও বিদেশি নাট্যরীতির সমন্বিত রূপটি মূলত রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রথম দেখা যায়। রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক এভাবেই বলেছেন :

> কবিতা ও গানের রাজ্যে তিনি যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি অতুলনীয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নাট্যসাহিত্য নাট্যরীতির সুনিয়ন্ত্রিত বিধানের মধ্যে নির্দেশিত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বন্ধন-অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার রীতি ও নিয়ম অতিক্রম করিয়া নাট্য রচনা শুরু করিলেন। তাহার নাটকের সহিত পূর্ববর্তী নাট্যধারার কোনো যোগ নাই। তাঁহার নাটকীয় চেতনার উৎস হইয়াছে তাঁহারই অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-রসসিক্ত মানসভূমি।[৩]

রবীন্দ্র নাট্যপ্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাটক নিজস্ব রূপ-রীতির আশ্রয়ে আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হয়। তাঁর নাটকের গঠনশৈলী দেশজ বর্ণনাত্মক রীতির অনুসারী, গীতিধর্মিতা এর মর্মগত সুর। তিনি বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং নিজস্ব জীবনভাবনা ও জগৎবোধের সমন্বয়ে যে সব নাটক রচনা করলেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকের বিধিবদ্ধ শৃঙ্খলার বাইরে একটা স্বতন্ত্র রীতির নাটক রূপে প্রতিভাত হল। রবীন্দ্রনাথ যাত্রাভিনয় পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নেই। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই যাত্রারীতি সমর্থনের ফলে যাত্রারীতিতে নাট্যাভিনয় দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, খোলা আকাশের নিচে

প্রকৃতির মানচিত্র আঁকা পটভূমিতে যাত্রার যে প্রাণধারাটি মনের আনন্দে বয়ে চলে, সেটাই প্রাণবন্ত। কেন না যেখানে উন্মুক্ত আকাশতলে, প্রসারিত প্রাঙ্গণে স্বাভাবিক সূর্যালোকে অভিনয় হয়, সেখানে মঞ্চকলা নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বাস্তবতা দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এদেশের নাট্যকলার প্রকৃত উপলব্ধি ভিন্ন। 'বাংলাদেশের নাট্যকলার জন্ম ঔপনিবেশিক আমলে নয় বরং প্রাচীন পাল শাসনামলে। এই দীর্ঘ দ্বাদশ শতকের ইতিহাসে বাংলার জনগণের শ্রমলব্ধ এমন এক কাহিনী বিবৃত আছে যা বৌদ্ধ-পাল যুগে অঙ্কুরিত ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন যুগ ও মুসলিম শাসনামলে বিস্তৃত।'[৪]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হতে নবনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের প্রভাবে নাটকের বিষয়, আদর্শ ও আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনে অনেক উত্থান-পতন হয়। ফলে এদেশের যে নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে শেক্সপীয়র কিংবা পাশ্চাত্য প্রভাব খুবই সামান্য। বস্তুত ১৯৩৯ সাল হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত একদিকে বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবে ও অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-বিপ্লবে এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন নিদারুণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ- বিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আকস্মিক বিপর্যয় এনে দেয়। বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলনে যাদের দান সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। অভিনয়, নাট্য-প্রযোজনা ও নাট্য রচনা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। তাঁর bev`b (১৯৪৪) নাটকে সর্বপ্রথম মঞ্চ আঙ্গিকের প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে আলোকসম্পাত ও শব্দক্ষেপণের নানা কলাকৌশল অবলম্বনে দৃশ্য পরিবেশ ও ভাব পরিবেশ গঠনের চেষ্টা করা হয়। নবনাট্য আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল চরিত্র চিত্রণের নতুনত্বের মধ্যে। সাধারণ নাট্যশালায় পূর্বে এক একজন প্রধান অভিনেতা অভিনেত্রীর দিকে শুধু লক্ষ রাখা হতো। ছোট ছোট চরিত্রগুলো প্রায়ই উপেক্ষিত হতো। নাটকের অভিনয় সাধারণ মানুষের কাছে ঘনিষ্ঠ করে তুলবার জন্য এ পর্বে তাঁরা নাটকের মাঝে জনতার দৃশ্য বেশি আনতে আরম্ভ করলেন এবং আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে বহির্জিগতে চলমান গণজীবনের বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত জীবনযাত্রাকে রূপায়িত করতে সমর্থ হলেন। ধীরে ধীরে নাটকে অঙ্ক, দৃশ্য কিংবা গর্ভাঙ্কের বাহুল্য বর্জিত হতে শুরু হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সভ্যতার সামূহিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে যেসব মতবাদের উদ্ভব ঘটে অ্যাবসার্ডবাদ তাদের অন্যতম। মহাযুদ্ধ সভ্যতার সামনে এমন এক আনবিক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে যে, মানুষ তার ভবিষ্যৎকে ভাবতে শুরু করেছে একান্তই অর্থহীন। যুদ্ধের

বৈনাশিকতায় আপন অস্তিত্বই তার কাছে হয়ে উঠল আতঙ্কের উৎস। সমর-উত্তর এই ভগ্ন বিশ্বাস, অর্থহীন ভবিষ্যৎ আর বিহবল মূঢ় অস্তিত্বভীতিই অ্যাবসার্ডবাদ উদ্ভবের মৌল প্রেরণা। এ সময় অ্যাবসার্ডবাদ শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও এই মতবাদের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপন্ন সময়ে । ১৯৪২ সালে প্রকাশিত অ্যালবেয়র কাম্যুর (১৯১৩-১৯৬০) *The Myth of Sisyphus* গ্রন্থে প্রথম অ্যাবসার্ড ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত, জীবনের সুর ও সঙ্গতি থেকে বিচ্ছিন্নতাই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের মানস-বিচ্ছিন্নতা, তার অসঙ্গতি এবং জীবনের অর্থহীনতা অ্যাবসার্ড নাট্যকার তুলে আনতে চান তাঁর সৃষ্টিতে। অ্যাবসার্ড নাটকের স্রষ্টা তার সৃষ্টিতে, ভাবনায় এবং ভাষায় অকুণ্ঠিত স্বাধীনতার প্রত্যাশী, তাই তিনি মেনে চলেন না কোনো যৌক্তিক নিয়মের বেড়ি। প্রচলিত নাটকের মতো দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, চরিত্রের টানাপোড়েন ও ক্রমবিকাশ, পঞ্চসন্ধির সংগঠন, নাটকীয় বাঁক পরিবর্তন এবং সংলাপের সঙ্গতি থাকে না অ্যাবসার্ড নাটকে। এ ধরনের নাটকে কাহিনির কোনো বিকাশ থাকে না; বরং বলা ভালো কোনো কাহিনিই থাকে না অ্যাবসার্ড নাটকে। এ প্রজাতির নাটকে সংলাপের কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না; চরিত্রের আগমন প্রস্থানের যৌক্তিক কারণ থাকে না, বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি থাকে না, কর্মের প্রেরণা থাকে না, থাকে কেবল নিরুদ্দিষ্ট বিশ্বে অস্তিত্ব- আতঙ্কিত মানুষের অর্থহীন অস্থিরতার চিত্র। মুনীর চৌধুরী রচিত Kei (১৯৫৩) একটি অ্যাবসার্ড নাটক। সাঈদ আহমদের অ্যাবসার্ড নাটক Kvj‡ejv (১৯৬১)। নাটকটি বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রচিত হয়েছে। নাটকের এই বিষয় আমাদের কাছে অভিনব নয়, বরং অভিনব হচ্ছে এর উপস্থাপনা কৌশল এবং সংগঠন শৈলী। এই নাটকে ঘনঘটাপূর্ণ কোনো ঘটনা নেই, নেই চরিত্র বিশ্লেষণ আর পঞ্চাঙ্করীতিতে ঘটনা-বিন্যাসের সনাতন প্রয়াস। পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের অনুসারে কাহিনি বিন্যাস, আপাত অসংলগ্ন সংলাপ, অর্থহীন প্রতীক্ষ Kvj‡ejv নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অ্যাবসার্ড নাটকের মতো অভিব্যক্তিবাদী বা অস্তিত্ববাদী নাটকও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া শিল্প ফসল। অস্তিত্ববাদী নাট্যকার সনাতন পথেই মানুষের অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বমুক্তির নাট্যভাষ্য নির্মাণ করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত Zi½f½ (১৯৬৫) নাটকটিও অ্যাবসাড রীতিতে রচিত।

১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জীবনধারাকে বদলে দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ত্যাগ এবং অর্জন এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জাতিসত্তাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় জাগিয়ে তোলে। এই ধাক্কা নাটকের গায়েও লাগে। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশের নাটক নতুনভাবে

পাখা মেলতে শুরু করে। নতুন যে ব্যাপারটি এই পর্যায়ে অবশ্যই লক্ষণীয় তা হলো, যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধা নাট্যকর্মীরা একেবারে গোড়াতেই প্রচলিত ধারার নাট্যচর্চার বাইরে অবস্থান নিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নাট্যরচনার ধারায় ছোটখাটো বিপ্লবই ঘটে যায়। মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ নাট্যকারদের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কেননা স্বাধীনতা যুদ্ধ তো কোনো সামান্য ঘটনা নয়। এই পর্যায়ে আগমন ঘটে তরুণ নাট্যকারদের। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন– সেলিম আল দীন, আল মনসুর, হাবিবুল হাসান, কবীর আনোয়ার, মামুনুর রশীদ প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে বেশ কিছু নাটক রচনা করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে নাটক লিখেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ নাট্যকার মমতাজ উদ্দীন আহমদ যুদ্ধোত্তর সমসাময়িক জীবন, সামাজিক অসঙ্গতি, পারিবারিক অবিচার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি নিয়ে নাটক লিখেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। মামুনুর রশীদ শ্রেণি-সংগ্রাম, সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ, মধ্যস্বত্বভোগী, দুর্নীতিপরায়ণ আমলা, নৈতিকতাহীন রাজনীতিবিদ এবং মৌলিবাদী চক্রান্ত নিয়ে লিখেছেন।

সেলিম আল দীন তাঁর প্রথম পর্বের নাটক রচনার পূর্বেই ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের নানা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি প্রথম নাটক রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বের ধারায়। মুক্তিযুদ্ধের পরে তিনি যখন নাটক লেখা শুরু করলেন, তখন অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকই লিখেছেন। একথা স্বীকৃতি যে, বিমূর্ত বা আবসার্ড রীতির জন্মই মূলত হতাশা থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের চিন্তার সাথে এই বিমূর্ত রীতি। রয়েছে একটি বিরাট যোগসূত্র। RwÛm I wewea †ejb এবং msev‘ KvUb নাটকে ইউরোপীয় নাট্যঙ্গিকের অ্যাবসার্ড বা বিমূর্ত রীতি অনুসৃত হয়েছে। তবে শুরু থেকেই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ইউরোপীয় নাট্যপ্রভাব থেকে বের করে আনার জন্য সক্রিয় হয়েছিলেন। একারণেই দেখা যায় RwÛm I wewea †ejb নাটকের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নভঙ্গ। দেশজ প্রেক্ষাপট ও দেশীয় সমস্যা নিয়ে আলোচ্য নাটক। মুক্তিযোদ্ধারা যখন অস্ত্র জমা দিয়েছে আর তখন অন্যদের হাতে ছিল অস্ত্র। অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের অনেককে গণপিটুনিতে মারা হচ্ছিল। এ রকম একটা সময়ে তিনি নাটকটি লিখেছেন। বাইরে তখন ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। এ নাটকে আছে সবার জন্ডিস হয়েছে এবং এর চিকিৎসা তো হচ্ছেই না, তার বদলে বেলুন দিচ্ছে। এককথায় এটাই নাটকের মূল কথা। কিন্তু অভিনবত্ব হলো এর কোনো সংলাপেই পরম্পরা নেই, ধারাবাহিকতা নেই। চরিত্রের নাম নেই, শুধু যুবকদের সংখ্যা বলা হয়েছে। যে চরিত্রের যা মনে হচ্ছে সেটাই সে বলছে যেমন :

প্রথম যুবক। সব জিনিসেরই উদ্বোধন বলে একটা কথা আছে। প্রথমে সংগীত– তারপর দ্বিতীয় যুবক। চকচকে ছোরা বের করে চোখের ইশারা দিয়ে শুরু করা যাক।

ধৃত- আমাকে- আমাকে আপনার খুন করবেন।

তৃতীয় যুবক। আজ খুব ফূর্তির দিন। খুন করবো কেনো? কৌতুক করবো। গেট রেডি।

দ্বিতীয় যুবক। আয়োডিন ব্যান্ডেজ।

তৃতীয় যুবক। চমৎকার হবে। ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ নিহতের সংখ্যা ১০০ এবং তার পরপরই রেডক্রস রিলিফ হা হা হা।[৫]

সেলিম আল দীনের প্রথম পর্বের অন্যান্য নাটক bxj kqZvb: ZwnwZ BZ¨w`, G·‡cøwmf I gj mgm¨v, mc welqK Mí, Kwig evIqvjxi kÎæ অথবা gj gL †`Lv, msev` KvUb ও gbZwmi প্রভৃতি নাটকে তিনি ইউরোপীয় অ্যাবসার্ড কিংবা অস্তিত্ববাদী রীতির প্রচলিত ধারা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু সৃজনের ভাঙন তাঁর অন্তর্গত সত্তায় ছিল ক্রিয়াশীল– ফলে পরিবর্তনের আভাস দিলেন AvZi Avjx‡`i bxjvf cvU নাটকে। এ নাটকেই প্রথম বাঙালির চিরায়ত গল্প কথনরীতির অনুকরণ গোচরীভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ উক্ত নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃদ্ধের সংলাপ :

প্রথম বৃদ্ধ ॥- দেখি অল্প দূরে- উজান বাইয়া যায় এক নাও। আনারসের নাও। তিনজন লোক- হাল হাতে একজন- আরজন, বৈঠা বায়। একজন আনারসের হেই উঁচা গাদি চাকুম চুকুম আনারস খায়। হাতের ছোরা মারে চকচক করে- সুজ্জি ডোবে রইদে ঝিলিক মারে আনারস। আমি কই - কই যাও গো- জবাব নাই।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ॥ কড়া পাক দেও [বিরক্তি]- হুঁম।

প্রথম বৃদ্ধ ॥ হঠাৎ দেখি- মাঝের লোকটা- লাফ দিয়া পড়লি বৈঠার উপর ছোরা দিয়া ফালি ফালি কইরা দিলো বুক সঙ্গীজনার বৈঠা খইসা গেলো- চিৎ হয়া ছটফট জান গেলো তার। গলুই ভিজা গেলো রক্তে। তারপর- আর কিছুই মনে নাই।[৬]

বক্ষ্যমান অংশে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির নাটকীয় ক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তার পরিবর্তে শ্রোতা আখ্যানের অবশিষ্টাংশ শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত– কারণ শ্রোতা ইতোমধ্যে গল্পে ঘটমান ক্রিয়াটির একটা সম্ভাব্য কল্পরূপ মানস চোখে এঁকে নিয়েছে। কথার সাহায্যে ঘটনার একটা কল্পচিত্র অঙ্কণ করা কষ্টসাধ্য কিন্তু তা দর্শকের চেতনায় নাট্যকাহিনির অন্তর্গত আবেগটি সঞ্চারিত করার এক অভিনব কৌশল বটে। সেলিম আল দীন নাটক রচনা করতে গিয়ে সচেতনভাবে নাটকের অঙ্ক, দৃশ্য এসব বর্জন করেছেন। এসব অনাবশ্যক রীতি মনে হয়েছে। তিনি এই রীতি বাদ দিলেন। AvZi Avjx‡`i

bxjvf cvU নাটকের পর gbZvwmi নাটকে তিনি নিরীক্ষা কর্মটি আরো ব্যাপক পরিসরে পরিচালনা করলেন। ঘটনার পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করলেন সংগীত। gbZvwmiকে মিউজিক্যাল কমেডি বলা হয়। বাংলাদেশের মানুষকে শিল্পরস দিতে তিনি ভিন্ন কিছু করার কথা ভাবছিলেন। gbZvwmi নাটকের মধ্য দিয়ে এই বাঁকটা নিয়েছে ঢাকা থিয়েটার। একটা আধুনিক নাটকে লোকগান সুর ব্যবহার করেছেন, যাত্রার ঢংটি ব্যবহার করা হয়েছে। gbZvwmর নাটকে পদাবলীর আঙ্গিক ব্যবহার করেন। উক্ত গীতরঙ্গটি একটি মঞ্চদৃশ্যে ধারণকৃত পূর্বক অনেকটা যাত্রাপালা অভিনয়ের আদলে পরিবেশিত হয়েছে। শহরের নাটকে এই ধরনের লোকজসুরের সংগীত সংযোজন ঘটানোর পর তা মঞ্চে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং ১৯৭৬ সালে নাটকটি বহুবার মঞ্চস্থ হয়। gbZvwmi নাটকের কাহিনি সমসাময়িক চোরাকারবারি, ঘুষখোর মুনতাসিরকে ঘিরে। নাট্য ঘটনা পরিত্যক্ত হয় নি তবে– গল্প বা আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হল চিত্র ও সংগীত। gbZvwmi নাটকে সেলিম আল দীনের নাট্যাঙ্গিকে মৌলিক পরিবর্তনের প্রথম স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে বাংলা নাটকের প্রধান পার্থক্যের একটি যে বাংলা নাটক সংগীতাশ্রয়ী। gbZvwmi নাটকে ইউরোপীয় অঙ্ক বিভাজন পরিত্যক্ত হয়েছে। নাট্যদৃশ্য কোনো প্রথাগত দৃশ্য বিভাজনরীতিরও অনুগামী নয়। কিন্তু নাট্যকারের নির্দেশনা দৃষ্টে দৃশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় অনায়াসে। নাট্যকার নিজেই gbZvwmi নাটকের আঙ্গিককে কাব্যনাট্য বলেছেন। এ নাটকে রয়েছে কবিয়ালি সুরে নার্স এবং ডাক্তারদের কথোপকথন। gZvwmi নাটকের ভাষা নিরাভরণ; বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে দৈনন্দিনতার মধ্যে গদ্যের সুরেলা রূপটি আবিষ্কারের প্রয়াস এ নাটকে আছে। gbZvwmi নাটকে যাত্রার সুর ব্যবহার হয়েছে উদ্‌বোধনী ঐকতানে। এ নাটকে বাংলা গানের তিনটি ধারার দক্ষ প্রয়োগ আছে। লোকজ সংগীত, রাগ-রাগিণী ও আধুনিক রীতি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অতুল, নজরুল ও রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও অনুকৃতি আছে। gbZvwmi নাটকে প্রথম নাট্যকার সংগীতনির্ভর সংলাপ সহযোগে নাট্যকাহিনি পরিবেশন করেন। 'নাচাও রাস্তা নাচা' শ্লোগান নিয়ে সেলিম আল দীন রচিত পথ নাটক PiKvKovi WK‡g›Uvix (১৯৭৭)। একদল দোহার আর একজন অভিনেতা আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ ও গান বাদ্য সহযোগে সড়কদ্বীপে অভিনীত হয়েছে নাটকটি। নাটকটি আঞ্চলিক ভাষায় বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে রচিত।

সেলিম আল দীন নাট্যচর্চার শুরু থেকেই ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন। gbZvm‡ii পরবর্তী নাটক kKšÍjv। এটি পুরাণাশ্রয়ী আধুনিক নাটক। kKšÍjvয় নাট্যকার নাট্যাঙ্গিকে বাঁক নিলেন। এই নাট্যে মিথকে তিনি ভেঙেছেন, বর্ণনাত্মক সংলাপ লিখেছেন। মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উপাখ্যান

এ নাটকের কাহিনির উৎস। স্বর্গীয় দেব-দেবীর প্রতি চিরকালীন বিশ্বাস এখানে প্রশ্নের সম্মুখীন। দেবতারা শুধু যজ্ঞের হোমাগ্নি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক মানবকল্যাণ সাধনে নিমগ্ন নন, তারা মর্ত্য মানবের মতো লোভ ঈর্ষা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ পরায়ণ। মানব সন্তান ঋষি– বিশ্বামিত্রের সাধনালব্ধ শক্তিতে ঈর্ষান্বিত আতঙ্কিত দেবকুল তাঁর তপস্যা ভঙ্গের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। kKš Í j৷ নাটক কথাটির বদলে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'দৃশ্যকাব্য'। স্বর্গ-মর্ত্যের চিরায়ত দ্বন্দ্ব নাট্যবস্তুর মর্যাদায় অভিষিক্ত। ফলে পুরাণ ভাবনা আধুনিক নাট্যকারের জীবনদর্শনে জারক রসে রঞ্জিত হয়ে নবযুগের মানুষের ভাবনার সঙ্গে সাক্ষীকৃত হয়েছে। সেলিম আল দীন kKš Í j৷ নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকের শৃঙ্খলার অনুসারী। কিন্তু ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত অঙ্ক দৃশ্যের বন্ধন অগ্রাহ্য করেছেন এবং তার পরিবর্তে আখ্যানকে মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে খণ্ড অভিধায় চিহ্নিত ও বিভক্ত করেন। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের গায়েন বা কথক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং নাটকে তার ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। কিন্তু প্রচলিত ইউরোপীয় রীতির বাংলা নাটকে গায়েন বা কথক চরিত্রের ব্যবহার অযৌক্তিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচনায় তিনি সংস্কৃত পুরাণ থেকে গৃহীত কাহিনি অবলম্বনে রচিত kKš Í j৷ নাটকে সূত্রধরের আদলে তার প্রয়োগ করলেন। kKš Í j৷ সেলিম আল দীনের আবির্ভাবের অভিজ্ঞান। কারণ তাঁর শিল্পীমানসের সবকটা প্রবণতা এ নাটকেই প্রথম দৃষ্ট হয়। স্বর্গ ও মর্ত্যের চিরন্তন বিরোধকে উপজীব্য করে রচিত kKš Í j৷ গীতল ও ধ্রুপদী ভাষারীতির সংলাপ কথনকে অবলম্বন পূর্বক নাট্যস্থিত চরিত্রাদির আবেগ নির্মাণ করেছেন।

ইউরোপীয় সমকালীন নাট্য আঙ্গিক থেকে kKš Í j৷ স্বভাবধর্মে স্বতন্ত্র। সমকালীন বাংলা নাটকের প্রবল ধারার বিপরীতে অবস্থান সুদৃঢ় করায় স্বসৃষ্ট পূর্ববর্তী নাটকের আঙ্গিকের বৃত্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন নাট্যকার। kKš Í j৷ নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাত– ঘটনা গতানুগতিকতা অনুপস্থিত। সেলিম আল দীন তাঁর নাট্যাঙ্গিকের নিরীক্ষা পর্বের প্রথম স্তর kKš Í j৷য় ধ্রুপদী ভারতীয় নাট্য আঙ্গিকের আধুনিক রূপায়ণ করেছেন। বাংলার লোক সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পরিবেশনা উপভোগ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বাংলা সাহিত্য পাঠের নিবিড় অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন একজন ঋদ্ধ মানুষ। সেলিম আল দীন পাশ্চাত্য প্রভাবিত শুরুটা হলেও স্ব-ভূমিতে ভিত্তি রচনা করতে খুব বেশি সময় নেন নি। মধ্যযুগের কাব্য গবেষণার পাশাপাশি অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাংলা নাট্য, বাংলা শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনভাবনার ঐতিহ্যবাহী স্বরূপ সন্ধানে। গ্রন্থে, আসরে, গৃহস্থের আঙ্গিনায় আর পথে পথে সন্ধান করে বেড়িয়েছেন বাংলা নাট্যের শেকড়। ফলে নাটকের বন্ধন ভেঙে

বেরিয়ে আসতে তৎপর ছিলেন। তাঁর নাট্যরীতির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় বর্ণনাত্মক রীতিতে নাটক লেখার মধ্য দিয়ে। wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j ও nvZ n‘vB রচিত হয় বর্ণনাত্মক রীতিতে। PvKv, ‰heZx Kb¨vi gb ও niMR কথানাট্য নামে এক বিশেষ শিল্পরীতির আশ্রয়ে রচিত। ১৯৭৩ সালে ঢাকা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা পর তাঁদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মঞ্চায়নের মাধ্যমে নির্মাণ করবেন নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সৃজন করবেন জাতীয় নাট্য আঙ্গিক ও অভিনয়রীতি। এছাড়া এদেশের নাটককে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট এবং বাংলা নাট্যের হাজার বছরের নান্দনিক পরিবেশনাকে বিশ্বমানের ও আধুনিক করে তোলার জন্য নিরলস সাধনা করেছেন। সেলিম আল দীন ও নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ নিজেদের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম থিয়েটারের (১৯৮১-৮২) মাটির চৌকাণা খোলামঞ্চে সন্ধান লাভ করেছেন এদেশের ঐতিহ্যবাহী কবিগান, গাজীরগান, হাস্তরগান, কিচ্ছাগান, পালাগান, রামযাত্রা, জারিগান, পুঁথিপাঠ, যাত্রাপালা, আলকাপ, গম্ভীরা, সংপালা, গীতিকা, পুতুলনাট্য প্রভৃতি নাট্যাঙ্গিকের বিচিত্ররীতি। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক ও অভিনয়শৈলীর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, যার শেকড় প্রথিত স্বভূমির উর্বর মাটিতে। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে হারিয়ে গিয়েছিল বাঙালির নিজস্ব নাট্যের আঙ্গিক আর নাট্যাভিনয় রীতি। তিনি অনুসন্ধান করেছেন বাঙালির শিল্পতত্ত্ব ও নন্দনভাবনা। আর তারই আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজস্ব শিল্পরীতির। নিজের নাটকগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করেছেন। বর্ণনাত্মক রীতির ধারণাটি তাঁর মধ্যে পোক্ত হয়েছিল এদেশের প্রচলিত বিভিন্ন লোককথা পরিবেশনা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে। বিশেষত ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এক ধরনের গল্পকথকতা আছে যাকে শাস্ত্রগান বা হাস্তর বলা হয়। মানিকগঞ্জের হাস্তরশিল্পী হাকিম আলী গায়েনের পরিবেশনা তাকে বর্ণনাত্মক আঙ্গিকে নাটক লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই অনুপ্রেরণা থেকে তিনি কথানাট্য ধারার নাটক লিখেছেন। wKËb‡Lvjv থেকে †KivgZg½j হয়ে nvZ n‘vB পর্যন্ত তাঁর তিনটি নাটকের কাহিনিই গড়ে উঠেছে বহু বিচিত্র খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের বন্ধনে। কোনো আদ্যন্ত কাহিনি নেই, বরং খণ্ড খণ্ড ঘটনার বিন্যাসই এ নাট্যত্রয়ীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথাগত নাটকের সুতীব্র ঘটনাবৃত্তের পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড ঘটনার বিন্যাসে নাটকীয় দ্বন্দ্বটি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পুরো নাটকে। তিনি মনে করতেন, যাত্রা পালা দিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাংলা নাটকের। আর যাত্রা মানেই ওপেন থিয়েটার। মঞ্চজুড়ে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করা। তাঁর মতে, বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের। হাজার বছরের বাংলা নাট্য-রীতিকে ধারণ করেই তিনি আধুনিক নাট্যকার হয়ে উঠেছেন। পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপরীতির বদলে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরুচির প্রেক্ষাপটে নতুন সংলাপরীতি। তিনি শিল্পের ভুবনকে খণ্ডিত করে দেখেন নি বলেই

তাঁর নাটকের বিষয়ভাবনায় একটি মহাকাব্যিক সমুন্নতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচ্যের শিল্পশৈলীর নিজস্ব রূপ ও রীতি নিয়ে তাঁর নাট্য ভাবনার বেড়ে ওঠা। তাঁর নাটকের দর্শনের শেকড় প্রথিত বাংলাদেশের সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী আখ্যান ও নাট্যরীতির গভীরে। মধ্যযুগের কাব্যসমূহ নাট্যমূলক, যা বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত। বিশ্ব নাট্যধারায় বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক কথাটির উদ্ভব আধুনিককালের নাট্য নন্দন-তত্ত্বের একটি পরিভাষা রূপে। কেউ কেউ ইংরেজি 'Narrative' শব্দটির সঙ্গে একে অভিন্ন মনে করে থাকেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় শব্দটির অর্থ-বর্ণনাত্মক, ঘটনার বিবরণমূলক বা কোনো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ। অপরদিকে বাংলা বর্ণনাত্মক শব্দটি এমন এক শিল্পবস্তুর অভিধা যা একইসঙ্গে শ্রবণমুখর শিল্পিত বর্ণনা, নাট্যগুণ সম্পন্ন সংলাপ, বিচিত্র মুদ্রার নৃত্য এবং বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে রচিত সংগীত সম্পন্ন আদি-মধ্য-অন্ত সংবলিত কাহিনির সমন্বিত রূপ।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অভিনয় একেবারে বিপরীতমুখী। বাস্তবের অনুকরণের ক্রিয়াকাহিনিকে পাশ্চাত্যে পাওয়া যায় চরিত্রের ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা হিসেবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যের অভিনয় হচ্ছে বর্ণনাকে ক্রিয়াতে রূপান্তর। প্রাচ্যের সহস্র বছরের নাট্যরীতি পর্যালোচনা করে এই বর্ণনাত্মক রীতিই প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচ্যের বর্ণনাত্মক অভিনয়ের যে সকল রীতিতে কথক বা গায়েন আছে তার কাজ বর্ণনাকে এমন একটা চলমানতা দান করা যা অনুকরণ সজ্ঞাত ক্রিয়া নয়, যা সুর ও ছন্দের অবলম্বনে ব্যাখ্যাধর্মী।

সেলিম আল দীন এর নাট্য প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় দ্বিতীয় পর্বের নাটক থেকেই শুরু হয়েছিল। এই পর্বেই বর্ণনাত্মক রীতিতে তিনি নাটকে নিয়ে আসেন বাঙালির জীবন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির স্বাদ-গন্ধ; উপরন্তু এ সময় থেকে তাঁর নাট্য পরিবেশনাতে ছিল ভিন্নতা; যে উপস্থাপন কৌশলে ছিল বাঙালিয়ানার ছাপ। তাঁর নাট্য চেতনার ভুবন গড়ে উঠেছে আবহমান বাংলা জনপদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্পর্শে। এক্ষেত্রে তাঁদের সংগঠন 'ঢাকা থিয়েটার' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চৌকোণা খোলা মঞ্চের ব্যবহার অর্থাৎ দেশীয় মঞ্চরীতির পুনঃপ্রবর্তন, গ্রামীণ মেলার আয়োজনসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। 'ঢাকা থিয়েটার নাটক মঞ্চায়ন ও নাটকের প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনায় একটি বিশাল বঙ্গদেশীয় ভূখণ্ডকে স্পর্শ করার প্রয়াসী।'[৮]

বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার এক বিশাল অঞ্চলের নানা পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনবাস্তবতা নিয়ে বর্ণনাত্মক রীতির ‡KËb‡Lvjv নাটক। এই নাটকের পট উন্মোচিত হয়েছে আবহমান বাংলার এক ঐতিহ্যবাহী মেলায়। মহাকাব্যিক আদলে লেখা ‡KËb‡Lvjv নাটকে আঙ্গিক নিরীক্ষার ব্যাপক বাঁক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নাট্যকার আলোচ্য নাটককে বলেছেন, এপিক

রিয়ালিজম। ধ্রুপদী মহাকাব্য বা ধর্মগ্রন্থের কাহিনি- অনুকাহিনির প্রেরণায় সমকালকে দেখানোকেই তিনি এপিক রিয়ালিজম আখ্যা দিয়েছেন। wKËb‡Lvjv নাটক বৌদ্ধজাতক এবং ওভিদের মেটামরফসিসের প্রেরণায় রচিত। wKËb‡Lvjv নাটকে আছে রূপান্তর। নাট্যকার এই নাটকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এরকম রূপান্তর দেখতে পেয়েছেন। জোতদারের কারণে কৃষক উচ্ছেদ হয়ে যায়। সামাজিক রূপান্তর ঐ কারণে। সোনাই হলো তাঁতি, তাঁতি হলো চাষী। চাষী হলো দিনমজুর, দিনমজুর হলো ফকির। প্রতিটি চরিত্র সমাজের কোনো না কোনো অংশ দিয়ে বদলে যাচ্ছে, রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে। মহাকাব্যিক বিস্তারে রচিত এই নাটকের পটভূমি একটা মেলাকে কেন্দ্র করে। আঙ্গিক নিরীক্ষায় এই মেলায় আছে নাগরদোলা, বায়োস্কোপ দেখানো, তাড়ি বিক্রি, জুয়াখেলা, লাউয়া মেয়েদের বেলোয়ারি সামগ্রী বিক্রি, খেজুরের রস ও মুড়কি মোয়া বিক্রির পাশাপাশি দেখা গেলো কবির লড়াই, যাত্রাগান। তবে শুধু মেলায় নাটকটি সীমাবদ্ধ থাকে না। তা সমগ্র বাংলাদেশের মানচিত্র হয়ে বিস্তীর্ণ জনপদের ছবি নিয়ে আর্বিভূত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিরাট একটা পরিবর্তন ঘটেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে wKËb‡Lvjv এভাবে বৃহত্তর জনপদ ও তার অধিবাসীদের দ্বন্দ্ব মুখর জীবনের বিচিত্র গল্প, অনুগল্পের সমন্বয়ে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তিতে কথা সরিৎসাগরে পরিণত হয়। তাতে তরঙ্গ তোলে লাউয়াদের জন্ম বিষয়ক মনসার পুরাণ, মাঝিদের সমুদ্রযাত্রার কাব্য mqdjgjK e‘D¾vgvj উপাখ্যান, হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন মুখোশের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের উপস্থিতি। wKËb‡Lvjv নাটকের মধ্যে পট বা বৃত্ত আদি-মধ্য-অন্ত এ্যারিস্টটলীয় বাঁধা ছকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কারণ নাটকটির মহা আয়তনের কারণে এবং অজস্র চরিত্রের উপস্থিতির ফলে শকুন্তলার মতো খণ্ড বিভাগ নয়, এখানে প্লট বিভাজিত হয়েছে মহাকাব্যের সর্গবন্ধে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষকে স্বরূপে তুলে আনতে হলে অপরিহার্যভাবেই তাদের নিজস্ব ভাষায়ই তাদের বক্তব্য তুলে ধরা কর্তব্য। আলোচ্য নাটকে আঞ্চলিক ভাষায় কাব্যিক দ্যোতনা সৃষ্টি ও তাকে সর্বজনবোধ্য করে তুলেছেন নাট্যকার। যেমন :

> “ভাঙ্গরে তখন দিনে দশবিশ গণ্ডা কোঁচ টেটা বেচছি।”– পরাণ বলে।
>
> মিরকি বিলের মাছে পাতিল উপচায়া পড়তো।
>
> আহা রে ধন্যাপাতা মোড়ায়া বোয়ালের পেডি খাইতে মন চায়।
>
> তা হাঁপানির জন্যি খাইতে পারি না।
>
> –হরেকৃষ্ণ বিড়বিড় করে।

> কামারদের চালার পরেই দুই সার দোকান বসেছে। চারপাশটা খোলা। মাথার উপরে চাটাইর আচ্ছাদন। নতুন কাঁচা বাঁশের গন্ধ লাগে নাকে। আট দশটি দোকান। খেলনা-মুখোশ-চুড়ি-ফিতা-মাটির পুতুলের দোকান।[৯]

wKËb‡Lvjv নাটকে সংলাপের পাশাপাশি তিনি নাটকের মধ্যে নিয়ে আসেন কথা-সাহিত্যের বর্ণনাধর্মিতা। তিনি মনে করেন চেতন-অবচেতনের অনেক কিছুই সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই অভাববোধ থেকেই তিনি বর্ণনামূলক নাট্যরীতির প্রবর্তনের প্রয়াস পান। wKËb‡Lvjv নাটকে সংলাপের চেয়ে বর্ণনার দিকেই বেশি ঝোঁক। এই নাটকে পটভূমির উপস্থাপনা যেমন ভিন্ন তেমনি সংলাপ উপস্থাপনাও ভিন্ন। সেই কারণে চরিত্রগুলোর বিকাশও মঞ্চে ঘটেছে ভিন্নভাবে। খুব যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ঘটেছে এই বিকাশ তা কিন্তু নয়। ডালিমন, বনশ্রী, অথবা সোনাই কিংবা ইদুল হক, শামসুল বয়াতি– চরিত্রের বিকাশ আলাদা রকমের। প্রচুর গানের ব্যবহার wKËb‡Lvjvয় রয়েছে। এটি আমাদের লোক নাট্যরীতি থেকে নেওয়া। এদেশের পালাগান কখনো কথা বলছে, কখনো গীত হচ্ছে, কখনো নাচ। wKËb‡Lvjv কোনো একক রেখার নাটক নয়। কবিগানের লড়াই, পুঁথিপাঠও wKËb‡Lvjvq দেখা যায়। wKËb‡Lvjv নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন– ÔwKËb‡Lvjv– রচনার ভেতর দিয়ে আমি বিশ্ব শিল্পধারার সকল প্রাচীন সকল বর্তমানকে নিজের করে যেনবা চিনতে পেরেছিলাম। সেই পথেই বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরীতির সন্ধান এবং পরবর্তীকালে বাঙালীর সর্বপ্রাণবাদী তত্ত্বের খোঁজে।'[১০] মূলত wKËb‡Lvjv নাটকের গঠন পদ্ধতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পূজাউৎসব কেন্দ্রিক নাট্যাঙ্গিকের রীতি ব্যবহার করেছেন। এটাকে দেশজ রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যসমূহ শাবিরিদ খান এর we‘¨vm›‘i, kxKòKxZb, পাঁচালি, যাত্রা ইত্যাদি অনুসৃত হয়েছে।

ইউরোপীয় নাটকের তীব্র ঘটনাবৃত্তের বদলে এ নাটকের কাহিনিকে মঙ্গলকাব্য বা গাজীর গানের গল্প গাঁথুনির সমান্তরাল করে তোলা হয়েছে। wKËb‡Lvjvq সর্গ বিভাজন দৃশ্য বিভাজন নয়। উপরন্তু সর্গকে অঙ্ক ধরলেও দেখা যায় যে, এতে কোনো গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্যভাগ নেই। দৃশ্য বিভাজন ইউরোপীয় নাটকের জন্য প্রয়োজনীয়। দৃশ্য বিভাগের প্রয়োজন হয় ঘটনার ঐক্য ও সময়ের ঐক্যের কারণে। ভারতীয় রীতিতে ঘটনার ঐক্যে দৃশ্যভাগের দরকার হয় না। কেননা লোকজ যাত্রাপালার দিকে তাকালে দেখা যায় যাত্রার আঙ্গিক সরল। বর্ণনামুখীন সে রীতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর wemRb পরবর্তী নাটকে দৃশ্যপটের বাহুল্য বর্জন করেছেন। বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। বাংলা নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না– নৃত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগে

Dhaka University Institutional Repository

নাটক হয়ে ওঠে মঞ্চের অলংকার। গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তাই দেখা যায় গানের উজ্জ্বল ব্যবহার। সেলিম আল দীনও আঙ্গিক নিরীক্ষায় রবীন্দ্র অনুসারী। wKËb‡Lvjvয় এসে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বাংলা নাট্যাঙ্গিক এবং অভিনয় নির্দেশনার মূল ভূমিটি। মধ্যযুগের বাংলা নাটকের সংগীত ও বর্ণনাত্মকরীতির সঙ্গে এ নাটকে মিশ্রিত হয়েছে শিল্প সমৃদ্ধ উপাখ্যানের কাঠামো। প্রাচ্য অভিনয়রীতির কথকতা, মঙ্গলগান বা গাজীর গানের অভিনয় রীতির অনুষঙ্গ। wKËb‡Lvjv নাটক লেখার পর অনেক সমালোচনা হয়েছে। অনেকে একে নাটক বলতে নারাজ। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল :

> আমি শিল্পে আঙ্গিক লোপের প্রেরণায় কাজ করি। এবং শিল্পের নানান মাধ্যমে পৃথকীকরণে বিশ্বাসী নই। শিল্পে আমি দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতে উপনীত হতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, আঙ্গিকের মধ্যেই আঙ্গিক-বিনাশী শক্তি আছে। তাকে চিনতে গেলেই দেখা যায়, সর্বত্র সে অবিনীত দৃঢ় মূর্তি। শিল্পের নিয়ম তার জন্য। অথচ সে শিল্পসংহারী। wKIb‡Lvjv নাটক রচনার সময় আমার আবিষ্টতা এমন এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিলো, যাতে নানা শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে আমার নৈয়ায়িক ভেদবোধ লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। ১৯৮১-৮২ সালে আমার মনে হয়েছিলো কোথাও লেখাটা প্রচলিত অর্থে নাটক থাকছে না। তখন আমার প্রধান কাজ ছিলো আঙ্গিক ভাঙার কাজটি চূড়ান্ত করা। শিল্পীর কাজ আঙ্গিকের মাধ্যমে আঙ্গিক ভেঙে তার নিজস্ব সৃষ্টিকে শিল্পতীর্থে পৌঁছে দেয়া।[১১]

মূলত ১৯৮২ সালে নাট্যকার মানিকগঞ্জ জেলার তালুকনগর গ্রামে আজহার বয়াতীর মাঘী মেলায় গাজীর গানের পরিবেশনা দেখেছেন। অন্ত্যমিল পূর্ণ কাব্যিক শব্দমালার বর্ণনা, গীত ও নৃত্যমূলক দেহ সঞ্চালন সহযোগে হাজারো দর্শককে তা বিমুগ্ধ করে। এক গ্রামীণ গায়ক কথকের সুরেলা বচন আর নৃত্যমূলক আচরণের যুগলবন্দিতে উপস্থাপিত গাজীর গান এই জনপদের হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের অমিত শক্তির নান্দনিক রূপ। আজহার বয়াতির মাঘী মেলার চৌকণ খোলা মাটির মঞ্চে সেলিম আল দীন বাংলা নাট্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য, বাঙালির শিল্পদর্শন ও নন্দনভাবনার যে সন্ধান লাভ করেছিলেন তারই নান্দনিক নির্যাসে সৃজিত হয়েছে wKËb‡Lvjv নাটক। ঔপনিবেশিক ভাবধারার শিল্পরীতি থেকে মুক্ত হয়ে এদেশের নিজস্ব লোক আঙ্গিক তথা ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতি ও শিল্পআঙ্গিক পুনরাবিষ্কারপূর্বক সেগুলিকে নাটকে ব্যবহার করেন। wKËb‡Lvjv নাটকে gqgbwmsn MxwZKvর অন্যতম †‘Iqvbv gw‘bvi কবি প্রস্তাবনা অবলম্বনে সেলিম আল দীন তাঁর wKËb‡Lvjv নাটকের আসর বন্দনা করেন :

সভাজন পদে আমি মিন্নতি জানাই
আমি যে বান্ধুম কিসসা হেন সাধ্য নাই।

অল্পমতি অল্পজ্ঞানী দীন হীন আর
এই সভায় কইতে কিসসা কি শক্তি আমার।
দশজনে ধইরাছুন মোরে না দেখি উপায়।
তব যে ভরসা আছে আল্লার কিরপায়।[১২]

অষ্টাদশ শতকের গীতিকার রচয়িতার আসর বন্দনা বা প্রস্তাবনা তিনি দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেন। এছাড়া wKËb‡Lvjv নাটকের নানা অংশে ভাষ্যের স্থান দখল করেছে চিত্র। মুখোশ প্রসঙ্গে নাট্যাংশে নাট্যকার ঘনিষ্ঠজনের মতো দর্শককে সম্বোধন করেন চিত্রের রহস্যবোঝার নিমিত্তে: 'আর দেখ বাঘ মানুষের মুখোশগুলি, হাযির আলীরও মনির আহাম্মদ এর দোকান। ... রাত্রি গাঢ় হলে দর্শকের স্মৃতিতে সেগুলি বিশাল ও বাস্তব হয়ে যাবে। তার রঙ ও প্রকৃতি হয়ে উঠবে রহস্যময়ী।'[১৩]

†KivgZg½j মহাকাব্যিক আয়োজনের নাটক। মহাকাব্যের মতোই †KivgZg½j এর বিস্তার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালব্যাপী। নাট্যকাহিনির নামকরণে সেলিম আল দীন সচেতনভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার রীতি অনুসারে করেছেন। এর কাহিনিতে মহাকাব্যিক আবহে নাট্যকার অনেক চরিত্রের আমদানি করেছেন। এসব চরিত্রের ছোট-খাট সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনিকে গতিশীল রেখেছেন এবং একটি বিশেষ ঐকতান সৃষ্টি করেছেন। †KivgZg½j নাটকে এগারটি খণ্ডে আলাদা আলাদা মূলকাহিনি ও উপকাহিনি আছে। তবে সকল কাহিনির মধ্যে নাট্যকার একক ঐকতান সুকৌশলে সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া এ নাটকের ঘটনা ও কালগত ঐক্য রক্ষিত হয়েছে। বিশাল কাহিনিতে সমগ্র বাংলাদেশই যেন উঠে এসেছে একটি অখণ্ড মূর্তিতে। ‡KivgZg½j এর কাহিনিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, আদিবাসী হাজং, গারো, জমিদার, প্রজা, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, রাজনীতিবিদ, কৃষক, মাঝি থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবীর চালচিত্র নাট্যঘটনায় উপস্থাপিত হয়েছে। কেরামত এই মহাকাব্যিক কাহিনির কথক। কেরামত বাংলা-জনপদের অতীত ও বর্তমান মানচিত্রের ওপর দিয়ে হেঁটে চলা এক পথিক। নাট্যকাহিনিতে কেরামতের কখনো সক্রিয় অংশ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটিকে নাট্যকার দর্শক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পথের দুধারের দৃশ্য দেখে চলেছে অবিরাম কেরামত। তার দেখা এ জনপদের ইতিবৃত্ত সেলিম আল দীন মোট এগারোটি খণ্ডে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। নাটকের প্রতিটি খণ্ডে যে জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা প্রতীকী অর্থে দোজখসদৃশ। কেরামত যেন এই দোজখসদৃশ রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করে চলেছে স্বর্গের সন্ধানে।

wKËb‡Lvjv নাটকের শিল্পসিদ্ধি ও আঙ্গিক নিরীক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন হলো †KivgZg½j-এ গল্পের গঠন রূপের বিচারে পূর্ববতী নাটকের সর্গ এর স্থান দখল করল খণ্ড অভিধা। কাহিনিবৃত্ত বিস্তৃত হলো বিশাল এক জনপদে। বর্তমানে শেরপুর জেলার নখলা নামক স্থানে চৈত্র মাসের এক রোদ তাতানো সকালে কিশোর কেরামতের কাকতাড়ুয়া বানানোর মধ্য দিয়ে তার উন্মোচন (†KivgZg½j-১) আর নাট্য কাহিনির পরিসমাপ্তি 'চানতারা' খণ্ডে (†KivgZg½j-১২)। বারোখণ্ডে সমাপ্ত নাট্যকার ‡KivgZg½j নাটকে মহাকাব্যতুল্য ব্যাপ্তি ও গভীরতায় ধারণ করতে চেয়েছেন জনব্যক্তিবর্গের জীবন, এদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি। এ নাটক আছে ধ্রুপদী জীবনদর্শনের আলোয় সমকালীন জীবনকে দেখার প্রয়াস, ফলে নাটকটিতে আঙ্গিকের নিরীক্ষা হয়ে ওঠে বিচিত্র। কেরামতের সঙ্গী হিসেবে এনেছেন আদমসুরত বা আকাশের তারা, যাকে কালপুরুষ বলা হয়। †KivgZg½j এর প্রেরণাস্থল কোরান শরীফ বর্ণিত সপ্ত দোজখ। নাটকের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের বন্ধন ভেঙে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। †KivgZg½j-এ মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে রয়েছে কাহিনি ও অনেক অনুকাহিনি তেমনি †KivgZg½j-এ অনুসৃত হয়েছে।

†KivgZg½j নাটক রচনার সময় নাট্যকার বাংলাদেশের মানচিত্র এবং ভূগোল পাঠ করেছেন গভীরভাবে। আর এর উপাখ্যান রীতিটা মঙ্গলকাব্য রীতি থেকে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলে যেমন সর্গ এবং মর্ত্যের বিভাজন থাকে, তেমনি †KivgZg½j-এ আছে। যেকোনো মঙ্গলকাব্যেরই একটা অংশ থাকে স্বর্গের, একটা অংশ থাকে মর্ত্যের। কিন্তু এখানে দেব-দেবী নেই, তবে সেই কর্মটা নাট্যকার গ্রহণ করেছেন ভিন্নভাবে। কেরামতের সঙ্গী হিসেবে এনেছেন কালপুরুষকে। সে তার সব অভাব, অভিযোগ অনুযোগ কাল পুরুষকে জানায়। কেরামত তার স্ত্রী নূরজাহানের লাশ নিয়ে গভীর রাতে আদম সুরতের কাছে আহাজারি করে। যেমন :

> কেরামত। বুঝছ গো। যহন কলমা অইল- রক্তে গরম ছুইটা গেল– মন কইল আইজ তর বাসর কেরামত। আমি গঞ্জ থনে মজলরে দিয়া এট্টা সুগন্ধি কিনাইছি। ইচ্ছা আছাল তর সারা শলে– মাখায় দিমু। কাফন তুলে। কিয়ের কাফন। মানি না। সুগন্ধি মাখায়। আমি কি শ্যাষ গণ্ডী পারারার পারমু না। ছবরালীর পুত- গণ্ডির কি শ্যাষ আছে! এই যে শুঁকি তর শরীল শুঁকি। যহন জলসুহার গাঙ্গে ভাসবো নাও। লাশ উঠবো- গোরুর গাড়িতে যাবো কুসুমপুরে। আমারে মাফ করিস। তরে বুহে পেষনের নিগা বুকটা কেমন জানি করতাছিল। অহন তরে শুঁকি- ঘেরান নেই। ঘেরান কি জান্ত শরীলের লাগল পাওয়া যায়। কী য্যা। বেবাক রক্ত কি বিছানে পড়ছে- হেই যে হাসপাতালে রক্ত দিছিলাম- তার কি কিছু নাই- ও বউ - ও বউ- তার কি কিছু নাই। যদি থাহে কুসুমপুরের গোরের

> ভিতরে আমার রক্ত পঁচবের আর আমি তহন অন্য হানে অন্য দেশে। -হে হে হে নিলা নিলা গো আদম সুরত তোমাগো খোদা মিয়ার নিলা।[১৪]

সেলিম আল দীন ‡KivgZg½j নাটকে চরিত্রের মুখে নখলা, বিরিশি, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব একটি স্টাইল তিনি তৈরি করেছেন। এক্ষেত্রে নাট্যকারের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> উপরন্তু বাঙলা গদ্যের মধ্যে যে ঔপনিবেশিক চিহ্নগুলো বিদ্যমান বাঙলা ভাষার চরিত্র বিবেচনায় আমি পরবর্তীকালে যাকে অনর্থক গ্রহণ বলে মনে করেছি- যেমন কমা সেমিকোলন- প্রশ্ন ও হর্ষ বিষাদ চিহ্ন- শব্দ সংযুক্তি চিহ্ন- হাইফেন এগ্রন্থ মধ্যেও বর্জিত হলো। এতে পাঠকের পড়ন অভ্যাস পীড়িত হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। বাঙলা ভাষায় একটি ড্যাশ চিহ্ন এবং পয়ারের অর্ধযতি চিহ্ন দাঁড়ি রূপে ব্যবহার করলে আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না বলেই আমার ধারণা।[১৫]

সেলিম আল দীন রচিত সমুদ্র উপকূলীয় এলাকার আঞ্চলিক ভাষার নাটক nvZ n‘vB। nvZ n‘vB বর্ণনাত্মক রীতির নাটক। এ নাটকে নাট্যকার বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রান্তিক মানুষের জীবনসত্য ও জীবন সংগ্রামের বাস্তব আলেখ্য উপস্থাপন করেছেন মঙ্গলকাব্যে গঠনরীতি অনুসরণ করেছেন। দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রতীরবর্তী চর অঞ্চলের জনপদের নাটক nvZ n‘vB। এ নাটকে আরব্য রজনীর গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী গল্পরীতির সঙ্গে সুফীতাত্ত্বিক দেহবাদ আশ্রয়ে জীবনদর্শনের প্রাচ্য রূপ ধৃত হয়েছে। দেহবাদে বলা হয় মানবদেহে সপ্তসমুদ্র, হাতের ভাগ্যরেখা অসংখ্য নদীনালার মতো। মানুষ সেই ভাগ্যের নদী অতিক্রম করতে চায় বারবার। ফলত nvZ n‘vB নাটকে শুনি শত শত মানুষের স্বপ্নভাঙার আহাজারি, বঞ্চিত জীবনের ব্যর্থতাজনিত হাহাকার। সকলেই তারা ভাঙা মানুষ। এ নাটকের মধ্যমানব আনার ভান্ডারি। একজন প্রবীণ মানুষ জীবনের পথে তারুণ্য লাভ করেছে। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনপ্রীতির একটি অভূতপূর্ব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

nvZ n‘vB নাটকের নাট্যপর্ব ষোলোটি পর্বে বিভক্ত। বর্ণনা, নৃত্য, সংগীত ও কথকতার আশ্রয়ে সহস্র মানুষের কলমুখর জনপদের জীবন্ত চিত্রে পরিণত হয়েছে nvZ n‘vB। ‡KivgZg½j এর কাহিনির খণ্ড বিভাজন এখানে পরিত্যক্ত হয়েছে ‘পর্ব’ এই পরিভাষা দ্বারা। এখানে কাহিনি পর্বের অভ্যন্তরে রয়েছে বেশ কিছু উপ-পর্ব। মোট একুশটি জোয়ার এবং উনিশটি ভাটায় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জোয়ার এবং ভাটা উপকূলীয় জীবনের সকল প্রকার কর্মের নিয়ন্ত্রক, সুতরাং তাদের জীবনকাহিনির উপস্থাপনায় জোয়ার ভাটার আশ্রয় সে কারণেই শিল্পসম্মত বিবেচনা করেছেন নাট্যকার। ঢাকা

থিয়েটারকে ঘিরে একটি ভিন্ন ধারার নাটক রচনার অভিনবত্ব দেখিয়েছেন সেলিম আল দীন। এই নাট্য সংগঠনটি তাই তাঁর নাট্যপ্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাট্যকার বলেছেন :

> ঢাকা থিয়েটারই বাংলা নাটকে প্রথম জাতীয় আঙ্গিক ও বর্ণনাত্মক রীতির ব্যবহার করেছে। আমরাই প্রথম সচেতনভাবে ইউরোপীয় উনিশ শতকের অন্ধ আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করি। জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক বলতে আমরা কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকের কথা বলি না। বরং প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম ও লোকাচারসহ নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল উপাখ্যান ও কৃত্যের জন্ম হয়েছিলো, সে সকল বিষয়ই হচ্ছে জাতীয় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। wKËb‡Lvjv নাটক রচনার সময় মনে হয়েছিলো, ইউরোপীয় নাট্যরীতির একমুখী কাহিনীর সঙ্গে বাংলা নাটকের বিরোধ রয়েছে। g½jKv‡e¨ রয়েছে কাহিনী ও অনেক অনুকাহিনী। বিশাল বিস্তারে রচিত হয় এ বিশাল কাব্য। wKlb‡Lvjv ও পরবর্তী দুটি নাটক †KivgZg½j ও nvZ n‘vB রচনার সময় মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুসরণ করেছি।[১৬]

nvZ n‘vB নাটকে ধবল চরের ক্যানভাসে উপকূলীয় জীবনের বিচিত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনচিত্র মূর্ত হয়েছে বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গসঙ্কুল পরিবেশে। একটি বিশাল জনপদের মানুষের ভাঙা জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রণয়-বিচ্ছেদ এবং আত্মপরিচয়জনিত সংকট বড় ভয়ংকর রূপে চিত্রিত। উক্ত জীবনকে যথাযথ রূপায়ণে সেলিম আল দীন যে ভাষ্য রচনা করেন তাতে মিশে থাকে সমুদ্রজলের নোনা গন্ধ, শ্রমজীবী জনতার স্বেদ লাঞ্ছিত শরীরের গ্রন্থিল পেশির কাব্যকথা। খেলাধন মাঝির সর্বকনিষ্ঠ সংসার সুখবঞ্চিতা নিরুপায় স্ত্রী চুক্কুনীর ঘর ছেড়ে অজ্ঞাত পথে যাত্রার দৃশ্য মূলত রচয়িতার ভাষ্যরূপে চিত্রে ধৃত হয়: ‘ঠিক ঠিক পৌঁছাইলাম আমি ইজ্জতপুর রাইত শেস। দিনে দিনে আঁডি আইলাম চরজাকিয়া। খালি খাল দাদা- এই চিকন খাল-দশ কদম গেলে মাত্র খাল।’[১৭] nvZ n‘vB নাটকে নাট্যকার সমুদ্রোপকূলবর্তী সংগ্রামশীল লোকজীবনে অনুষঙ্গগুলিকে বিপুল উৎসব মুখরতায় তুলে ধরেছেন। চরবাসীর জীবনের আনন্দ উল্লাস ভেড়ার লড়াই, বলী খেলা, কাছিম শিকার, মোরগের লড়াই, ঘুড়ির লড়াই, বিয়ের নানা হইহুল্লোর ও গান, অন্ধকারে হারিকেন জ্বালিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদির উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বাংলা নাট্যরীতির মূল বৈশিষ্ট্যাদি নাচ-গান ও বর্ণনার সমন্বয়ে প্রণীত হয়েছে nvZ n‘vB নাটকের অভিনয় শৈলী। বাংলা নাট্যের সংগীতাশ্রয়ী প্রবণতার বহুমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায় nvZ n‘vB নাটকে। বাংলা নাটক দৃশ্যনির্ভর নয়, মূলত শ্রুতিনির্ভর। বাংলা নাট্যাঙ্গিকের মূল উৎস ও নিয়ন্ত্রক হচ্ছে সংগীত। সংগীতের প্রভাবেই বাংলা নাটক সম্পূর্ণত বর্ণনাত্মক ভঙ্গিটি অর্জন করেছে। পৃথিবীর আর কোনো নাট্যাঙ্গিক বাংলা নাটকের মত সংগীতসমৃদ্ধ নয়। সংগীতের ব্যাপক

প্রয়োগে বাংলা নাটক হাজার বছর ধরে মঞ্চে দর্শকের চোখ ও কানকে ঘটনার তীব্রতা থেকে মুক্ত রেখেছে। nvZ n‘vB নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে মাঝিদের নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। যেমন :

মন তুমি বুঝ নারে।
মন পবনের ঘোড়া রে ভাই
পবনে ধরে জীন রে-পবনে ধরে জীন
দিল পবনের ঘোড়া আমার- চইলছে রাইত দিন
মন তুমি বুঝ নারে॥[১৮]

nvZ n‘vB এর কাহিনিস্রোত নাবিক জীবনের কথা। এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই প্রেমিক, জীবনকে তারা ঘাটে ঘাটে বিক্রি করে বেড়ায়। আপাতভাবে এখানে নাট্য-সংঘাত কম মনে হলেও গল্পের গাঁথুনি অনেক মজবুত, কেননা অনেকগুলি নারী ও পুরুষের সম্পর্কের দ্বন্দ্বে কাহিনিটি সমৃদ্ধ। পাপপুণ্যের ধারণাকে ভেঙে দিয়ে, মৃত্যুর আচ্ছন্ন বিকলতাকে অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রায় কাহিনির সমাপ্তি। nvZ n‘vB নাটকের পাঠ শুরু হয় প্রস্তাবনা দিয়ে। তারপর এক থেকে পনেরো পর্যন্ত এর কাহিনিক্রম ছড়ায়। এক থেকে চৌদ্দর আরম্ভ দিনরাত্রির ভিন্ন ভিন্ন পর্বে জোয়ার-ভাটার সময়ের উল্লেখ দিয়ে। পনেরোয় সে উল্লেখ থাকে না। তার আরম্ভে জানানো হয়, আনার ভাণ্ডারি সমুদ্র ভ্রমণের গল্প শুরু করে। নাটকে গল্পের সংখ্যা একটি দুটি নয়। পাত্র-পাত্রী ধরে ধরে গল্পের শুরু আর বিস্তার। কোনো গল্প বৃত্তের পূর্ণতা পায়, কোনোটি পায় না। এই নাট্যের চরিত্রসমূহই এক একটি গল্প। চরিত্রসমূহের আশ্রয়ে বাংলা বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির আঙ্গিক ও দর্শনগত শিল্পকৌশলকে অবলম্বন করে গল্পকথনরীতির ধারাবাহিকতা এবং সৃজন করেছেন জীবনের বহুমাত্রিক রঙাশ্রিত বর্ণিল নাট্যমুহূর্ত। উপকূলীয় অঞ্চলের জনপদের মানুষকে ভিন্ন রীতি ও ভাষায় অভিনব এক আখ্যান নাট্যরূপে বয়ন করেন অনেকটা কিসসা কাহিনি বয়ানের মতো। nvZ n‘vB রচনার মধ্য দিয়ে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তিনি নিজে একটি বৃত্তপূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সাহিত্যসমালোচক তাঁর এই ত্রয়ী নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন :

> এই ট্রিলজি রীতিতে বর্ণনাত্মক, রূপে কথানাট্যস্পর্শী, শিল্পদর্শনে ধ্রুপদী বাস্তবতার অনুসারী। গ্রাম বংলার মানুষজন ও জনমানুষের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে সেলিম আল দীন ট্রিলজিতে যে দৃশ্যকাব্য রচনা করেছেন তা তাঁর শিল্পতত্ত্বের মূলসূত্র তথা কথক-ভূমিকারই পোষকতা করে- সেই রকম কথক যিনি লোকজ জীবন ও বৃত্তের বিচিত্র অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে খুঁজে নিতে

> চান তাদের মধ্যে লুকানো মহাকাব্যিক চেতনা। এই কথক- সত্তা ও মহাকাব্যিক চেতনা তাঁর ট্রিলজির মূল সংবেদন।[১৯]

মূলত আমাদের দেশে গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার সঙ্গে সেলিম আল দীনের nvZ n‘vB নাটকের শৈলী নিরীক্ষার সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যায়। পদ্মা পুরাণ আখ্যানের জনপ্রিয় পরিবেশনা রীতির মধ্যে ভাসান যাত্রা অন্যতম। কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ অঞ্চলে গীতি-নৃত্য আশ্রিত বর্ণনাত্মকরীতির ভাসান যাত্রার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া উক্ত অঞ্চলে জনপ্রিয় নাট্যধারা গাজীর গানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। গাজীর গানের সমগ্র আখ্যান সাধারণত বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক অভিনয়ের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মূলত ঢোল, করতাল, মন্দিরা ও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হয়। বর্ণনাত্মক গীত, সংলাপাত্মক গদ্য ও সংলাপাত্মক গীতের সমন্বয় ভাসান যাত্রা পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভাসান যাত্রায় বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য স্মরণীয় :

> ভাসান যাত্রার প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে থাকে বর্ণনাত্মক অভিনয়। তবে, অধিকাংশক্ষেত্রে পদ্য ও গীতের যৌথ পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক অভিনয়ের পর পরিবেশিত হয় সংলাপাত্মক অভিনয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ের এই পরিবর্তন মুহূর্তে আঙ্গিক বা বাচিক অভিনয়ে বিশেষ কোনো প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনেতা বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তার নির্দিষ্ট ক্রিয়া অনুসারে অভিনয় শুরু করেন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাদ্যযন্ত্রীদের ভূমিকা সুস্পষ্ট। বাদ্যযন্ত্রী তাদের বাদ্যে জোরালো আওয়াজের মাধ্যমে সংলাপাত্মক পরিবর্তনকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। সংলাপাত্মক গদ্য ও সংলাপাত্মক গীত বা গীত সংলাপ ভাসান যাত্রা পরিবেশনার মুখ্য বিশেষত্ব। তবে, সংলাপাত্মক অভিনয়ের মধ্যে বর্ণনাত্মক গীত অভিনয়ের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।[২০]

সুতরাং দেখা যায় nvZ n‘vB নাটকের কলাকৌশল ভাসান যাত্রা কিংবা গাজীর গানের পরিবেশনারীতির সঙ্গে মিলে যায়। তাই বলা যায়, হাজার বছরের সংস্কৃতির ধারায় লালিত বাঙালির বর্ণনাত্মক অবয়বে যে অভিনয় বা নাট্যদর্শন তার ধারাবাহিকতা নাট্যকার ধারণ করেছেন। nvZ n‘vB নাটকে বাংলাদেশের ফেনী-নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বৃহত্তর নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলের ভাষার নানান বিচিত্র বিভঙ্গ আছে। এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম কিংবা এ চরের সীমানা পেরিয়ে আরেক চরে এক একটি শব্দের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। এমনকি

উচ্চারণগত ভিন্নতাও পরিদৃষ্ট হয়। সে বিষয়টি স্মরণে রেখে nwZ n‘vB এর ভাষা ও সংলাপ নির্মাণ করা হয়েছে। নাটকে ব্যবহৃত অঞ্চলিক ভাষার নমুনা নিম্নরূপ :

> আনার। কবরের কাছে গেলে বুক জ্যাঁত করি উডে– গেছিলাম– এক রাইতে কৃষ্ণপক্ষের চান– কাইত অই রইছে– অন্ধোরের লগে মিলাই– ওই হৈইসা ব্যাপারী গো বাড়ির হবে– বিরাট গোরস্থান–
>
> মছলন। গোরস্থানে গেছিলি- তারপর।[২১]

সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে নাটক লিখেছেন এবং বর্ণনাত্মক অভিনয়ের সূচনা করেন। অনুকরণাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি ও চরিত্রের বস্তুগত ক্রিয়াকে দর্শকদের সামনের সর্বোচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে বর্ণনাত্মক অভিনয় হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনির উপস্থাপন করা। এর দার্শনিক অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যাখ্যা প্রদান, প্রতিভঙ্গী সৃষ্টি করা নয়। এর বাহ্যিক অবলম্বন হচ্ছে বর্ণনা, অভিনয় নয়। বর্ণনার অর্থ বিবরণ। এ বিবরণ অভিনয়ের সঙ্গে মিশে থাকে। বর্ণনাত্মক অভিনয়ে নানান ভেদ রয়েছে। গায়েন বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন এবং গায়েন কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। আবার দোহার সহযোগে এ দুই ধারারই সংমিশ্রণ ঘটান। শুদ্ধ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির নমুনা গাজীর গান, হাস্তর গান প্রভৃতি শ্রেণির কৃত্যনাট্য ও লোকনাট্যে রয়েছে। ভাষার ক্ষেত্রে গদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণ রয়েছে তাঁর নাটকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গদ্য হয়ে উঠেছে সুরের বাহন। আবার তৎসম শব্দের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত বিচিত্রার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়– ‘শিল্পীর কাছে গদ্য বলে কিছু নেই। লেখকের লেখা গদ্য হতে পারে না। কাজের ভাষা গদ্য, শিল্পীর ভাষা কবিতা। তাই আমার নাটকে গদ্যপদ্যের ভেদাভেদ অবলুপ্ত। উপন্যাসকে আমি উপন্যাস মনে করি না। নাটককে আমি নাটক মনে করি না।’[২২]

প্রচলিত নাটকে যে ভাবে অঙ্ক বিভাজন হয়ে থাকে nwZ n‘vB নাটকের অঙ্ক বিভাজন সেই প্রচলিত নাট্যরীতির মতো নয়। সমুদ্র উপকূলবাসীর জীবনে জোয়ার-ভাটা সর্বত্র বিরাজমান। এ নাটকের নাট্যপর্ব এই বিভাজিত হয়েছে সেই জোয়ার-ভাটার অনুকরণে। প্রাচীন বাংলা নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী এ নাটকও সংগীতাশ্রয়ী। সমুদ্র উপকূলের জনগোষ্ঠীর সাথে নৃত্য, সুর ও ছন্দের যে শৈল্পিক সম্পর্ক তা এখানে উঠে এসেছে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের নাটকে লোকআঙ্গিক ব্যবহারের

ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন মূলত দেশীয় ঐতিহ্যকে অঙ্গীকৃত করেছেন নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর রচিত বর্ণনাত্মক ধারার নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন :

> wKËb‡Lvjv- †KivgZg½j ও nvZ n‘vB এর ত্রয়ী নাটকের অনুপ্রেরণার স্থল চিরায়ত ত্রপিক ও ধর্ম-বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনচেতনা এমন কি- আঙ্গিক পর্যন্ত যে সকল কাব্যে- ত্রপিক বা মহাকাব্যে প্রায় এক শীর্ষবিন্দুতে মিশে গেছে। এপিক বা প্রাচ্য ধর্মদর্শন আমাকে ঐ ত্রয়ীতে অনুপ্রাণিত করেছে- একালের জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার প্রেরণা দিয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে- বৌদ্ধ জাতকের গল্প-ওভিদের মেটামরফসিস পাপ ও কর্মকালের শ্লাঘ্য শিল্প- লেখা-কোরান- ডিভাইন কমেডিয়া ও মহাভারতের নরক কল্পনা একালের সঙ্গে মেলানো যায়। সে সঙ্গে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আমি শিল্পে আঙ্গিক লোপের প্রেরণার কাজ করি এবং নিরবলম্ব আঙ্গিক বুদ্ধিতে শিল্পের নানা মাধ্যম পৃথকীকরণের বিরোধী। শিল্পে আমি দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতে উপনীত হতে চাই।[২৩]

সেলিম আল দীন বর্ণনাত্মক বাংলা নাটকের যে আঙ্গিক গড়েন wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n‘vB নাটকে তার কাঠামো তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। তিনি ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের জটিল আঙ্গিক কথকতার আশ্রয়ে রচনা করলেন কথানাট্য PvKv, ˆheZx Kb¨vi gb, niMR ইত্যাদি। কথক এখানে আখ্যানে বাহক। কথা মুখ্য হলেও কথা এ নাট্যরীতির শেষকথা নয়। এতে আছে কাব্যিক বর্ণনার অপরিমেয় চিত্র। এছাড়া রয়েছে পুরাণের যথাবিধি প্রয়োগ। একইসঙ্গে সংগীতের অপূর্ববাণী সুরের অমিয়ধারা।

সেলিম আল দীন PvKv নাটকটি K_vbvU¨ নামে এক বিশেষ শিল্পরীতির আশ্রয়ে রচনা করেছেন। কথানাট্য নাম আঙ্গিকের ধারায় তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা PvKv। PvKv নাটকের বিষয় গণঅভ্যুত্থানে শহিদ এক যুবকের লাশ নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো। তবে শেষপর্যন্ত গাড়োয়ানদ্বয় অস্পষ্ট ঠিকানা আর কোনো গ্রামের যুবকের সঙ্গে তাকে মেলাতে পারেনি। পরিশেষে নদীর তীরে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করে। PvKv নাটকের বর্ণনাভঙ্গি যেমন শব্দময়তার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, তেমনি এর মানবিক দিকটাও অসাধারণ। সরকারি হাসপাতালে অস্বাভাবিক এবং পরিচয়হীন একটা লাশকে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার জন্য নিছক ভাড়া খাটানো লোক হিসেবে গাড়িতে করে গাড়োয়ানদ্বয় নিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু লাশটির নিখুঁত পরিচয় জানা না থাকায় তাকে আর পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এরই মধ্যে কিছু সময় পার হয়, লাশটির সাথে জ্যান্ত দুইজনের একটা বন্ধন তৈরি হয়। অবশেষে পঁচা গলা লাশটিকে গাড়ির দুইজনই

মাটিতে পুঁতে রাখে। তারা লাশটির জন্য কাঁদে, একটি মানবিক আর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয়বস্তু উপস্থাপনে নাট্যকার বেছে নিলেন এক ভিন্নমাত্রার শিল্পমাধ্যম। এ পর্বে নাটকের বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে আসতে তৎপর ছিলেন তিনি। তাই এই পর্বে তাঁর কাছে নাটক আর নাটক নেই, তা হয়ে ওঠে কথা, কাহিনি, উপাখ্যান, নৃত্য, গীত, নাট্য, রাগরাগিণী ইত্যাদির বিচিত্র সমাহার। তাঁর মতে, তাঁর লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙে অন্য এক শিল্পতীর্থে উন্নীত হোক। নাট্যকার কথার সাহায্যে নাটক রচনা করেছেন- তাই এর নাম দিয়েছেন কথানাট্য। গৃহাঙ্গণে কথক যে কিস্‌সা বলেন, সে রীতির সঙ্গে PvKvর আঙ্গিকরীতির সম্পর্ক রয়েছে। PvKv নাটককে কেউ বলেছেন উপন্যাস, কেউ বলেছেন কাব্য আবার কেউ বলেছেন নাটক। এসব উপাদানই মূলত এ নাটকে রয়েছে। PvKvয় গল্প বলার যে রীতি, সেই রীতিরই নাম কথানাট্য। এই কথানাট্যের সাথে মিল রয়েছে কথকতার। কথকতা কোনো নাট্যরীতির নাম নয়, অভিনয়রীতির। অন্যদিকে কথানাট্য বিশেষ এক নাট্যরীতির নাম। নাট্যকারের মতে, কথানাট্যকে শাস্ত্রনাট্যও বলা যায়, যেহেতু ধর্মশাস্ত্রের ন্যায় এই নাটকেও কিছু জ্ঞানের উপাদান রয়েছে যা গল্পচ্ছলে উপস্থাপিত হয়েছে। এ নাটকে নাটক ও কাব্য এ দুয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে একই আঙ্গিকে। এছাড়া সংগীতও আছে। PvKv নাটকটির আঙ্গিকের উৎস সংস্কৃত পুরাণ কথকতারীতি। নাট্যকার সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগর' গন্থের গল্প বিভাজনরীতি, যথা কথামুখ বা কথাপিঠ, লম্বক ও তরঙ্গ বিভাগ এ নাটকে ব্যবহার করেছেন। PvKv নাটকে প্রচলিত প্রমিত যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতি অনুপস্থিত। এখানে গদ্যপদ্যের দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন ব্যবহারের সর্বজনস্বীকৃত রীতি পরিত্যাগ করা হয়েছে। এতে রয়েছে তিনটি লম্বক। প্রথম লম্বকে রয়েছে চারটি তরঙ্গ, দ্বিতীয় লম্বকে তিনটি তরঙ্গ এবং তৃতীয় লম্বকে আছে দুটি তরঙ্গ। PvKv কথানাট্য গ্রন্থাকারে প্রকাশে গ্রন্থমুখ লিখেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক। নিম্নে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো :

> সেলিম আল দীন এই কথানাট্যের রচয়িতা, বাংলা নাটকের এক প্রধান পুরুষ; সেলিম অনবরত সন্ধান করে চলেন প্রকাশের নতুনতর মার্গ; নতুন, কিন্তু বাংলা ভাষার সৃষ্টি এবং হাজার বছরের ধারাবাহিকতার অন্তর্গত অবশ্যই। বাংলায় তিনি লেখেন কারণ বাংলার অস্তিত্ব এবং জগত-বোধ-যাপিত জীবনের স্বপ্ন ও যন্ত্রণা তাঁর বিষয় অপিচ তা বিশ্বের সকল মানুষেরই মানচিত্র হয়ে ওঠে বটে। মানুষ প্রসঙ্গে আমাদের বিস্ময় যেমন অফুরান, মানুষের কথা বলবার মাধ্যমও তেমনি বিচিত্র ও সহস্র। বাংলার ধুলিতে ও কাদার পটে অনবরত দাগ কেটে যাওয়া চাকার প্রতীকে সেলিম আল দীন মানুষের জীবনের যে মৌল কথাটিকে দেখতে পান, সেই কথা প্রকাশের জন্য তাকে সন্ধান করতে হয় কথাবিন্যাসের নতুন একটি চেতনা– সংলাপনির্ভর নাটক তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় না,

> আবার কেবল দেহছন্দ-নাচ-অভিনয় সকল কিছু তাকে এঁটে উঠতে পারে না, উপন্যাসের ধারাবর্ণনাও তার নিকট যথেষ্ট বলে মনে হয় না, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এবং ব্যক্তি-সমাজ-সংগ্রাম তাকে অবিরাম দুলিয়ে দিতে থাকে ভূত-ভবিষ্যতে, এমত মুহূর্তে আমাদের এই নাট্যকার এক নতুন সাহিত্য মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলেন– কথানাট্য যা নাটক, কবিতা, নাচ, গীত, উপন্যাস উপকথা ও কথকতার সমাহার।[২৪]

বাংলাদেশের লোকজীবনে সহস্র বৎসর ধরে যেসব বহু ব্যবহৃত এবং অভিনীত সংগীত ও কথোপকথননির্ভর আঙ্গিক বিদ্যমান রয়েছে যেমন– গান, গীত, পালা, হাস্তর, কিস্‌সা প্রভৃতি সবগুলিই মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্যাঙ্গিকের পরিচয় বহন করে বলে মত দিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং। ইউরোপীয় নাটকের বিপরীত প্রান্তে দণ্ডায়মান বাংলা নাটকের হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। বাংলা নাট্যের বিচিত্র আঙ্গিক ও পরিবেশনাশৈলীতে লভ্য কতিপয় বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এদেশের নাটকে হাজার বছরের ইতিহাসে চরিত্রানুগ অভিনয়ের ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপুর্ণ ছিল না। মূলত একই ব্যক্তির মধ্যে বহু চরিত্র ও ঘটনা কাহিনির লীলা প্রত্যক্ষ করা যেত। বাংলা নাটকে তাই অভিনেতাই মুখ্য। বাংলা নাট্যে শাস্ত্রগান, গাজীর গান কিংবা গীতিকা আয়েননির্ভর। পুরো পালাটিতে গায়েন নিজেই পরিচালনার কাজ করেন। বাংলাদেশের জনপদে প্রচলিত নাট্যাঙ্গিক গল্প বলার রীতিকে অবলম্বন করে PvKv কথানাট্য নির্মাণ করেছেন। PvKv নাটকে আশ্রয় নিয়েছেন গায়েন-দোহার রীতির। গায়েন বা কথকরূপী অভিনেতা গল্পকথা, বর্ণনা এবং প্রয়োজনে সংলাপ কথনে চরিত্ররূপ অভিনয় করেন। আবার তার সাথে অভিনয়ে যোগ দেয় দোহার। পর্যায়ক্রমে দোহারও হয়ে যান গায়েন কথক বা অভিনেতা। নাট্য কথামালার মূল গায়েন বা কথক নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণ করেন, যেমনটা করেন গাজীর গানের মূল গায়েন। ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত PvKv নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য নিম্নরূপ :

> আমি কথার শাসনে নাটক রচনা করেছি তাই এর নাম দিয়েছি কথানাট্য। একে কথকতাও বলা যায়। কিন্তু কথকতা অভিনয়রীতির নাম- নাট্যরীতির নাম নয়। উপরন্তু কথকতা বললে কথানাট্যের দাবি পূরণ হয় না। রামায়ণও কথকতা কিন্তু আসরে লোকগল্প বলার রীতিটাকে আমরা কেউ কথকতা বলি না। কারণ যারা পুরাণ কিংবা লোককথাগুলো পরিবেশন করেন তারা একে শাস্ত্র বা হাস্তর বলে থাকেন। গৃহাঙ্গনে কথক যে কিসসা বলেন– দোহারদের সঙ্গে এ নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনায় সে রীতির শিক্ষাটি সক্রিয় ছিল।[২৫]

PvKv নাটকে একটি শবের গন্তব্যহীন যাত্রার কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে গল্প, নাটক, সংগীত ও কাব্যের নানা উপাদান সহযোগে। একই রচনায় চারটি উপাদানের সম্মিলন পাওয়া যায়। শিল্পে তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাই PvKvয় কথক গল্প বলেছে :

> গঞ্জের এ দিকটা খোলা মেলা গাঙ্গের পাড়॥ কৃশতর প্রবাহের রেখায় রেখায় কাল রাতে যোগ হয়েছে খানিক নতুন পানি॥ গরু মোষের গাড়ি তৈরীর ঘর* ... আর কোনোদিন সরানো হবে না। এমন একটি চাকা উইতে ঢেকে যাচ্ছে বিষণ্ন ম্লান ভগ্নাংশ চাকা* বোম ভাঙা গাড়ি একটা চাকাবিহীন একটি নতুন চাকাকে কাঠের ফুল বলে মনে হয়।[২৬]

নাটকের প্রধান উপাদান সংলাপ। যদিও PvKv একটি কথানাট্য- চরিত্র, কাহিনি ও ঘটনার উপস্থাপনা হয়েছে– তথাপি এই বর্ণনার মাঝে সংলাপের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। সমগ্র নাটকে বর্ণনার পাশাপাশি সংলাপ বিদ্যমান। গাড়োয়ান ও মিস্ত্রীর আলাপ :

> এটু কেশে নেয়ে কানের গোঁজে রাখা ছোট্ট, কাঠ পেন্সিলটি এ কান থেকে ও কানে রাখে॥
>
> পুঠি থেকে আরা ঢিলে হয়েছে
>
> সংক্ষিপ্তে সেইরে দেও
>
> যাবু কুটি
>
> জলিধানের বতুরে যামো হুই দিল সুহাগীর বিল* মথুর ডাঙা দিয়ে পূবে ভুগরাইল তা দক্ষিণে থুয়ে বামুন শিকড় হয়ে কুমারপুর তারপরে ছিরিপুর দামকুড়্যা। হামাকের সঙ্গে আরও চাইরজনা জুটেছে॥ মিস্ত্রী কাজে মন দেয়* কিন্তু গাড়োয়ানকে অপ্রয়োজনীয় কথার নেশায় পায়।[২৭]

PvKv নাটকে নানা রকম চরিত্র রয়েছে। সে সব চরিত্র কথা বলে একে অপরের সঙ্গে। অবশ্য এখানে কেবল একজন মানব চরিত্র কথা বলে না, অথচ তাকে ঘিরেই এ নাটকের ঘটনাবলি আবর্তিত। সে চরিত্র হচ্ছে একটি নামহীন শব। চাকা নাটকে মৃত্যু পরবর্তী অন্তিম যাত্রায় ঠিকানাবিহীন গন্তব্যে গরুর গাড়িতে দিগন্তভেদী এক লাশ। সকালে ফসলের মাঠ ধরে চলমান গাড়ির গাড়োয়ানের ভাষ্যের আশ্রয়ে নাট্যকার চিত্রের পর চিত্র রচনা করে চলেন। লাশের বিপরীতে নট্যকার সবুজ, হলুদ, কমলা, নীল, কালো অজস্র রঙের অভিব্যক্তিময় চিত্র তৈরি করে প্রাণের আবেগ সৃষ্টি করছেন। যেমন :

> গাড়োয়ান আরো নতুন নতুন ভাবনার বাঁকে এসে দাঁড়ায়। সে ভুবনের বাতাসে তার তবন ও গামছা ওড়ে * আচ্ছা যে মানুষটা কাকেশ্বরী স্বর্ণখালি নদীর ভুরুঙ্গা মাছ ধরে শস্য কর্তন করে শীতের নীলচে কুয়াশায় দিগন্ত মোড়ানো মাঠে মাঠে হলুদ সর্ষে ফুলের ঘোড়াদৌড় লাগায় কেন তার পেট চেরাই করে নাড়িভুড়ি বের করে আনা হবে॥[২৮]

PvKv নাটকে আছে দুই রকম ভাষা; আঞ্চলিক বাংলা ভাষা ও শুদ্ধ চলিত ভাষা। গাড়োয়ান, গাড়ির মিস্ত্রি, হাসপাতালের ডাক্তার, ধরমরাজ, শুকুর চান যুবক, হেডমাস্টার, বৃদ্ধা প্রমুখ আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় কথা বলে। কথক চলিত ভাষায় কথা বলেন। PvKvয় নাট্যকার 'তারকা' চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। তারকা চিহ্ন কেন ব্যবহার করেছেন এবং এর অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন, এদেশীয় ঐতিহ্য থেকে তিনি এটা নিয়েছেন। এছাড়া গভীর বোধ থেকেও PvKv নাটকে মৃত্যু বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর সঙ্গে সাজুয্য করে তারকা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন :

> আমি মৃত্যুটাকে একটা মহাজাগতিক জায়গায় নিতে চেয়েছিলাম। মানে বিশাল এক প্রান্তরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে লোকটির শব মনে হচ্ছে একটা চিত্রকলা যাচ্ছে। আর অন্য কোথাও যে ব্যবহার করিনি, সেটা হলো, আমি বলছি না যে, স্টার চিহ্ন ব্যবহার করতেই হবে। আমি বিশেষ সময়ে বাঙালিদের দ্বারাই উদ্ভাবিত একটি চিহ্ন ব্যবহার করে তাদেরকে সম্মান জানালাম এবং ঔপনিবেশিক বল্গা বাঁধন থেকে মুক্ত হলাম।[২৯]

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গানের চর্চা একজন নাট্যকারের জন্য অপরিহার্য। যেমনটা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে সেলিম আল দীনের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। ধ্রুপদী ও লোকসংগীতের মিশ্রণে মহুয়া ও দেওয়ানা মদিনা সুরারোপ করেছেন। PvKvর সব কটা গানই সরাসরি গদ্যে সুরারোপ করা। যেমন :

দেখ দেখ সহচরী
দেখলো নয়ন ভরি
খেলিছে তোমার হরি এসে যমুনায়।
এমন চাঁদের ছবি
গগনে উদয় রবি
কাল মেঘ ঘুরে বেড়ায় এসে যমুনায়।[৩০]

PvKv নাটকের সর্বত্র কবিতার উপাদান দেখা যায়; এ রচনা চিত্রকল্প, উপমা ও রূপকে সমৃদ্ধ। কখনও বর্ণনা আশ্চর্য গীতধর্মিতায় মণ্ডিত। বাংলা নাট্যাঙ্গিকে সংগীতের ব্যবহার। একটি অন্যতম উপকরণ। নাট্যকার এ নাটকের নানা অংশে সংগীতের সংযোজন করেছেন। সাঁওতালদের গানের সঙ্গে নৃত্য করে ধরমরাজ। যেমন :

বিবি কলাই দালাই মেশাই রাধিব
ডুবি ভরাই দিব গো
ভাইকে খাওয়াবো গুঝি গুঝি
পানগো
পানগো॥[৩১]

PvKv নাটকে গানের সাথে যুক্ত হয়েছে নাচ। সাঁওতালি নাচের সাথে সম্পর্কিত এই গান। সংগীতের ব্যবহার একদিকে এ নাটককে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, অন্যদিকে নাট্যকারের প্রথাগত নাটকের সাধারণ সীমা অতিক্রম করে একই অঙ্গে ধারণ করেন কবিতা, গান ও নাটক। নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর PvKv নাটকের ভূমিকায় বলেছেন, 'আমি সব সময় বলতে চেয়েছি, আমার লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙে অন্যসব শিল্পতীর্থগামী হোক কারণ শিল্পে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।[৩২] তাঁর এই বক্তব্যে ও সূত্র ধরেই বলা যায় তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পীরীতির অনুসারী অভিযাত্রী। PvKv কথানাট্য রচনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক wePÎv পত্রিকার সঙ্গে এক আলাপচারিতায় তিনি এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন :

> আমি কথার সাহায্যে নাটক রচনা করেছি। তাই এর নাম কথানাট্য। গৃহাঙ্গণে কথক যে কিসসা বলেন, সে রীতির সঙ্গে চাকার আঙ্গিকরীতির সম্পর্ক রয়েছে। আমি সব সময় চেয়েছি আমার লেখা নাটকগুলো নাটকের বন্ধন ভেঙে অন্য এক শিল্পতীর্থে উন্নীত হোক। আমার PvKv নাটককে কেউ বলেছে উপন্যাস, কেউ বলেছে কাব্য, আবার কেউ বলেছে নাটক। মূলত এ সব ধরনের উপাদান রয়েছে PvKv নাটকে। এতে রয়েছে সংগীতের স্পর্শ। কথানাট্যকে আমি পুরাণ এবং লোককথা মুক্ত করতে চেয়েছি। তাই PvKv নাটকটিতে ঘটনার উৎসে আমাদের সমকালীন ইতিহাস রয়েছে।[৩৩]

সেলিম আল দীনের কথানাট্য ধারার দ্বিতীয় সংযোজন ^heZx Kb¨vi gb। এ কথানাট্যে দুটি খণ্ড রয়েছে। প্রথম পর্বের নায়িকা কালিন্দী এবং দ্বিতীয় পর্বের পরী। প্রথম খণ্ডে অষ্টাদশ শতকে ধর্মকাজের সঙ্গে গীতিকা পালার দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা হয়েছে। সেই শতকে মঙ্গলকাব্য ধারা ক্ষীণ হয়ে এলেও তা লোকাচার বিশ্বাসের নানান স্তরে বেঁচেছিল। গীতিকার মতো পূর্ণাঙ্গ মানব রসসিক্ত প্রবলধারার কালে এ দেশে পীরাদি পূজার প্রচলন হয়েছিল। পশ্চাদমুখী টানে ক্ষয়িষ্ণু ধর্মতান্ত্রিকতা গীতিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এরই ফলে কালিন্দীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। কালিন্দী ধর্ম বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিল আলালের প্রণয়ের টানে অথচ সেখানে অবিচল বিশ্বাস নিয়ে সে দাঁড়াতে পারে নি। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাকৃত

জীবনের গন্ধমাখা এক নারী– পরী। শিল্পের ভেতর দিয়ে যে অহং তৈরি করেছিল তা মূলত আত্মবিনাশী। শিল্প ও জীবনকে প্রায় এক বিন্দুতে মেলাতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি।

^heZx Kb¨vi gb কথানাট্যের দুই খণ্ডে মৃতনারীর ফিরে আসা ও জীবনকাহিনি বলার মধ্যে সময়গত কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এই গল্পকথনে সময়ের ঐক্য এবং ভাঙন রয়েছে। এ নাটকে বর্ণনাত্মকরীতিতে দেখা যায়– চরিত্রের নিজের ভেতর থেকেই নিজে পাল্টে গিয়ে বর্ণনা করছে। একই চরিত্র বর্তমানে দাঁড়িয়ে কখনো নিজেই নিজের সাথে, কখনো বা অন্য চরিত্রের সাথে কথা বলে নাটকের কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যায়। মূলত কাহিনি বয়নে ^heZx Kb¨vi gb-এ তৃতীয় পুরুষ ও উত্তম পুরুষ মিশিয়ে দেয় হয়েছে। এ নাটকে PvKv নাটকের মত লম্বক ও তরঙ্গ বিভাজন রীতি অনুসরণ করা হয় নি। তেমনি ব্যবহার নেই তারকা চিহ্নের বরং লক্ষ করা যায়, আবার দাঁড়ি কমার বিলাতী নিয়মে প্রত্যাবর্তন করেন। তবু অর্ধযতি হিসেবে শুধু কমা ও দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে। সংলাপের প্রারম্ভে কোলন পরিত্যক্ত হয়েছে– তবে ড্যাশের ব্যবহার আছে।

^heZx Kb¨vi gb- এ বর্ণনাংশে উত্তম পুরুষের ব্যবহার আর যখন চরিত্রের বেদনাকে পাঠক দর্শকের হৃদয়ের মর্মমূলে আবেগের চূড়ায় পৌঁছে দেয় ঠিক সে– সময়ই নাট্যকার তৃতীয় পুরুষে সংলাপ অংশ নিয়ে আসেন। তবে এখানে উত্তম পুরুষের বর্ণনাংশই বেশি। ফলে নাট্যগুণ সম্পন্ন হয়েও নাটকটিতে উপন্যাস পড়ার রস আস্বাদিত হয়। আর কেবল উপন্যাসই নয়– এ নাটকের ছত্রে ছত্রে আছে শিল্পতত্ত্ব বা কাব্যগুণ সম্পন্ন প্রবন্ধের আস্বাদ। নাট্যকার এখানে বৈচিত্র্য এনেছেন ভাষা প্রয়োগে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন কথাপুচ্ছ অংশে এভাবে :

> ^heZx Kb¨vi g‡bi ভাষা শিল্পে দ্বৈতাদ্বৈতবাদীতায় উপনীত হবার যে ইচ্ছা তার সহায়ক করে তুলতে চেয়েছি। এই ভাষা ঐতিহ্যবাহী লোককথার সরল রেখায় প্রসারিত হয়নি। এই ভাষা গায়েন বা কথকরীতির সাথে চরিত্রের নিজস্ব মনোভঙ্গীর একটি সাঁকো তৈরী করতে চায়। কাব্য ও কথ্য যখন একত্রে আদি শিল্পীদের হোমাগ্নিতে জ্বলত তখন তা গদ্য-পদ্যের ভেদ ছিল না। আমি তাই কথানাট্যের ভাষারীতিতে গদ্য ও পদ্যকে অভেদাত্মা করার প্রয়াসী। আমার ভাষা– চৈতন্যে গদ্যে–পদ্যের ভেদ অবলুপ্ত।[৩৪]

^heZx Kb¨vi gb নাটকে অনুপমভাবে বাংলার প্রাকৃতিক চিত্র চরিত্রের অনুষঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন। সেলিম আল দীনের রচনায় পূর্ববঙ্গের নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি প্রবলভাবে প্রাণবন্ত রূপে উপস্থিত হয়েছে। এখানে মানুষগুলো যে প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করে, সেই প্রকৃতির

প্রতিটি উপাদানের মধ্যে দিয়েই তারা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। পরী কথা বলে প্রকৃতির সাথে, পুকুরের শান্ত জল, পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়, হুলো বেড়াল, কিংবা লম্ফে করে এক আসর থেকে অন্য আসের যাবার পথে নদীর জলের সাথে তার নিমগ্ন আলাপ চারিত চলতেই থাকে। কালিন্দীও তার প্রতিটি আবেগের প্রকাশে তার চারপাশে তাকে জড়িয়ে থাকা প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গকেই বহন করেছে। চিত্র ও চিত্রকল্পের বুননে রচিত হয়েছে ˆheZx Kb¨vi gb এর বুনন। যেমন :

> চন্দ্রখচিত স্রোতে এবার দাঁড় বাওয়ার শব্দ। তেলের গন্ধমাখা বালিশ আর ম্লান নকশী-কাঁথায় কুয়াশা মোড়ানো আকাশের নীচে ধাবমান পানসীতে আমরা দুজন শুয়ে পড়ি। আলালের দারিদ্র্য দেখে একদিন দরিদ্রের জীবন যাপনের যে লোভ জেগেছিল মনে আজ থেকে তারই মধ্যে বসবাস হল শুরু। পানসীর জানালা খুলে দিয়ে আমি উপুড় হয়ে মধ্য রাতের নিঃশব্দ গাঙ দেখতে থাকি। বিপরীত দিক থেকে একটি দু'টি নৌকা চলে যায়। চাঁদ হেলেছে খানিকটা পশ্চিমে। নদীর উপরে কুয়াশার দুধ শাদা নৌকা, তাতে কে একজন বাঁশী বাজায়। শীত রাত্রের বাঁশী।[৩৫]

শেকড়সন্ধানী নাট্যকার সেলিম আল দীন। লোকজ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁকে বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছে। আঙ্গিকের উৎস ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন :

> nvZ n'vB রচনাকালেই পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপভিত্তিক গড়নটা আমার পছন্দ হচ্ছিলো না। পরিপার্শ্ব এবং চেতন-অবচেতনের অনেক কিছুই সংলাপে ধরা পড়ে না। একটি জায়গায় সংলাপকে অসম্পূর্ণ মনে হয়। সে স্থানটি বর্ণনা দিয়ে ভরাট করা উচিত। ঐতিহ্যবাহী বাংলা কথকতা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। নাটক তিনটি রচনার সময় এ রীতির দিকে আমার চোখ ফেরানো ছিলো। তাছাড়া সংস্কৃত কথা সরিৎসাগর এ রীতি সৃজনে আমাকে সমভাবে সাহায্য করেছে। বিষাদ ও চুটকি জারিতে গায়েন এক পাশে দাঁড়িয়ে ছড়া বা গান বলে যান এবং নৃত্যপর দোহারগণ সে অনুসারে নানাভাব ফুটিয়ে তোলেন। জারি আদ্যোপান্ত এক আশ্চর্য দেহছন্দের মিশ্রণে সৃষ্ট বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি। ˆheZx Kb¨vi gb রচনাকালে গল্পকথন পদ্ধতি আমাকে প্রভাবিত করছে। ˆheZx Kb¨vi gb কথানাট্যের মাধ্যমে মৃত নারীর ফিরে আসা, জীবনকাহিনী বলার মাধ্যমে সময়গত কৌশল প্রয়োগ করেছি। এ গল্পকথনে একদিকে যেমন সময়ের ঐক্য ব্যবহার করেছি, অন্যদিকে তেমনি সময়কে ভাঙচুর করেছি।[৩৬]

মানিকগঞ্জ জেলার হরগজ নামক স্থানে ১৯৮৯ সালের গ্রীস্মকালে প্রলয় সদৃশ টর্নেডো হয়, সেই টর্নেডো বিধ্বস্ত জনপদের অসাধারণ শিল্পরূপ হচ্ছে niMR কথানাট্য। এই নাটকের ক্ষেত্রে প্রচলিত নাট্যআঙ্গিক, মঞ্চ এবং অভিনয়রীতির কোনোটাই তাঁর নিকট বিবেচিত হয়নি। বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরুচির

ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা নাট্যাঙ্গিক এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। niMR রচনায় মৃত্যুকে ধ্বংস ও বিশ্ববিনাশের সমান্তরাল করে দেখেছেন। তবে niMR রচনায় কেবল মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা নয়, সমকালীন রাষ্ট্রভাবনারও খানিক ছায়াপাত ঘটে থাকতে পারে। এ নাটক যখন তিনি লিখেছেন, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙন লেগেছে। তখন তাঁর ধারণা হলো যে, বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপর্যয় শুরু হয়েছে। niMR এর গল্পটিকে সেভাবেও দেখা যেতে পারে। লেখকের মনোভূমিতে এ গ্রন্থ রচনাকালে বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপর্যয়ের চিন্তাটা সক্রিয় ছিল। একথা বলা যায়, niMR লেখকের আত্মজৈবনিক ভাবনা। প্রলয়ংকারী ঝড়ে বিধ্বস্ত জনপদের কথামালা লেখক এখানে অঙ্কিত করেছেন। এমনই ভয়ংকর টর্নেডো হয়েছিল হরগজে যে, সেখানে ত্রাণ নেওয়ার মতো কোনো লোক ছিল না। কৃষিজীবী জনপদের প্রায় সামগ্রিক বিনষ্টি ঘটে। niMR-এর এই কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে বর্ণনাত্মক রীতিতে। নাটকের শুরুতে গায়েনের একটি গান রয়েছে যা থেকে সহজে নাট্যবস্তু উপলব্ধ হয় :

তোমার লাশের মোড়কের উপর
উত্তীর্ণ গোধূলির আলো
ওই দীর্ঘগলা সারসগণের
পাখার উপরও তা।
অথচ সারসগণ উড়ে যায়
অনামা গন্তব্যে
কিন্তু পিঁপড়ে অথবা মানুষ
তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে
ভয়ঙ্কর মাটি গহ্বরে।[৩৭]

niMR কথানাট্যে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির ব্যবহার হয়েছে। বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি প্রাচ্যদেশীয়, যা পাশ্চাত্যের স্বীকৃত রীতি পদ্ধতি ও কৌশল থেকে আলাদা। পাশ্চাত্যের অভিনয় অনুকরণতত্ত্বের আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। এ কারণে অনুকরণাত্মক অভিনয় হচ্ছে ঘটনা কাহিনি ও চরিত্রে বস্তুজগতের ক্রিয়া ও দৃশ্যমূলের এমনতর আরোপ যা দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর niMR নাটকের বর্ণনাত্মক অভিনয় হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনির উপস্থাপন করা। এর দার্শনিক অভিপ্রায় হচ্ছে ব্যাখ্যা করা। আর এ কারণেই গায়েন এ রীতিতে আশ্রয় নেয় নৃত্য, সুর, তাল ও ছন্দের। বর্ণনাত্মক রীতির অভিনয়ে গায়েন যা দেখায় তা আসলে এক ধরনের ব্যাখ্যা মাত্র। তার

কাজ কাহিনির বস্তুগত দিকটাকে অনুকরণ করা নয়, বরং কাহিনির অন্তর্গত গতি ও আবেগ দর্শকের মনে ধরিয়ে দেয়া। দর্শকের কল্পনাশক্তি বস্তু বা ঘটনার সম্ভাব্য রূপ আপনাতেই খুঁজে নেয়। বর্ণনাত্মক অভিনেতার কাজ হচ্ছে অন্তর্গত সুরটি তৈরি করে দর্শকের চোখ কান মনে ধরিয়ে দেয়া। niM‡Ri ধ্বংসযজ্ঞে নাট্যকারও তাই করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। যেমন :

> সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেন হাওলাদার আমি এতক্ষণ একটা ঝড়ে ভাঙা খুঁটিকে মানুষ মনে কইরা কথা বলছি - তিনি হুহু করে উঠেন - আমারে ধরেন। সুবহানাল্লাহ নাইজুবিল্লাহ- থর থর করে আবিদের বুকের ভেতর কাঁপে এই রকমের ঘটনা এ জীবনে ঘটে নাই আমার। সালাম ফিরিয়ে মুনাজাতের পর তিনি দেখেন কোথাও কেউ নাই। পরে ঝড়ে চাল থেকে খসে পড়া টানার কাঠকে মানুষ ভেবে অনেকক্ষণ কথা বলেছেন হাওলাদার। যেমন বললেন- "অবস্থা ত ভালা না। লোকটা উত্তর দিল- হ"।[৩৮]

niM‡R বর্ণনাকে ক্রিয়াতে রূপান্তরের অভিপ্রায়ে তা বর্ননাত্মক অভিনয়রীতিতে বর্ণনা ও উপস্থাপনার ধাঁচে লিখিত হয়েছে। সেলিম আল দীন এই ধারাটি আহরণ করেছেন প্রাচ্যের ধ্রুপদী সাহিত্য, কৃত্যনাট্য ও লোকনাট্যের ধারা থেকে। আধুনিক কথানাট্য niMR নাটকে রূপকের ব্যবহারও ঘটেছে। লৌকিক-অলৌকিকের সমান্তরাল ব্যঞ্জনায়-হরগজ নামের এক দৈত্য বসে আছে হরগজ থেকে দূরে।

ঢাকা থিয়েটার বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিক ও এই আঙ্গিকাশ্রয়ী বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিকে চরিত্রাভিনয়ের আবরণে মঞ্চে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয়। wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n'vB-তে ঢাকা থিয়েটারের এই প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক নাট্যআঙ্গিকই বর্ণনাত্মক অভিনয়ের প্রধান উৎস। niMR-এ গায়েন কথকরীতির বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতি অনুসৃত হয়েছে। niMR নির্মাণে নাট্যকার বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক গায়েনরীতি অবলম্বন করেছেন। গাজীর গান, হাস্তর গান প্রভৃতি কৃত্যনাট্য ও লোকনাট্য শ্রেণির নাট্য পরিবেশনায় এ রীতির নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মকরীতির নাটকে স্থান কালের অন্বয়বিহীন আদি-মধ্য অন্ত বিশিষ্ট একটি চমকপ্রদ কাহিনি প্রত্যক্ষ করা যায়। European Theatre এর মতো এতে ক্রিয়া বা Action মুখ্য নয়। সমগ্র কাহিনিটি আসরে গেয়রীতিতে একজন অভিনেতা (গায়েন) কর্তৃক পরিবেশিত হয় বলে নাট্যকাহিনিতে Action অপরিহার্য নয়। বর্ণনার অব্যবহিত পরেই আসে সংলাপ। এরপর কাহিনির গতি, ভাব এবং ঘটনার অনুষঙ্গে থাকে সংগীত। বর্ণনা ও সংগীতকে আরও রসগ্রাহী করে তোলা এবং গল্পাংশে ধৃত চরিত্রসমূহকে দর্শক সম্মুখে মূর্ত ও চলমান করার প্রয়োজনে আসে নৃত্য। বর্ণনাধর্মী নাটক রচনায় নাট্যকার আবার নতুন গবেষণায় নিমজ্জিত হন। GKwU gvigv i/cK_v নাটকটি তারই প্রমাণ। এ নাটকে শিল্পিত হয়েছে আদিবাসী

মারমা সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-প্রতারণা, সংস্কার-বিশ্বাস ও সংগ্রামের শাশ্বত রূপ। সহস্র বৎসরের বাংলা নাটকের মৌখিক রীতিতে এই গবেষণাগার নাট্যটি নির্মাণ করেছেন। স্বর্গ-মর্ত্য পাতালব্যাপী বিস্তৃত এই কাহিনিটি মারমাদের একটি কৃত্যমূলক নাটক। তবে তা সংগীত ও নৃত্য সমৃদ্ধ একটি পূর্ণরূপের গীতিকা। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে নাটকটির প্রযোজনারীতি সম্পর্কে নাট্যকারের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> গবেষণাগার নাট্য– GKwU gvigv i¦cK_v সম্পূর্ণ মৌখিক রীতিতে রচিত নিরীক্ষাগার কেন্দ্রিক উদ্ভাবনা। লঘু নৃগোষ্ঠী নাট্যের শিল্পরীতিতে নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার সীমায় রেখে সৃষ্টিশীল পন্থায় মঞ্চরূপ দানের অভিলাষেই এ নাট্য গবেষণার সূত্রপাত। রচনাকালে সমকালীন মঞ্চে এ ধরনের নাট্যের কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল না। এমনকি বিশেষ নৃগোষ্ঠীর মিথ কেন্দ্রিক নাট্যকে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা কি ধরনের নাট্যমূলক শব্দে চিহ্নিত করা যায় তা নিয়েও ভাবতে হয়েছে। শুরুতে এ নাটকের পারিভাষিক নাম দেয়া হয়েছিল নৃগোষ্ঠী নাট্য অর্থাৎ এথনিক থিয়েটার। পরে দেখা গেল নিরালম্ব এথনিক থিয়েটার নয় এর উপাদানে আছে আধুনিক থিয়েটারের কৌশল এবং গল্পের পরিণামে একটি নবতর ব্যাখ্যার প্রয়াস। এ কারণে বক্ষ্যমান নাট্যের শ্রেণী নির্ণায়ক নাম দেয়া হল নব্য নৃগোষ্ঠী নাট্য বা নব্য জাতিগত থিয়েটার অর্থাৎ নিও এথনিক থিয়েটার।[৩৯]

সেলিম আল দীন GKwU gvigv i¦cK_v নাট্য কাহিনির সূচনাতে সংযুক্ত করেছেন মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি কৃত্যানুষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে তিনি ঐ নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃত্যের স্বরূপ সম্পর্কে পরিচয় উপস্থঅপন করেন দর্শক সম্মুখে। শুধু তাই নয়, নির্দেশক শিল্প সৃষ্টির এক নিখুঁত পরিমিতিবোধের দ্বারা বুদ্ধমূর্তি, প্যাগোডাকে অর্থবহ করে তোলার নিমিত্তে কৃত্যানুষ্ঠানটিকে শ্রমণের অনুষ্ঠানে রূপদান করেন। GKwU gvigv i¦cK_v নিরীক্ষাধর্মী নাটক। এ নাটকে নৃ-তাত্ত্বিক প্রান্তিক জনসমাজের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ নাট্যকাহিনির মূল বিষয় হচ্ছে জন্মান্তরবাদ এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের দ্বন্দ্ব; সেই সঙ্গে আছে রূপান্তরবাদের প্রসঙ্গ। নাটকটি মারমা সমাজে প্রচলিত মনোহারী রূপকথা 'মনরিং মাৎসসুমুই' এর আধুনিক রূপায়ণ। নাটকটি বাংলা নাট্যজগতে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এ নাটকের ঘটনাবলি একান্তই মারমা নৃগোষ্ঠীর জাতিগত ধর্ম সংস্কার। মঞ্চে মাত্র নব্বই মিনিটের পরিধিতে কৃত্য, আচার, সংস্কার, শ্রমণ, বিবাহ, ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব প্রায় সব কিছুকে কাহিনির গতিতে পারম্পর্যময় রাখা হয়েছে। মূলত কোনো পালা বা নাট্যকাহিনির সঙ্গে যুক্ত কৃত্য যখন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নিবিড়ভাবে উদ্ভাসিত করে

তখন তাকে জাতিগত থিয়েটার বা Ethnic Theatre বলা হয়। GKwU gvigv i/cK_v-র প্রযোজনা ও মঞ্চসাফল্য নিয়ে নাট্য সমালোচক লুৎফর রহমানের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

> প্রযোজনারীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশক নাট্যবস্তুকে ২৩টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে 'কৃত' এবং অলৌকিক ঢোল প্রাপ্তি' অংশ দুটি মারমা রূপকথা 'মনরিং মাৎসুমুই' এর বহির্ভূত, নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। কৃত্যের প্রথমেই দুভাগে বিভক্ত দোহারদের মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যায়। তাদের হাতে শোভা পায় ২-২.৫ হাত দীর্ঘ বাঁশের কঞ্চি। কাঁধে ঝোলে নানা রঙের উড়ুনি। দুই ভাগে বিভক্ত দোহারগণ এক অদ্ভুত কম্পোজিশন তৈরি করে। জোড়া ঢোল, ঝাঝর ও মন্দিরার প্রচণ্ড শব্দের তালে তালে তৈরি হয় এক চতুর্ভূজ বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধের পেছনে তিনটি প্যাগোডা। দুজন অভিনেত্রী তিনটি করে কঞ্চি নিয়ে সমাহিত ভঙ্গিতে বুদ্ধমূর্তির দুপাশে দাঁড়ায়। চলে স্তোত্র পাঠ। এই কম্পোজিশনে নৃত্যশীল দোহারগণ প্রথমে একটি চলমান বৃত্ত তৈরি করে। বৃত্তের মধ্যে তৈরি হয় বুদ্ধমূর্তি ও প্যাগোডা। সংস্কৃত স্তোত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করেও দর্শকগণ নৃত্যরত দোহার এবং বুদ্ধমূর্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন সহজেই। কম্পোজিশনে এর বদল ঘটে। মঞ্চের উপর কঞ্চির পাখায় ভর করে নৃত্যরতা দুইজন অভিনেত্রীকে নিবেদন করতে দেখা যায়। কৃত্যের মূলীভূত তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম দর্শকের নিকট সফেদ আলোর নীচে নৃত্যরতা দুই নারীর শরীর ছন্দই মুখ্য হয়ে উঠে। শ্রমণ অনুষ্ঠানে একজন তরুণ ভিক্ষুর মস্তক মুণ্ডন কর্ম সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ নির্দেশক শিল্প সৃষ্টির এক নিখুঁত পরিমিতি বোধের দ্বারা বুদ্ধমূর্তি, প্যাগোডাকে অর্থবহ করে তোলার নিমিত্ত কৃত্যানুষ্ঠানটিকে শ্রমণের অনুষ্ঠানে রূপদান করেন। ফলত রূপকথার আদলটা ভেঙে গিয়ে নাটকের প্রথমেই মারমা সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনের অতি বাস্তব একটি চিত্র দর্শক চিত্তে দোলা দেয়।[৪০]

সেলিম আল দীনের Elv-Drme একটি নাট্যনৃত্যগীতি। মূলত এটা নাটক–যা গীত দ্বারা পরিবেশিত হয় এবং এর অভিনয় প্রদর্শিত হবে নৃত্যের মাধ্যমে। এ নাটকে প্রাচীন দোহার পদ্ধতি ভেঙে নৃত্যকের দলকে নাচাড়িবৃন্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, MxZ‡Mwe›' ও তৎপূর্ববর্তী পরবর্তী সকল নাটক প্রধানত নৃত্যের মাধ্যমে নিষ্পন্ন হতো। কালজয়ী লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের wPÎv½'v নৃত্যনাট্য। Elv-Drme গারোদের 'ছু আর খ্রাম' আবিষ্কারের পুরাণ। এ নাট্যের সব সংলাপই গীতবদ্ধ। এ লেখাটি তাঁর হাতে রিচ্যুয়াল হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই

নাটকেও আছে মিথের ব্যবহার। মিথ হচ্ছে আদিম মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা ও কৃত্যের সমষ্টি। একটি জনপদের প্রবহমান সংস্কৃতির অন্তরে মিথ নিহিত থাকে। কোনো জনগোষ্ঠীর শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে মিথের প্রয়োগ ও ব্যবহার লক্ষ করে তার সাংস্কৃতিক অভিরুচি নির্ণয় করা যায়। আদিতে নাটকসহ সকল শিল্প সৃষ্টি মিথ সর্বস্ব ছিল। ভারত, মিশর ও গ্রীক শিল্পকর্ম তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'ছু আর খ্রাম' উভয় স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আবর্তনের এক আশ্চর্য মিথ সেলিম আল দীন কৃত Elv Drme-এ সমকালীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে মান্দিদের রক্তপাত, অর্থনীতি, ধর্ম ধ্বংসের ভয়ালদর্শন চিত্র সবই রচয়িতার দৃষ্টি সীমায় নিবদ্ধ হয়। মান্দি মিথ অবলম্বনের কারণে মঞ্চে আসেন মান্দি দেব-দেবীরা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তাতারা, রাবুগা, আসা, মালজা, সুসেমি, সালজং প্রভৃতি।

¯c igYxMY নাট্যে পর্ব বিভাজন করে রাগ নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। অবশ্য কথাপুচ্ছে সেলিম আল দীন রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশকের স্বাধীনতা নেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। এ নাট্যে ব্যবহৃত রাগসমূহ বিলাবল, ইমনকল্যাণ, ভাঁয়রো, বসন্তবাহার, ভীমপলশ্রী, শিবরজনী, ভৈরবী, পাহাড়ি ও মুড়াই ও প্রভৃতি। এ নাট্যের সঙ্গে Elv-Drme এর আঙ্গিকের অমিল রয়েছে। ¯c igYxMY নাট্যে কথা ও স্বস্তিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এ নাটক দুটি কোনো সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক ধারণ করে না। বরং বিচিত্ররীতি ও কৌশল এর আঙ্গিক দেহে বর্তমান। এ নাটক দুটো বিশ্লেষণ করে একে পাঁচালি নামে অভিহিত করাই যথার্থ। হাজার বছরের বাংলা নাটকের আঙ্গিক প্রসঙ্গে দেখা যায় নৃত্য, গীত ও অভিনয় সংযোগে নাটকের কাঠামো গঠিত হয়েছে। বিশেষত মধ্যযুগের শিল্প আঙ্গিক বিচারে তা প্রধানত পাঁচালিরীতিতে রচিত। সেখানে বর্ণনা, সংলাপ, গীত ও নৃত্যের হরগৌরি মিলন ঘটেছে। বাঙালির নাট্যআঙ্গিক অভিনয় ও নৃত্য সমরেখায় চলমান।

সেলিম আল দীন বারবার স্বীয় রচনাকে বিচার বিশ্লেষণ করেন, সৃজনের নতুনবৃত্তে প্রবেশ করেন। কথানাট্য পর্বে তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাটকের এক অভিনব চারিত্র্য স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে তা হলো আঙ্গিকের অভেদ বা অদ্বৈততা। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন শিল্প আঙ্গিক তাঁর রচনায় একটি মাত্র শিল্প আঙ্গিকের রূপ পরিগ্রহ করে। এই নতুন আঙ্গিককে তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব অভিধায় শনাক্ত করেন। তাঁর নাটকের সর্বশেষ আঙ্গিক নিরীক্ষা হচ্ছে পাঁচালি রীতি। 'পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কাল সীমায় বাঙালির বাণীশিল্প নান্দনিক মুক্তি লাভ করেছে পাঁচালির আধারে'।[৪১] পাঁচালিতে বাঙালির শিল্পরুচির অদ্বৈত রূপটি বিদ্যমান। অর্থাৎ পাঁচালি একইসঙ্গে কাব্য, আখ্যান,

নৃত্যগীত এবং অভিনয়ের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরূপ। যদি গায়েন-বায়েন-দোহার মঞ্চে উপস্থিত হয়ে আখ্যান পরিবেশন করে তবেই তা পাঁচালি। পাঁচালি পূর্বকৃত নয়, আসরে পরিবেশন ছাড়া পাঁচালি হয় না। নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যাভিনয় প্রদর্শন যেমন অপরিহার্য রূপে বিবেচিত হয়, পাঁচালির ক্ষেত্রেও তাই।

সেলিম আল দীন দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পতত্ত্বের অনুসৃতিতে পাঁচালি আঙ্গিকে সৃজন করেছেন ebcvsïj, cvP¨, avegvb, ¯Y‡evqvj, wbg¾b এবং cÎ। পাঁচালি বা পালায় যেমন কথক কাহিনিকে বিভিন্ন স্তরে বাহিত করে কাহিনির ভিন্ন বাচন দাঁড় করান– ebcvsïj-এ লেখক সেই কাজটি করেছেন। পাঁচালির দিশা, বোলাম, নাচাড়ি, শিকলি, পদ, কথা প্রভৃতি ebcvsïj-এ ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের অভিনয়রীতি মিশ্ররীতির সংলাপাত্মক ও বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সংমিশ্রণে মূর্ত হয়। ebcvsïj-এ নাট্যকার নিজেই পাঁচালিকার হয়েছেন। পাঁচালি মৌখিক রীতির সৃষ্টি। নাট্যকার লেখ্য রীতির চেয়ে এই পর্বে মৌখিক রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এতে মধ্যযুগের পাঁচালির বৈশিষ্ট্যসূচক পরিভাষা পদ, বোলাম, কথা, নাচাড়ি ইত্যাদি এর কাহিনি বর্ণনা কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা পাঁচালি নাট্যেরই আধুনিক রূপায়ণ হিসেবে ebcvsïjকে চিহ্নিত করেছেন নাট্যকার। এ নাট্যের পরিবেশনায় আসরকেন্দ্রিক অভিনয়ের সংস্থান করেছেন। সেলিম আল দীন কথা, কাব্য, সংগীত ও নৃত্য সহযোগে উপস্থাপন করেছেন লুপ্তপ্রায় বনবাসী মান্দাই নৃ-গোষ্ঠীর কষ্টকথন। তিনি ebcvsïj এ ধ্রুপদী ও লোকজ সংগীতের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নিম্নে লোকসুরের একটি নাটগীতের উদাহরণ দেওয়া হলো :

মথুরা ছাড়িয়া কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যায়।
সেথা গিয়া ষোলশত গোপিনীকে পায়॥
সরস বসন্ত কালে কত পুষ্প ফুটে।
সকল গোপিনী মুখে কৃষ্ণ নাম উঠে॥
হেন কালে আইলো রাঁধা আবির লাইয়া।
রাঙায়ে তুলিল শ্রীকৃষ্ণের হিয়া ॥[৪২]

সেলিম আল দীন নাট্যের অন্তিম পর্বে এসে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী অর্থাৎ পাঠ রচনার ক্ষেত্রে লেখক নাটকের বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে আসতে তৎপর। ebcvsïj ও cvP¨– এ দুটি নাটকই বাংলা পাঁচালিরীতির অনুসরণে রচিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঁচালি নির্মাণ ও পরিবেশনার কৌশল থেকে শিল্প উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। নাট্যকার ebcvsïj রচনার পর তাঁর নাট্যশৈলীর ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবেই :

Dhaka University Institutional Repository

> বর্তমানে শিল্পের মাধ্যমগুলোর মধ্যে যে বিভাজন করা হয়, এই বিভাজন আমি বিশ্বাস করি না। এগুলো আমার কাছে খুব খেলো মনে হয়। এটা কবিতা, এটা উপন্যাস, এটা নাটক আমার কাছে এগুলো মাছের ভাগাভাগি মনে হয়। লেখ্যরীতি একটাই। যেমন, মহাকাব্য যার ভেতর থাকে নাচ, গান, কাব্য, ইতিহাস, পুরাণ, এমন কি পরিবেশনার রীতি তার মধ্যে থাকে। যেমন : cÙveZx, gbmvg½j, PÐxg½j এর মধ্যে কাহিনী, গল্প, নাচ, গান, কবিতা সবই আছে। কিন্তু আধুনিক বুদ্ধিতে আজকে আমরা সে বিভাজন করছি, আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি লেখার সময় এই বিভাজন পরিত্যাগ করে চলি। আমার সাম্প্রতিক লেখা ebcvsï j-এ তাই করেছি। এটা বাঙালির শিল্পরীতি।[৪৩]

সেলিম আল দীন তাঁর রচনার ভেতরে ভাঙচুর ঘটিয়ে এমন একটি প্রকরণের দিকে নাটককে নিয়ে গেছেন যাকে ঠিক প্রচলিত রীতিতে নাটক বলা যায় না। শেষ পর্বে তাঁর রচনাগুলো হয়ে উঠেছে অনেক বেশি চিত্ররূপময়। কমে এসেছে ধীরে ধীরে নাট্যক্রিয়া, তার পরিবর্তে পল্লবিত হয়েছে কাহিনির বিস্তার যেখানে নাটকের চেয়ে উপন্যাসের ছায়া বেশি। যেমন ¯Y‡evqvj, avegvb, cvP¨, wbg¾b, cÎ প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। মাছ এবং মহিষ যে একটি বিপুল কথাবস্তু হতে পারে ¯Y‡evqvj এবং avegvb তারই উদাহরণ। তাঁর এই সময়ের রচনায় গল্প বলার ধরনটি অনেক বেশি পরিণত। নাটকীয়তার পরিবর্তে গল্প বলাটাই অনেক স্পষ্ট। বলা বাহুল্য তাঁর পূর্বের নাটকগুলোর মতোই এগুলোও অনেক মিথ আক্রান্ত। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মিথ নির্ভরতা। আদিবাসী মান্দি, গারোদের মিথও উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গল কাব্য ছাড়াও পাশ্চাত্যের নানা মিথ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকের আঙ্গিক চেতনা একইসঙ্গে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখিতা পরস্পরের পরিপূরক। ফলে তাঁর নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না, নৃত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগে তা হয়ে ওঠে আখ্যানধর্মী।

¯Y‡evqvj একান্তভাবেই মাছের গল্প। উপাখ্যানের ধর্ম অনুযায়ী ¯Y‡evqvj-এ অনন্ত চরিত্র প্রায় রূপকথা থেকে এসেছিল। নাটকের শুরুতে নাট্যকার ভূমিকায় এর আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন :

> ¯Y‡evqvj মূলত বর্ণনাত্মক ধারার নাটক। ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাট্যমাত্রই উপাখ্যান আঙ্গিকের। আর প্রাচীন ও মধ্যযুগের ছন্দোবদ্ধ নৃত্যাভিনয়যুক্ত কাহিনীকাব্য মঙ্গল নামেই পরিচিত ছিল। যা মঙ্গলরূপে রচিত তাকে কাব্য নামে অভিহিত করা হলে তার আঙ্গিকের লক্ষ্য ও রচনার ধাঁচ সম্পর্কে পাঠকের ভাবনা খানিকটা বিভ্রান্তি হতে পারে। এক্ষেত্রে মঙ্গল পাঁচালি এই নাম নিঃসন্দেহে নান্দনিক বিচারে গ্রাহ্য। তবে বাঙালির পাঁচালি ধারাটিকে আমরা আধুনিকের সমমানতায় পৌঁছে দিতে চাই

> বলে-এর গঠনগত বিষয়টিকে গদ্য ছন্দবেশী কাব্যে এবং এর মানব ভাবনার আদর্শগত দিকটাকে আধুনিক কালের স্থলে ন্যাস করতে চেয়েছি।[৪৪]

নাট্যকার স্বর্ণবোয়ালকে পাঁচালি বলেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় ¯Y‡evqv‡j i আঙ্গিকগত প্রশ্নের সমাধান বাঙালির দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরীতিতেই হয়েছে। শিল্পের বহু বিভাজনকে একের মধ্যে লীন করে দেবার যে দর্শন সমগ্র মধ্যযুগে এবং প্রায় হাজার বছর ধরে বাঙালি জনপদের কৃত্যে ও শিল্পে বহমান তারই ধারাবাহিকতায় রচিত এ কাব্য। ¯Y‡evqv j নাটকে লেখক পাঠককে এমন এক অভিনব আখ্যানের মুখোমুখি করেন যেখানে মানুষের সঙ্গে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে মাছ। এ নাটকে সোনারাঙা স্বর্ণবোয়ালকে মাছের প্রকৃত রাজা বলা হয়েছে এবং বোয়ালকে মীনরাজ্যে জলরাজ আখ্যায়িত করা হয়। তাকে দেখেছেন লেখক মহান বিশাল জলসিংহ হিসেবে।

cvP¨ নাটকের কাহিনি মিথনির্ভর। এখানে বেহুলা লখিন্দরের উল্টো পুরাণ উপস্থাপন করেছেন। মনসা পুরাণের প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত রয়েছে। নাটকের মূল চরিত্র সয়ফর চান। কোনো এক ভাসান পালার আসরে দেখা দর্শক সারিতে বসা নোলক নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে গেছে সে দূরগ্রাম কাজলাকান্দায়। নাটকের শুরু কনে বাড়িতে। তারপর কনেসহ বরযাত্রীদের ফিরতি যাত্রা। এই ফিরতি পথের বর্ণনাংশই নাটকে দীর্ঘতম। cv‡P¨i আঙ্গিক প্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন :

> প্রাচ্যের আঙ্গিক আমার অন্য উপাখ্যান ebcvsï j এর মতোই পাঁচালির প্রেরণাজাত। তবে প্রেরণাজাত বললে বোধ হয় সত্য ভ্রষ্টতা ঘটে। দুটি রচনাতেই আমি পাঁচালির মহাকাব্যিক আঙ্গিকের শক্তিকে একালের পাশ্চাত্য নিবিষ্ট শিল্পরীতির মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছি এবং এ প্রত্যয়ে দৃঢ় যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালীর সুনির্দিষ্ট এপিক না থাকলেও মঙ্গল পাঁচালি অর্থাৎ পাঁচালির কাঠামোতে আমাদের দেশজ রুচির অনুকূলে কাঠামোগত মহাকাব্য বা স্ট্রাকচারাল এপিক আছে।[৪৫]

cvP¨ নাটকের রচনাশৈলী পাঁচালি রীতিতে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর রচিত পূর্ববর্তী অনেক নাটকের মতই cvP¨ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিশীল কাব্যিক গদ্য ভাষার সাথে সংমিশ্রণ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঢাকা থিয়েটার প্রযোজিত cvP¨ নাটকের নির্দেশক এর নির্দেশনায় নতুনত্বযোগ করেছেন। যেমন :

> cvP¨ মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশক হিসেবে আমি আমার পূর্ববর্তী নাটকগুলোতে ব্যবহৃত বর্ণনাত্মক রীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছি। আমি নিশ্চিত আমার নির্দেশনায় এ একেবারেই অভিনব। আমার পূর্ববর্তী কথক বা গায়েন বা বর্ণনাকারী প্রায়শই কথা বলেছেন দর্শকদের সাথে। কিন্তু cv‡P¨র কথকরা কখনো চোখ রাখে না দর্শকের চোখে বরং তাদের আমি উপস্থাপন করেছি অধিকতর চরিত্র ঘনিষ্ঠ করে।[৪৬]

প্রাচ্য নাটকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এদেশের জনপদের মনোরম দৃশ্য চিত্রকল্পে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। cwP¨ নাটকে জনপ্রিয় ধর্ম উপাখ্যান বেহুলা লখিন্দরকে ভেঙে নাটক লিখেছেন। মূল পুরাণে বিয়ের বাসর রাতে স্বামী লখিন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। স্ত্রী বেহুলা স্বামীর শবদেহ নিয়ে দেবালয়ে যায় এবং দেবতাদের সন্তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরে পায়। আর cwP¨তে তিনি এই কাহিনি পাল্টে দেন, এখানে স্ত্রীর মৃত্যু বাস্তু সাপের কামড়ে আর শেষ পর্যন্ত সাপকে স্বামী ক্ষমা করে দেয়। আমাদের বৃহত্তর লোকসমাজে বৌদ্ধদর্শন জাত সর্বপ্রাণবাদ এর যে প্রভাব আছে, তারই স্পষ্ট প্রকাশ এখানে পাওয়া যায়। পাঁচালির মহাকাব্যিক আঙ্গিকের শক্তিজাত প্রেরণায় রচিত সেলিম আল দীনের cwP¨। এতে ধারাবাহিক কোনো কাহিনি বা গল্প নেই শুধু একটি ঘটনা দিনমজুর সয়ফরের বিয়ে করা বউকে বাসররাতে সাপে কেটেছে ফলে বউটি মারা গেছে। এই ঘটনাকে মঙ্গল পাঁচালির কাঠামোতে দেশজ রুচির অনুকূলে রচনা করেছেন সেলিম আল দীন। কনেসহ বরযাত্রীর ফিরতি যাত্রাপথের স্মৃতি ও কল্পনার আশ্রয়ে সয়ফরের বিক্ষুব্ধ জীবনের দীর্ঘ বর্ণনা এ নাট্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাঙালির চিরায়ত ও লোকজ অভিনয়নীতিতে cwP¨ লেখা হয়েছে। cwP¨-এর অভিনয়ে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যাঙ্গিকের মনসামঙ্গল, ভাসান যাত্রার পালা, ইউসুফ জোলেখার গীত, হামদ-নাত প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন :

জোলেখা কান্দিয়া বলে ইছপে অপার।
স্বপনে তোমারে দেখি কান্দি একাকার॥
মাঘ মাসে কঠিন শীত লাগে না শরীরে।
অঙ্গারের তাপে নিত্য জ্বলিয়া পুড়িরে॥
দারুণ ফাল্গুন মাসে, ডাকিলে কোকিল।
মশারি টাঙাইয়া শুই ঘরে দিয়া খিল॥[৪৭]

এক আশ্চর্য ও অভিনব কাব্যগত অভিজ্ঞতায় নাট্যকার পৃথিবীর তাবৎ গণহত্যার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন wbg¾b নাটকে। এই নাটকে প্রায় নয় ঘণ্টার গণহত্যার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। wbg¾b নাটক রচনার শেষে তাঁর আঙ্গিকগত কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি দেন নি। কোনো কথাপুচ্ছ রচনা করেন নি। wbg¾b-এর আখ্যান শুরু হয়েছে একটি সূচনাগীত দিয়ে এরপর মঙ্গলচরণ। এই আশ্চর্য wbg¾b-এর সাক্ষীদের প্রতি একজনকে 'এই নিমজ্জনের কাহিনীটি আরো সাত সাতজনকে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

আরো বলা হয়েছে যে সকল কবি ও চিত্রী এই উপাখ্যান পাঠ বা দর্শন করেন তাঁরা গণহত্যা বিষয়ে নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী ও চিত্র রঙে, সুরে ও কথায় চাষ করুন।'[৪৮]

wbg¾b উপাখ্যানটি দাঁড়িয়ে আছে নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের সমান্তরালে। এ উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ ও নিমজ্জন সংঘটনের শহরটির সুনির্দিষ্ট কোনো নাম বিশেষ ব্যবহার করা হয় নি। তার বদলে সংঘটন স্থান নামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে আগন্তুক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক, সাহিত্যের অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের শিষ্য বা সুদর্শন যুবক, সাহিত্যের অধ্যাপকের মেয়ে বা বালিকা, কবি ইত্যাদি বিশেষণ ও সর্বনাম বাচক পদ। wbg¾b-এর আখ্যানে বাঙালির প্রাচীনতম কাব্য Phvc' থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সর্বশেষ কাব্য Ab'vg½j ও প্রাচ্যকবি রবীন্দ্রনাথের MxZevYxi সঙ্গে তামাম পৃথিবীর মহাকাব্য, ধর্মকাব্য, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, পুরাণ, ইতিহাসশাস্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কবি ফেদারিকো গোরসিয়া লোরকা, পাওলো নেরুদা প্রমুখ মহৎ কবিদের কবিতার চরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। wbg¾b নাটকে বিশ্বরাষ্ট্রসমূহের মানবতা বিবর্জিত নির্মম গণহত্যার জীবন্ত দৃশ্য। অবিচ্ছেদ্য গল্পকাঠামোর বিপরীতে দৃশ্যের পর দৃশ্য চিত্র সুষমায় ব্যঞ্জনাময়। গোটা বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের গণহত্যার অমানবিক, বীভৎস, ভয়ংকর চিত্র তিনি তুলে ধরেন :

> আমি রুয়ান্ডায় আঠারোটি তুতসি শিশুকে একত্রে একটি গর্তে কবর দিয়েছি। হুতু সৈন্যরা সীমান্তের কাছে পালিয়ে আসা দু হাজার লোককে একরাত্রে হত্যা করেছিল। আমি সুদানের সীমান্তে গিয়েছিলাম * একটা ট্রাইব যারা মাটি পাথর আর সূর্যের পূজা করত তাদের পুরো একটা গ্রামের মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল সুদানিজ সৈন্যরা।[৪৯]

নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন নতুন ধারার সৃষ্টির প্রয়াসে সর্বদা ব্যাপৃত ছিলেন। তাই লেখক নিজেই তাঁর রচিত wbg¾b নাটকটিকে কাব্য আখ্যা দিয়েছেন। মোটা দাগে বলতে হয় wbg¾b-এ কোনো গল্প নেই। কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে সোনামুখী সুঁইয়ের সূত্রে একটি অন্তর্লীন গল্পের বিস্তার দেখি। কলেজের এক অধ্যাপক এবং তাঁর বন্ধু নানা প্রসঙ্গে একের পর এক হত্যা, ধর্ষণ, কারফিউ, নিপীড়ন, যুদ্ধের বীভৎসতার যোগাযোগ গেঁথে গেঁথে একটি কাঠামো দাঁড় করায়, তাদের নামও জানানো হয় নি। এছাড়া ভাষাশৈলীতে এখানে বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতি চিহ্নের মধ্যে কেবল দাঁড়ি, হাইফেন এবং কোলন ব্যবহার করেছেন। আর সব জায়গার তারকা চিহ্ন ব্যবহার

করেছেন। বাংলার মুসলমানরা তাদের কাব্যে বিশেষ করে উনিশ শতকের পুঁথি সাহিত্যে সব সময় তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা হতো অর্ধযতি দেবার জন্য। মহরমের পুঁথি থেকে এটা নিয়েছেন নাট্যকার।

সেলিম আল দীনের cÎ নাটকটি একটি জটিল উপাখ্যান। cÎ প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত নাটক। গলায় ফাঁস দিয়ে আম গাছের সঙ্গে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। পিতা-মাতা তাদের মৃত পুত্রের ফাঁসি দেওয়া আম গাছের শেকড় জ্বালিয়ে শীতের রাতে সন্তানকে স্মরণ করে। প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ স্বামী-স্ত্রী স্মৃতি কাতরতায় নিমজ্জিত হয় তাদের জীবন ও যৌবনের নানা প্রান্তে। এই নাটকে পিতা-মাতা তাদের পরলোকগত পুত্রের সংস্পর্শে খোঁজে সেই ফাঁসি দেওয়া গাছের শেকড়ের সাথে। তাই দ্রুত শেকড় পুড়িয়ে শেষ করতে চায় বাবা আর মা তাতে বাধা দেয়। গানের সুরে নাটকের গল্পটি যেন একটি অদৃশ্য সুরে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া cÎ নাটকে গানের সুরের প্রাধান্য যেমন আছে তেমনি আছে পদ। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার কিছু অংশ এখানে এলানি সুরের পদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী নাট্যআঙ্গিকের পদ, গান ও কথা প্রভৃতি পরিভাষা cÎ নাটকের শরীরেও প্রত্যক্ষ করা যায়। নাট্যকার নিজেই একাধিকবার বলেছেন, শিল্পে আমি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। আলোচ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শব্দটি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত 'অচিন্ত্যদ্বৈতদ্বৈতাবাদী দর্শন' থেকে গৃহীত। একটি ধর্মদর্শনকে শিল্প-দর্শনে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনেই 'অচিন্ত্য' শব্দটিকে সচেতনভাবে পরিহার করেছেন। শিল্পতত্ত্বের পরিভাষা রূপে উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শব্দটি ব্যবহারের প্রেরণাস্থল বাঙালির প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট সাহিত্য নির্দশনসমূহ। সুতরাং বলা যায়, cÎ নাটকটিও পাঁচালির প্রেরণায় রচিত।

সেলিম আল দীন প্রকৃতিকে নিয়ে লিখেছেন avegvb। সোমেশ্বরী নদীর তীরে গারো পল্লির বা মান্দিদের কাহিনি হলো avegvb। avegvb পাঁচালির রীতিতে রচিত। সোহরাব নামক মোষটিকে নিয়ে গল্প। লিল্লাহর মোষ হিসেবে মোষটাকে কসাইরা জবাই করতে এসেছে তখন মোষটা বিদ্রোহ করে। নদী পার হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সাথে সাথে বি.এস.এফ. গুলি করে। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে রক্ত ঝরিয়ে। মোষটি আত্মসমর্পণ করে। নাট্যকার বুদ্ধের বাণী দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। 'এই কাব্য নাট্যরূপে যে দর্শন করে গীত করে পাঠন্তে চিত্র জাগায় চোখে সে মৃত্যুকষ্ট জয়ী হোক সে দুঃখ জয়ী হোক শোক পারায়ে যাক সবল পায়ে। তদন্তর যুগে যুগে মানব ভূমিতে কীর্তিতে হোক এই মহিষ গাথা।'[৫০] সেলিম আল দীন লোকান্তরিত হবার এক সপ্তাহ আগেও avegvb এর পরিবর্তন পরিবর্ধন, কাহিনি ও শব্দের সংযোজন-বিয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এ রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি

ঔপনিবেশিক অবলেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার একটা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। avegvb নাটকে যতি চিহ্নের প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার তাঁরই প্রাচ্যরীতি অনুযায়ী। নাটকে কোথাও 'কমা' (,) এর ব্যবহার নেই। 'কমা' এর পরিবর্তে সচেতনভাবেই তারকাচিহ্নের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। তারকাচিহ্নই অর্ধযতি বলে বিবেচিত হবে। কেবল বর্ণনাতেই এ চিহ্ন রয়েছে। চরিত্রের কোনো সংলাপে এটি নেই, ড্যাশ দেয়া হয়েছে তাতে। নাটকের মধ্যে যেখানে বর্ণনার শেষ ও সংলাপের শুরু সেখানে একটি ড্যাশ (-) দেওয়া হয়েছে। তবে নাট্যকার বলেছেন, এটি মূলত দাঁড়ি। উপর নিচ লম্বা দাগটিকে ডান-বাম করা হয়েছে মাত্র। অপরপক্ষে যেখান থেকে সংলাপের শুরু, সেখানে কোলন এর পরিবর্তে দাঁড়ি দেয়া হয়েছে।

সেলিম আল দীন পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপরীতির বদলে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরুচির প্রেক্ষাপটে নতুন সংলাপরীতি। তিনি শিল্পের ভুবনকে খণ্ডিত করে দেখেন নি বলেই তাঁর নাটকের বিষয়ভাবনা ও বিষয়ের বিস্তারের একটি মহাকাব্যিক সমুন্নতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচ্যের শিল্পশৈলীর নিজস্ব রূপ ও রীতি নিয়ে তাঁর নাট্য ভাবনার বেড়ে ওঠা। তাঁর নাটকের দর্শনের শেকড় প্রোথিত বাংলাদেশের সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী আখ্যান ও নাট্যরীতির গভীরে। আর তাই তাঁর নাটকের যে কোনো চরিত্রের জীবন ভাবনার ভাঙন গড়নের মধ্যে একটা বিপুল বিস্তারী শিল্পদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বঙ্গীয় জনপদের গীতল এবং কাব্যিক নাট্যরীতির আধুনিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকে। অনেক সমালোচক অবশ্য তাঁর শিল্প সাধনার মূল বিবেচনা সমন্বয়ের কথা বলেছেন। সেলিম আল দীনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব পাশ্চাত্যের নাট্যধারাকে পরিহার করে, অতিক্রম করে, প্রাচ্যের লোকায়িত আখ্যানকে আধুনিকতায় ছাঁচে ফেলে বাংলা নাটককে এক অবিশ্বাস্য নাট্যসমাহার ও মহিমায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। ga¨h‡Mi ewOjv bvU¨ গ্রন্থে তিনি বাংলা নাট্যরীতির পুরাতন প্রায় সকল ধারার ও আঙ্গিকের বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন :

> আমাদের নাটক পাশ্চাত্যের মতো 'ন্যারেটিভ' ও রিচুয়্যাল' থেকে পৃথকীকৃত সুনির্দিষ্ট চরিত্রাভিনয় রীতির সীমায় আবদ্ধ নয়। তা গান, পাঁচালি, লীলা, গীত, গীতনাট, পালা, পাট, যাত্রা, গম্ভীরা, আলকাপ, ঘাটু, হাস্তর মঙ্গলনাট, গাজীর গান, ইত্যাদি বিষয় ও রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।[৫০]

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা শুরু হয় সেলিম আল দীন তাঁর অন্যতম অভিযাত্রী। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের আঙ্গিকগত নিরীক্ষণ এবং আধুনিক যুগগত শিল্পরুচিকে তিনি তাঁর নাট্যসাধনার কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে নির্ধারণ করেন। ১৯৭২-২০০৮ এই সময়বৃত্তে

তাঁর রচিত নাটকে বাংলার গ্রামীণ জনপদ অধিবাসীদের সংস্কার সংস্কৃতি তাদের জীবনসংগ্রাম, সামাজিক, রাষ্ট্রিক শোষণ, পেশাগত রূপান্তর, নারীর অধিকারহীনতা ও বঞ্চনা ইত্যাদি মুখ্য প্রতিপাদ্য। সেলিম আল দীন রচিত নাটকে ব্যক্তি এককভাবে কোনো চরিত্র হয়ে ওঠে না। সমগ্র জনপদ ও তার অধিবাসী, ভূগোল, অরণ্য প্রকৃতি, কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, বৃক্ষলতা সকলের সরব সক্রিয় উপস্থিতিতে একটি নবধারার সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়। তাঁর নাটকে উচ্চবিত্তের শহুরে চরিত্র নয়, বরং তাঁর চরিত্ররা ঘামে-শ্রমে, কামে-প্রেমে, সংঘাতমুখর সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষ। তাঁর নির্মিত সোনাই, কেরামত, চখমা ডাকাত, আনার ভাণ্ডারি, মোদু, বনশ্রী, ডালিমন, শমলা, চুক্কুনী, সয়ফর, নোলক, কালিন্দী প্রমুখ আপন ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত। সেলিম আল দীনের নাটকের চরিত্রগণ নিজ বাসভূমে দৈনন্দিনতার অজস্র সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের ভেতর দিয়ে নাটকে উপস্থিত হয় এবং কর্মের ভাষা, আবেগ প্রকাশের ভাষা অবিচ্ছিন্ন এককে বাধা পড়ে। সুতরাং চরিত্রগুলোকে তার অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূমিজ পরিবেশ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যেই সংগ্রামরত দেখা যায়। তারা তাই কথা বলে তাদের নিজ ভাষায়। নাট্যকার আত্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করে চরিত্র সৃজন করেন। ঘটনার কেন্দ্রে যারা অবস্থান করেন তাদের মুখনিঃসৃত সংলাপ শোনার জন্য দর্শক থাকে উৎকর্ণ। সংলাপ চরিত্রের জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস রূপেই নাটকে উপস্থাপিত। দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রূপ-রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তিনি চরিত্রের সংলাপ রচনা করেন। ফলত, সেলিম আল দীন রচিত নাটকের সংলাপ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সংলাপের গাঠনিক অবয়বটি নাট্যকার স্বয়ং নির্মাণ করলেও অবস্থাগুণে তা চরিত্রের নিজের ভাষ্যরূপেই প্রতিভাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শকুন্তলা নাটকে শূদ্ররূপী তক্ষকের উক্তি কিংবা কন্বের উক্তি। সেলিম আল দীন রচিত নাটকে এমন অনেক সংলাপ গোচরীভূত হয় যা স্বকালের প্রেক্ষাপটে লেখকের জীবনবাণী কিন্তু তার অন্তঃস্থিত অভিপ্রায় একটি দার্শনিক সত্য প্রতিষ্ঠা। লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত শ্রেণির সংলাপ অধিকাংশ স্থলেই নাটকের শৈল্পিক সৌন্দর্যের নিয়ামক। প্রবচনতুল্য সংলাপগুলো সেলিম আল দীনের রচনাশৈলীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং একইসঙ্গে সেগুলো তাঁর চরিত্রচিত্রণের কৌশলও। সাধারণ নাটক প্রচলিত ধারণায় সংলাপাত্মক রচনা। চরিত্র পরম্পরায় সংলাপ একটা পরিণত আখ্যান সৃজন করে। সেলিম আল দীন ইউরোপীয় নাটকের এই কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাটক বিশুদ্ধ সংলাপ নির্ভর রচনা নয় মূলত, আখ্যান প্রধান। সংলাপ স্বল্পতা তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অত্যল্পসংখ্যক সংলাপই বিশিষ্টতায় প্রদীপ্ত। কিছু সংলাপ দার্শনিক

অভিপ্রায়জাত, গভীরতর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। সেগুলো রচয়িতার জগৎবোধ ও জীবনচেতনার অভিব্যক্তি। দর্শক-পাঠকের বিশ্বাস সেই অভিব্যক্তি দ্বারা আলোড়িত হয় অনায়াসে। তাই বলা যায়, তাঁর নাটকের সংলাপগুলো চরিত্রের জীবনবেদ, তাদের অপূর্ণ ও অতৃপ্ত জীবনের নির্মম অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি বলেই সেগুলো জীবনদর্শন রূপেই মূর্ত। সেলিম আল দীনের নাটকের সংলাপগুলো তাই বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল।

সেলিম আল দীন নাটকের ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নাটকের ভাষায় নিজস্ব একটি নির্মিতি লক্ষ করা যায়। সেটা করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন এবং প্রচুর অপ্রচলিত শব্দও ব্যবহার করেছেন। সেলিম আল দীন গদ্য ও পদ্যের আধুনিক ভেদ তুলে দিয়ে বাঙালির হাজার বছরের সাহিত্যের রীতিতে ফিরে যাবার প্রত্যাশা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতলধর্মিতা ও কথকরীতির তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। কেননা ঔপনিবেশিক পরবর্তী সাহিত্য-সংস্কৃতি তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়। ঔপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রাসনকে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে নাটকে প্রয়োগ করেছেন। নাটক যেহেতু সমন্বিত ও প্রায়োগিক শিল্পকর্ম, সেহেতু নাটকে দেশীয় সংস্কৃতি, নৃত্য, কিংবদন্তি এবং ইতিহাসবোধের সর্বোচ্চ প্রয়োগ সম্ভব, যা সাহিত্যের অন্যকোনো শাখায় সম্ভব নয়। উত্তর উপনিবেশ জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম আল দীন। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে দেশজ সংস্কৃতির উপাদানের সফল প্রয়োগ করে বাংলা নাট্যরীতিকে দাঁড় করিয়েছেন ইউরোপীয় নাট্যরীতির বিপরীতে। লেবেদেফের হাত ধরে বাংলা নাটকের ইউরোপকেন্দ্রিক যে পরিচিতি নির্মিত হয়েছিল, তা পরিত্যাগপূর্বক তিনি বাংলার মূল নাট্যঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনলেন। পদ্য ও গদ্যের সংমিশ্রণে বর্ণনাকারীকে প্রসেনিয়ামের মূল ধারণা থেকে বের করে এনে দাঁড় করান পালাগান ও যাত্রাগানের আঙ্গিকে। তুলে আনেন বাংলা পরিবেশন সাহিত্যের আদি শিল্পতত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরীতি প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পের প্রথম ধারা হল একই আঙ্গিকে বিচিত্রতর রীতি ও কৌশলের নৈসর্গিক রূপায়ণ। নৈসর্গিক রূপায়ণ কথাটির অর্থ, শিল্প আঙ্গিকে বিভিন্ন রীতির কোন কৃত্রিম এবং আনুপাতিক হারের সংযোজন নয়। এ এক স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া, কোন গবেষণাগার সম্ভূত রীতি নয়। ... দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট আঙ্গিকের ভেতর থেকে শিল্পগত উচ্চতায় আঙ্গিকের বিলয় দর্শন। সকল রচনা যখন চূড়ান্ত শিল্প সিদ্ধতায় উত্তীর্ণ তখন আঙ্গিকগত দ্বৈতবাদ নৈসর্গিক পন্থায় লুপ্ত হয়। এও এক ধরনের ভেদ-অভেদাত্ম রীতি। ... দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পের তৃতীয় ধারা হল, বিপুলতর পরিধি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সর্বত্র এক সংহত ঐক্য জীবন চেতনার পরম অন্বেষণ। শিল্পের নানা

> তরঙ্গভঙ্গকে অর্থ ও অলঙ্কারগত ঐক্যে সংহতকরণ। এ শ্রেণির শিল্পকর্মের ভাষা, ভাষাগত উপাদান, সুর, ছন্দ, লয় আপাতবিচ্ছিন্নতার নানা উপাদানের অন্তরালে অদ্বৈতের আভাস দেয়।[৫২]

নাট্যের পশ্চিমা আঙ্গিক থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে এনে দাঁড় করান বাংলার চিরায়ত বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে। কবিতা, গান, নাচ ও সংলাপের সমন্বয়ে কথকের মাধ্যমে পরিবেশন করেন তাঁর নাটকের পাঠ। তিনি সাহিত্যের নানা বিভাজনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত স্মরণীয় :

> আমার লেখাগুলি ঐতিহ্যবাহী বাংলা পাঁচালি ও কথকতার ধারার সমকালীন প্রয়াস। ধরা যাক, PvKv। নাটকটির গঠন কৌশলে উপন্যাসের সকল শর্তই রক্ষিত আছে। কিন্তু আবার এতে নাটকের প্রাচ্য দেশীয় শিল্পরূপটিও অক্ষুণ্ন রয়েছে। অন্যদিকে PvKv-কে কবিতাকারেও সাজানো যায়। আরো এক পা এগিয়ে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, PvKv কবিতাকারে সাজানোর পর তা গীত-বাদ্যযোগেও পরিবেশিত হতে পারে। ‰heZx Kb¨vi gb, niMR একই ধারার লেখা। ebcvsï j-এ সুনির্দিষ্টভাবে আমি বাংলা পাঁচালিরীতি অনুসরণ করেছি। এতে কথা, পদ, বোলাম, নাচাড়ি প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে। আধুনিককালে এ ধরনের কোনো শিল্প-আঙ্গিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি। একটি রচনা যখন মঞ্চে পরিবেশিত হওয়া ব্যতিরেকেও উপন্যাসের সকল বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে, তখন তা কেন কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে না? যদি সমালোচকরা ebcvsï j বা cvP¨-এর মতো লেখাকে বাংলা কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করেন, তবে তা তাদের অধীত সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা, আমার নয়। সাহিত্যে বর্গ-বিভাজন ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত। ও আমি মানি না। কারণ, আমাদের শিল্পরুচি চিরকালই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তবে এর অর্থ এ নয় যে, আমাদের কালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পর্যন্ত কোনো মহৎ সাহিত্যকর্মকে আমি অস্বীকার করছি। বরং আমি তাদের শেকড়স্পর্শী শিল্পকর্ম থেকে শিক্ষাটা গ্রহণ করেছি।[৫৩]

বাংলা নাট্যজগৎ পশ্চিমা প্রাধান্য বিস্তারকারী শিল্পরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি এই প্রাধান্য বিস্তারকারী শেকড়হীন শিল্পধারার বিপরীতে স্থানীয় ধারা নির্মাণে ব্রতী হন। বাংলা নাটক যে ইউরোপীয় একক নন্দনভাবনার আওতায় ছিল, তিনি তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করেন নি, তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও যৌথ অবচেতনার জগৎকে বিনির্মাণ করেন তাঁর কাজে, তাঁর পাঠকৃতিতে। এই সূত্রে তিনি এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনঃনির্মাণ করেছেন। তাঁর হাতেই রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা নাটকের রূপ ও রীতি বাঙালি জাতির সহস্র বছরের নাট্যধারার সঙ্গে একীভূত হয়েছে। এদেশের মানুষের আত্মার ক্রন্দন ধ্বনিটি তাই বড় অন্তরঙ্গ হয়ে বাজে সেলিম আল দীনের

শিল্পবীণার তারে। তাঁর নাটকে এই ভূ-খণ্ডে বসবাসরত জাতি ও নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির অন্তর্গত রূপটি বিশ্ববীক্ষায় অবয়ব পেয়ে যায় শিল্প সৃজনের অসীম সম্ভাবনা ও সৌন্দর্যে। বিষয় ও আঙ্গিকের দ্বৈত নিখিলে তিনি সব সময়েই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পস্রষ্টা।

সেলিম আল দীন হাজার বছরের বাংলা নাটকের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে প্রমাণ্যপূর্বক সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপনিবেশিক ভাবালুতাপুষ্ট প্রচলিত ইতিহাসের বিপরীতে। মহাকাব্যিক বিস্তারে প্রণীত পাঁচালি ও মঙ্গলকাব্যসমূহের আঙ্গিকে বাঙালির নন্দনতাত্ত্বিক চেতনায় আধুনিক মনন ও বৈশ্বিক শিল্পভাবনায় তিনি প্রণয়ন করেছেন তাঁর নাটক। সেলিম আল দীন মধ্যযুগের কাব্যসমূহ নিবিড়ভাবে গবেষণা করে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, বাঙালির জাতীয় নাট্যাঙ্গিকের মূল শেকড় নিহিত মূলত জারি, ঘেটু, অষ্টক, সঙযাত্রা, মঙ্গলনাট, মাদারপীরের গান, হাস্তর, কিচ্ছা, কথকতা, গম্ভীরা, আলকাপ, গীতিকা, পুতুলনাট্য প্রভৃতি অজস্র লোকজ অনুষঙ্গে। 'ঢাকা থিয়েটার' ও 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার' সেলিম আল দীন প্রদত্ত শিল্প দর্শনের আলোকিত পথে নাসির উদ্দীন ইউসুফের নেতৃত্বে বিস্তৃত হতে থাকে 'জাতীয় নাট্য আঙ্গিক' বির্নিমাণের অভিযাত্রা। তাঁরা নাট্য উপস্থাপনা বা মঞ্চায়নের জন্য যাত্রামঞ্চের আদলে ঐতিহ্যবাহী চৌকোণ খোলা মঞ্চকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহ্যবাহী মৌখিক রীতির পরিবেশনার উজ্জীবনের। 'ঢাকা থিয়েটার' 'জাতীয় নাট্যাঙ্গিক প্রকল্প' অধীনে গবেষণা প্রযোজনা রচনা করে গাজীর গান। সুতরাং দেখা যায়, মৌখিকরীতির নাট্যনির্মাণ, চৌকোণ খোলা মঞ্চ, গ্রামীণ মেলা, জাতীয় নাট্যাঙ্গিক বিনির্মাণ প্রভৃতির নন্দন ভাষ্যকার সেলিম আল দীন। বাংলা নাটকের বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখিতা যে পরস্পরের পরিপূরক তিনি তা উল্লেখপূর্বক হাজার বছরের বাংলা নাটকের ঐতিহ্যবাহী বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির প্রচলন করেন। এভাবেই তিনি আঙ্গিকমুক্তির কথা বলেছেন যা শিল্পে অদ্বৈতাদ্বৈতবাদী। সেলিম আল দীন ও তাদের সংগঠন 'ঢাকা থিয়েটার' জাতীয় নাট্যাঙ্গিকের কথা বলেছে। জাতীয় নাট্যআঙ্গিক বলতে হাজার বছর ধরে বাঙালি চর্চিত নাট্য আঙ্গিকসমূহের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট আধুনিক বাংলা নাটকের গঠনগত অবয়নকেই বুঝিয়েছেন। সেলিম আল দীন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নাট্যসমূহ পঠন-পাঠন এবং বিচার বিশ্লেষণ করে জাতীয় নাট্যাঙ্গিক পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। অতঃপর নিজেই নিরলস শ্রমে কঠোর সাধনায় কথিত আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তে সুস্পষ্ট একটা কাঠামো দাঁড় করান। নৃত্য-গীত-বাদ্য-কথা-কথকতা সংবলিত নাটকই সেলিম আল দীনের বিবেচনায় সত্যিকার অর্থে বাংলা নাটক। এর অঙ্গ-উপাঙ্গ সমন্বয়ে যে রূপটি দর্শকচিত্ত জয় করে আসরে আসরে, তাই জাতীয় নাট্যাঙ্গিক।

বাঙালির আধুনিক নাটককে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নসূত্রে গ্রথিত করতে আজীবন প্রয়াসী ছিলেন সেলিম আল দীন। তিনি আদি ও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের গঠন স্বরূপটি আবিষ্কার করতে অভিলাষী, দ্বিতীয়ত, বাংলা নাটকের গঠন রূপটি আবিষ্কার অন্তে বাঙালির আধুনিক জীবন ও জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষাগুলোকে সেই আঙ্গিক বা গঠন রূপের মধ্যে ধরতে প্রয়াসী। সেলিম আল দীন তাঁর শেকড়সন্ধানী অভিযাত্রায় শিল্পসারথীদের নিয়ে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন 'বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার' নামক সংগঠন। বাংলা নাটকের বিলুপ্ত প্রায় নাট্যআঙ্গিক অনুসন্ধান ও অস্তিত্বশীল আঙ্গিক সমূহের উপস্থাপনারীতি, অভিনয় কৌশলসমূহ আত্মস্থ করে বাঙালির নিজস্ব অভিনয়রীতির আধুনিক রূপ সৃজন ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আঙ্গিকসমূহের রূপান্তর ও পরিশীলনের মাধ্যমে বাংলা নাটকের আধুনিক আঙ্গিক প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকের আধুনিক রূপকার সেলিম আল দীন। তাঁর অনুসারী নাট্যকারদের মধ্যে রয়েছেন সালাম সাকলাইন, সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, আফসার আহমদ, তৌফিক হাসান ময়না, আসাদুল্লাহ ফারাজি, মাসুম রেজা, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, আহসানুল কবীর লিটন, কাজী সাইদ হোসেন দুলাল প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. অজিতকুমার ঘোষ, evsjv bvU‡Ki BwZnvm (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫), পৃ. ৪

২. সুকুমার সেন, bU bvU¨ bvUK (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. ২য় মুদ্রণ ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০০

৩. অজিতকুমার ঘোষ, evsjv bvU‡Ki BwZnvm, পৃ. ১০০

৪. জামিল আহমেদ, evsjv‡'‡ki bvUK I bvU¨Kjv (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৮২

৫. সেলিম আল দীন, "জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., cmwjg Avj 'xb iPbvmgM- 1 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ৮১

৬. সেলিম আল দীন, "আতর আলীদের নীলাভ পাট", †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-1, পৃ. ২৮০

৭. রশীদ হারুন, †mwjg Avj 'x‡bi bvU¨wb‡'kbv b›'bfvI¨ I wkíiwZ (ঢাকা: ইছামতি প্রকাশনী, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০

৮. আফসার আহমদ, g‡Âi wU‡jvRx I Ab¨vb¨ ceÜ (ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৮৪

৯. সেলিম আল দীন, "wKËb‡Lvjv", সাইমন জাকারিয়া সম্পাদ., †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-2 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ৮৮

১০. †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-2, "ভূমিকা", দ্রষ্টব্য

১১. সেলিম আল দীন, "কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা" মাহমুদ শফিক গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সংকলন ও গ্রন্থন, Knb K_v (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০০৮), পৃ. ২৮

১২. সেলিম আল দীন, "কিত্তনখোলা", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-2 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ৮০

১৩. Z‡'e, পৃ. ৮৯

১৪. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", cmwjg Avj 'xb iPbvmgM-2, পৃ. ২৮০

১৫. সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-2, পৃ. ৩৬৪

১৬. সেলিম আল দীন, "কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা", মাহমুদ শফিক গৃহীত সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৭

১৭. সেলিম আল দীন, "হাত হদাই", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-3 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ৮২

১৮. Z‡'e, পৃ. ৫৮

১৯. বেগম আকতার কামাল, "সেলিম আল দীনের 'মঞ্চের ট্রিলজি: শিল্পদর্শনের তিন সূত্র", সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা., DjLvMov, দশম সংখ্যা (আগস্ট, ২০০৮), পৃ. ১৮৫

২০. সাইমন জাকারিয়া, evsjv‡'‡ki †jvKbvUK welq I Aw½K ˆewPÎ¨ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৩২৭

২১. সেলিম আল দীন, "হাত হদাই", †mwjg Avj 'xb iPbvmgM-3, পৃ. ১৩৩

২২. সেলিম আল দীন, "কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা", মাহমুদ শফিক গৃহীত সাক্ষাৎকার", পৃ. ৩০

২৩. Z‡'e, পৃ. ৩০

২৪. cmwjg Avj 'xb iPbvmgM-4, "পরিশিষ্ট", পৃ. ৭৩৩

২৫. Z‡'e, পৃ. ৭৩৫

[২৬] সেলিম আল দীন, "চাকা", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ১২৬

[২৭] Z‡‘e, পৃ. ১২৮

[২৮] সেলিম আল দীন, "চাকা", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ১৪১

[২৯] হাসান শাহরিয়ার, "আলাপনে সেলিম আল দীন", হাসান শাহরিয়ার সম্পা., থিয়েটারওয়ালা, দশম বর্ষ: ১-২, যৌথ সংখ্যা (জুন, ২০০৮), পৃ. ১৭৬

[৩০] সেলিম আল দীন, "চাকা", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ১৩৯

[৩১] Z‡‘e, "চাকা", পৃ. ১৩০

[৩২] সেলিম আল দীন, "কথাপুচ্ছ", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ১৬৪

[৩৩] সেলিম আল দীন, "কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা", মাহমুদ শফিক গৃহীত সাক্ষাৎকার, পৃ. ২৬

[৩৪] সেলিম আল দীন "পরিশিষ্ট", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ৭৩৭

[৩৫] সেলিম আল দীন, "যৈবতী কন্যার মন", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ১৯৬

[৩৬] সেলিম আল দীন, "কাজের ভাষা গদ্য শিল্পীর ভাষা কবিতা, পৃ. ২৯

[৩৭] সেলিম আল দীন, "হরগজ", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ২৬৫

[৩৮] Z‡‘e, পৃ. ২৮৬

[৩৯] সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ৭৩১

[৪০] লুৎফর রহমান, bvU¨ weIqK ceÜ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী), ২০০৫, পৃ. ৯৪

[৪১] লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK (ঢাকা: নান্দনিক প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১০২

[৪২] সেলিম আল দীন, "বনপাংশুল", সাইমন জাকারিয় সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-5 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০), পৃ. ৪৮৫

[৪৩] সেলিম আল দীন, "সেলিম আল দীনের মুখোমুখি," মনজুরুল হাসান দুলাল গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সংকলন ও গ্রন্থন, Knb K_v (ঢাকা: শুদ্ধস্বর), পৃ. ৬০

[৪৪] সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৫৭৩

[৪৫] Z‡‘e, পৃ. ৫৬৬

[৪৬] Z‡‘e, পৃ. ৫৬৮

[৪৭] সেলিম আল দীন, "প্রাচ্য", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ১৬

[৪৮] সেলিম আল দীন, "নিমজ্জন", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-6, পৃ. ১০৫

[৪৯] Z‡‘e, পৃ. ২০৫

[৫০] সেলিম আল দীন, avegvb (ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী), পৃ. ১৭৫

[৫১] সেলিম আল দীন, "মধ্যযুগের বাংলা নাট্য", †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-4, পৃ. ৩২৬

[৫২] সেলিম আল দীন, "বাংলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর", w_‡qUvi ÷wWR, ৩য় সংখ্যা, জুন- ১৯৯৫, পৃ. ২৮-২৯

[৫৩] সেলিম আল দীন, আমিরুল ইসলাম আমির গৃহীত সাক্ষাৎকার, সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল সংকলন ও গ্রন্থন, Knb K_v (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০০৮), পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ কথা

সেলিম আল দীন স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সবচেয়ে বেশি নাটক ও নাট্যতত্ত্ব নিয়ে নিরলস গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল চেতনা অন্বেষণ করে তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দুইশত বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশ ও পাকিস্তানিদের নব্য উপনিবেশমুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যজগৎ মুক্ত বাতাসে বিচরণ করার সুযোগ পায় ১৯৭১ সালের পর। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। তাঁর রচিত প্রথম পর্বের নাটকে যেমন আছে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা ইতিহাস তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ। সেলিম আল দীন স্বাধীনতা উত্তরকালে লিখলেন mc welqK Mí ও msev‘ KvUb প্রভৃতি মঞ্চসফল সাড়া জাগানো নাটক। এসব নাটক তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়জ্ঞাপক। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় দেশের মানুষ যখন অস্থির তখন স্বদেশ প্রেমিক সমাজসচেতন নাট্যকারেরা রচনা করলেন বেশ কিছু প্রতিবাদী চেতনার নাটক। এ পর্যায়ে সেলিম আল দীনের Kwig evlqvjxi kÎæ অথবা gj gL †‘Lv, gbZwmi প্রভৃতি নাটক প্রতিরোধী প্রেরণায় রচিত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে যে পরিবর্তন এসেছে, তাতে বিভিন্ন নাট্য সংগঠনের রয়েছে বিপুল তৎপরতা। ‘ঢাকা থিয়েটার’ এক্ষেত্রে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই সংগঠনটি সেলিম আল দীনের নাটক একের পর এক মঞ্চস্থ করেছে। দেশজ মৌলিক নাটক মঞ্চায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল এই দলটি। ফলে এসব নাটকে এসেছে কঠিনবাস্তবতা, মূল্যবোধের সংঘাত এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব। সমকালীন বাস্তবতার পথ ধরেই নাট্যকার হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু। পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে তিনি নাটকের বিষয় নির্বাচন করেন। তাঁর নাটকের প্রধান প্রবণতা সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের নানা টানাপোড়েন, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আশা, হতাশা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রভৃতি তিনি নাট্যকাহিনির উপজীব্য হিসেবে বেছে নেন। তরুণ সমাজের অবক্ষয়, হতাশা এবং তার পশ্চাতের কারণসমূহ উন্মোচনে তিনি সতর্ক শিল্পী। সমকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে রচিত G·‡cøwmf I gj mgm¨v এবং gbZwmi নাটক। মুক্তিযুদ্ধকে সেলিম আল দীন প্রত্যক্ষ করেছেন সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টিতে। আবার মুক্তিযুদ্ধ সংলগ্ন বছরগুলোর সমাজকে তিনি দেখেছেন বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায়। নিবিড় শৈল্পিক দৃষ্টিপাতের কারণে

তিনি সহজেই তুলে আনতে পেরেছেন যুদ্ধোত্তর ক্ষয়-অবক্ষয়, আশা-হতাশার চিত্র। মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে বিশেষকরে তরুণ সমাজের মাঝে দেখা দেয় চরম অবক্ষয়। এই অবক্ষয়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিপথগামী তরুণ সমাজ বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অবৈধ ব্যবসার মালিক হয়ে কেউ কেউ হয়ে ওঠে অঢেল কালো টাকার মালিক। এদের মধ্যে অনেকেই এদেশের স্বাধীনতার জন্য কাঁধে রাইফেল নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অথচ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলে গিয়ে হাত মিলিয়েছেন স্বাধীনতার শত্রুদের সাথে। ফলে বাংলাদেশের সমাজে দেখা দেয় এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা। সমগ্র সমাজকাঠামোতে নেমে আসে অস্থিরতা। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ চিনে নিতে কষ্টকর হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর নাট্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে এই সমাজবাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'স্বাধীন বাংলাদেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ লুণ্ঠনের পটভূমিতে সেলিম আল দীন এ পর্যায়ে রচনা করেন প্রতীকধর্মী নাটক gbZvmxi d¨v›Uvmx'।[১] বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয় তাঁর নাটকে বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি নাটকে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সমাজের নানা অসঙ্গতি, সমাজের অভ্যন্তর ভাগে সৃষ্ট অবক্ষয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির পাশাপাশি ব্যক্তি মানুষের নানামুখী অভীপ্সা তুলে ধরেন। স্বাধীনতা-উত্তর তরুণ নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল আবদুল্লাহ আল মামুন ও সেলিম আল দীন সামাজিক বক্তব্যকেই নাটকে তুলে ধরেন।

সেলিম আল দীনের নাটকসমূহকে কয়েকটি পর্বে বিন্যাস করে গবেষণাকর্ম সম্পাদনা করা হয়েছে। তাঁর প্রস্তুতি পর্বের নাটকের আঙ্গিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। RwÛm I wewea †ejb এবং G·‡cøvwmf I gj mgm¨v নাটক দুটি অ্যাবসার্ড রীতিতে রচিত। এছাড়া এ পর্বের mse‡v' KvUb ও gbZvwmi হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা, যা পাশ্চাত্য মিউজিক্যাল কমেডির আদলে নির্মিত। মিউজিক্যাল কমেডি এদেশের নাটকের জগতে একটি নতুন রীতি। তবে পাশ্চাত্যে এটি জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশে সমাজ এবং অর্থনৈতিক শোষণ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এই বিশেষ নাট্যশিল্পরীতি একটি ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে। মিউজিক্যাল কমেডি মানে প্রেম সর্বস্ব নয়, দারিদ্র্যপীড়িত সমাজ এবং উদারসর্বস্ব একজন মানুষও এ শ্রেণির নাটকের বিষয় হতে পারে। সংগীত সংযোজন নাটকটিকে দিয়েছে অভিনবত্ব। gbZvwmi নাটকে সংগীত ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায় :

> ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনায় এ নাটকের সকল সুরই দলের কর্মী শিমুল ইউসুফের দেয়া। উদ্বোধনী ঐকতানে যাত্রার সুর ব্যবহৃত হয়েছিল। এ নাটকে শিমুল বাংলা গানের তিনটি ধারার দক্ষ প্রয়োগ

> করে যেমন– লোকজ সংগীত-রাগ-রাগিণী ও আধুনিক রীতি। কয়েকটি ক্ষেত্রে অতুল-নজরুল-রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুকৃতি ছিল। নানাপদে সুরারোপের কারণে মূল রচনার মাঝে মাঝে দু'একটি পংক্তি বদলাতে হয়েছে। ছন্দ আর সুরের চলন যে ভিন্ন।[২]

প্রাথমিক পর্বে তিনি 'ঢাকা থিয়েটার' দলের অভিনয় শিল্পীদের সক্ষমতা ইত্যাদি মাথায় রেখে নাটক রচনা করেছেন। এই পর্ব তাঁর মানস গঠনের পর্বও বটে। আর এই মানস গঠনের ব্যাপারে তাঁর বন্ধু ও নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফের একটি বিরাট ভূমিকা আছে বলে ধারণা করা হয়। এই পর্বে তিনি kKš Í jv নাটক রচনার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে রচিত kKš Í jv নাটকে তিনি কাহিনি বর্ণনা ও সংলাপ নির্মাণে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে সেলিম আল দীন সমকালীন অপরাপর বাঙালি নাট্যকার অনুসৃত শিল্পরীতির অনুগামী। অনুজের শিল্পপদ রেখা নিজস্ব ভূমি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত অগ্রজের পদাঙ্ক অনুযায়ী হবে এটাই হয়তো শিল্পশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়ম। যুগন্ধর শিল্পী প্রবাহিনী নদীর নিয়মে প্রথাগত পথে চলতে চলতে একান্ত আপন পথটি সৃষ্টি করেন চলার স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তে। ভাবের সঙ্গে বিষয়ের সঙ্গতি সাধন এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্যানুগত ভাষা ও গল্পকথনের নিজস্ব ভঙ্গি বিনির্মাণের পাশাপাশি শিল্পী স্বীয়রীতি প্রকাশের জন্য একটি সৃজন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক রীতির নাটক রচনার মধ্য দিয়ে সেই সৃজনী পথের অনুসন্ধান শুরু করেন। তিনি wKËb‡Lvjv নাটকের শৈলী নির্মাণের মাধ্যমে এই অন্বেষণের শুরু করেছিলেন।

বাংলা জনপদের নাটক বাংলার আবহমান জনপদের ইচ্ছা, বাসনা ও বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ। বহুবিচিত্র মানুষ এখানে বাস করে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নানা বৈচিত্র্যে মিলেমিশে আছে এদেশের মানুষ। কেউ বাস করে পাহাড়ের টিলায়, কেউ কেউ সমতলে। কারো বাসভূমি গৌড় বরেন্দ্র ভূমিতে। আবার কারো ঘর সমুদ্র থেকে সদ্য জেগে ওঠা নরম ঘাসের দ্বীপে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের প্রকৃতি ও জনপদ গড়ে উঠেছে দু'হাজার বছর ধরে। বাংলার প্রকৃতি স্নিগ্ধ, নীলাকাশ কখনো আর্দ্র, কখনো বা রুদ্র। ভয়ংকর উচ্ছ্বাস আছে সাগরে। এখানকার মানুষ সরল, শান্ত এবং সহিষ্ণু। আবার সময়ে কঠিন, প্রচণ্ড। সেলিম আল দীন রচিত wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n'vB, PvKv, ^heZx Kb¨vi gb, niMR, cvP¨, wbg¾b প্রভৃতি নাটকে আবহমান বাংলার ভূ-প্রকৃতি, জীবনধারা, জীবনসংগ্রাম, সংস্কৃতির রূপ-বৈচিত্র্য প্রভৃতি উঠে এসেছে। শেকড়ের সন্ধানে প্রতি নিয়ত তাঁর গবেষণা। তাঁর রচিত নাট্যকর্ম শুধু নাটক নয়, গবেষণাকর্মও বটে। তিনি নাটকের বিষয়

অন্বেষণে সর্বদা দেশজ সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একটি ভূমিজ বিষয়বস্তু নির্ভর জীবনধারা তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ভূখণ্ডের হাজার বছরের ইতিহাস এবং প্রকৃতির প্রাণময় সৌন্দর্যের কথা তাঁর নাটকে চিত্রিত হয়েছে। wKËb‡Lvjv নাটকে গ্রাম-বাংলার চিরায়ত জীবনধারা, বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির বিশ্বাস, আচার-আচরণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। মহাকাব্যিক পটভূমিতে রচিত wKËb‡Lvjv নাটক জনজীবনের ব্যাপক কোলাহলে ভরপুর। এখানে নাট্যকার নাটকের মধ্যে নিয়ে আসেন কথাসাহিত্যের বর্ণনাধর্মিতা। তিনি মনে করতেন চেতন-অবচেতনের অনেক কিছু সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই অভাববোধ থেকেই তিনি বর্ণনামূলক নাট্যরীতি প্রবর্তনের প্রয়াস পান। একজন গায়েন বর্ণনাত্মক রীতির আশ্রয় নেন এবং গায়েন কাহিনির অন্তর্গত চরিত্রগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে লোক নাট্যরীতির প্রভাব আছে। নাট্যকার wKËb‡Lvjv নাটকে মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুসরণ করেছেন। এ নাটকে তাঁর অভিনবত্ব হলো তিনি সংলাপের মধ্যে প্রবচন ও বাগধারা ব্যবহার করেছেন।

সর্গের বন্ধনে রচিত wKËb‡Lvjvর অন্তর্গত স্বভাব বর্ণনাত্মক অর্থাৎ নৃত্য-গীত-কথা-কথকতা নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আশ্রয়ে আসরে আসরে পরিবেশনযোগ্য। বাঙালির আসরকেন্দ্রিক নাট্যসাধনার সকল বৈশিষ্ট্য wKËb‡Lvjv-য় বিদ্যমান। ইংরেজরা এদেশে আসার বহুপূর্বেই এদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্ম যাত্রার আসর বসত। যাত্রার আসরে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয় না। যাত্রাভিনয়ের জগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ। এ আসরে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং এটি বোধ হয় যাত্রাগানের প্রধান শক্তি। যাত্রার আসর প্রায় একটি সভার মতো। অভিনেতাদের আগমন ও নির্গমনের একটা পথ খোলা রেখে আসরের চতুর্দিকে দর্শক আসন গ্রহণ করে থাকে। মঞ্চ একটি থাকে, তবে সেটা চারদিক থেকেই উন্মুক্ত। অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর দিয়ে এবং অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে চারদিকে ঘোরাফেরা করে অভিনয় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> যাত্রা যেহেতু মুক্তাঙ্গনে অভিনীত, সেজন্য যাত্রা মঞ্চের চারদিকে খোলা, দর্শক চারদিকে বসেন। মঞ্চে কোন উপকরণ থাকে না। এ খোলা মঞ্চে উপকরণহীন যাত্রাভিনয়ের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠলো বর্ণনাত্মক সংলাপ। কারণ থিয়েটারে যেখানে মঞ্চপট এবং অন্যান্য উপকরণ আবহ সৃষ্টিতে সক্ষম, সেখানে যাত্রার পাত্র-পাত্রীদের স্থান কাল পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে অর্থাৎ সমস্ত বার্তাবরণ সৃষ্টিতে সংলাপকেই নির্ভর করতে হয়। থিয়েটারের অভিনয় তৈরি আবহে, আর যাত্রায় অভিনয় দিয়ে আবহ সৃষ্টি করতে হয়।[৩]

সেলিম আল দীনের †KivgZg½j ও nvZ n'vB নাটক দুটিও লোকজ জীবন নির্ভর এবং বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত। নাট্যকারের মতে, তথাকথিত ইউরোপীয় প্রসেনিয়ম থিয়েটারের ঢঙে বাংলার প্রকৃত নাটক কখনই লেখা হয় নি। বাংলা জনপদের জন্য প্রসেনিয়াম থিয়েটার কখনই মুক্তির সাধনা নয়। তাঁর মতে, এ ধরনের থিয়েটার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও আগ্রহ দেখাতে পারেন নি। বাংলার জনপদ ও জীবন রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রধান কুশীলব। গান ও বিবেক রবীন্দ্রনাট্যের প্রধান সুর। রবীন্দ্রনাথ বরং যাত্রার আঙ্গিকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যা তাঁর নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, কবি কাজী নজরুল ইসলামের gagvjv নাটকও মুক্তমঞ্চের নাটক। পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন মুক্ত মঞ্চচেতনায় নাটক লিখেছেন। তিনি লোকজ জীবন ও উপাখ্যান নিয়ে রচনা করেছেন †e‡'i †g‡q, cÙvcvi I cjøxea প্রভৃতি নাটক। নাট্যকার আজিমউদ্দীন আহমদ সরাসরি পালাগান থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে রচনা করেছেন gûqv এবং KvÂb। এভাবেই cee½ MxwZKv, gqgbwmsn MxwZKv প্রভৃতি লোকজ কাহিনি বাংলা নাটকের অসামান্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য সে সময় যাত্রা বা লোকজ আঙ্গিকের নাটকগুলি পাশ্চাত্যের আলো দিয়ে উন্নততর শিল্পকর্মে পরিণত করা যেত। বাংলার লোককাহিনি আছে, আছে পালাগান, রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাদু, ছড়া, প্রবাদ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্য। আরও আছে উৎসব পার্বণের গান। তবে লোকজ সংস্কৃতি কোন স্থায়ী বা অনড় জীবনবোধ নয়। সময়ের ধারাতে এবং কালের প্রবাহে বিভিন্ন কারণে বিবর্তিত জীবন যাপনে লোকজ সংস্কৃতিরও রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটে। সেলিম আল দীনের নাটকে লোক জীবনের নিবিড় যোগাযোগ ছাড়াও বহুকাল আচরিত বাংলার জীবনের বিচিত্র সব স্বাদ অনুভব করা যায়। তাঁর nvZ n'vB নাটকে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী মানুষের জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। নোয়াখালি অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির নাটকটি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও মঞ্চস্থ হয়েছে। ১৯৯৯ এর ডিসেম্বরে নাট্য সংগঠন 'নান্দীকার'- এর আমন্ত্রণে কলকাতায় গিয়েছিলেন নাসির উদ্দীন ইউসুফের নেতৃত্বে 'ঢাকা থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠী। 'ঢাকা থিয়েটার'-এর প্রযোজনায় সেখানে nvZ n'vB নাটকের তিনটি অভিনয় হয়। নাটকটি দর্শক শ্রোতাদের দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল। এ প্রসঙ্গে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার কলকাতার কড়চায় বলা হয়েছিলো: 'স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পরে, সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় যে কয়েকজন নাট্যব্যক্তি বাংলাদেশের নাটককে অসামান্য গৌরবে ভূষিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেলিম আল দীন অগ্রগণ্য'।[৪] মূলত nvZ n'vB বাংলার জনজীবনের ঘনিষ্ঠ এক অভিজ্ঞতার মেলা সাজিয়ে দেয় দর্শক শ্রোতার চোখের সামনে। সকলের ভাষা হয়তো সব সময় দর্শকেরা বোঝে না, কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখ ঠিকই এসে আঘাত করে। নদী-সমুদ্রের ঢেউ যেমন করে

বারবার আঘাত করে এই চরবদ্ধ গ্রামের উপকূলকে। এ নাটকে আছে নৃত্য, সংগীত ও বর্ণনার অবিমিশ্র রূপ। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> তিনি নাটক লিখেছেন শিল্পের ভাঙন গড়নের অবিনাশী পথ পরিক্রমায়। বিশ্বনাটকের প্রচলিত রীতি ভেঙেছেন প্রবল আত্মবিশ্বাসে। আর এই বিশ্বাস উৎসারিত হয়েছে তাঁর নব নব শিল্প ভাবনার ধ্যানগ্রস্ত তন্ময়তা থেকে। তিনি বাংলা নাটকের সংলাপ রচনার ঔপনিবেশিক আনুগত্য স্বীকার না করে হাজার বছর ধরে চলে আসা নৃত্য, সংগীত ও বর্ণনার কৌশলকে সংলাপে আত্মীকরণ করে আধুনিক জীবন ও শিল্পভাবনার সমান্তরাল করেছেন বাংলা নাটককে।[৫]

†KivgZg½j নাটকের বারোটি খণ্ডের মাধ্যমে নাট্যকার আবহমান কালের শোষিত ও নিপীড়িত গণমানুষের ছবি অঙ্কন করেছেন। এদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ জমিদার, জোতদার, তালুকদার, প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতা দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত হয়। সেই বঞ্চনার বহুচিত্র †KivgZg½j এ উত্থাপিত হয়েছে। কেরামত দিনের পর দিন বছরের পর বছর সামাজিক অনাচার-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা আর নির্মম নিষ্ঠুরতার মধ্যে বেড়ে ওঠে। তাই সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় তার জীবন: 'আমি হেই নখলার হেই কেরামত গো দাদা বোকাই চণ্ডী। মহরমের দুলদুল মানষের নখে নখে জনম ভর ছিঁড়া ফাইড়া গেছি।'[৬] সেলিম আল দীন তাঁর নাটকে ইসলামি পুরাণ, লোকপুরাণ, রূপকথা, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর পুরাণ, জাতকের গল্প, মধ্যযুগীয় প্রণয় পাঁচালি ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। তাঁর নাটকে বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> wKËb‡Lvjv সামাজিক রূপান্তরের যে খেলা গোচরীভূত হয় তা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ফলশ্রুতি। †KivgZg½j ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়ন ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ইতিহাস-ক্ষমতাসীনদের সৃষ্ট নরকের প্রত্যক্ষ চিত্র। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জমিদারতন্ত্রের উচ্ছেদকালীন সামাজিক অবক্ষয়, পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগের দমন-পীড়ন, চুয়ান্ন সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকে ঘিরে ভাষা আন্দোলন প্রসূত স্বাধিকার চেতনা, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল বাস্তবতা, রাজাকার আল বদরদের ঘৃণ্য অপরাধ এসবই †KivgZg½ল-এর ক্যানভাসে বাস্তবতার চিত্র এবং চিত্রভাষ্য।[৭]

সেলিম আল দীনের নাটকে যে জীবনবোধ চিত্রিত, সে জীবনের সৌরভ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি চেষ্টা করেছেন জাতীয় মঞ্চ কেবল একটি মঞ্চ হবে না, নানা প্রকরণে অপরিমেয় সম্ভাবনা দিয়ে আমাদের মঞ্চ আলোকিত হবে। নাট্যচর্চা রাজধানীর সামান্য

কয়েকটি কক্ষে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ নাট্যচর্চা মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র মান-অভিমান, চাওয়া-পাওয়া আর হাস্যকাণ্ডের মধ্যে বন্দি থাকবে না। বাংলাদেশ অনেক প্রাচীন, দীর্ঘ এবং বহু বিচিত্র এবং বর্ণাঢ্য। বাংলার জীবন হবে বাংলার নাটক। এ বঙ্গ জনপদের ইতিহাস সমৃদ্ধ ও পুরাতন। কালের বহমান ধারায় তার সংস্কৃতির গৌরব গাঁথা উঠে এসেছে সেলিম আল দীনের নাটকে। বাংলা নাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের নাটকের যোগ বৃহত্তর আকর্ষণে সংলগ্ন। কিন্তু বিষয় বিন্যাসে, সংলাপ ও জীবনমুখীতায় বাংলাদেশের নাটক অচিরেই তার নিজের ভূমিকা সন্ধান করে নিতে পেরেছে। বরেন্দ্র, সমতট জনপদের বাংলাদেশ যেমন নদী বিস্তৃত, তেমনি কৃষি নির্ভর। পীর আউলিয়ার প্রভাব, ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও লোকজ কৃত্যের অনুশাসন এবং গারো, চাকমা, মারমা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশ। আর আছে সনাতন হিন্দু সম্প্রদায় এবং তার ধর্মীয় পুরাণ, লোকপুরাণ ও জীবনাচরণ। বাংলাদেশকে শত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক করে বেঁধে রেখেছে এদেশের একমাত্র ভাষা বাংলা ভাষা। বাংলাদেশের নাটকের স্বাতন্ত্র্যের ও সম্ভাবনার পথ খোলা আছে তার এই স্বরূপ সন্ধানের মধ্যে। যে ধারাবাহিক লোকজীবন, সংস্কার, মিথ ও সংস্কৃতির জোরে বাংলাদেশ তার পরিচয়কে অনুভব করতে পারে, সে উপাদানের জোরেই বাংলাদেশের মৌলিক নাটক চলার পথ করে নিতে পেরেছে। সেলিম আল দীনের নাটক সেই পথের অগ্রজ সারথি। একটি ভূমিজ বিষয়বস্তু নির্ভর জীবনধারা তাঁর নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। আঙ্গিকগত নিরীক্ষা প্রবণতা এ নাট্যকারকে ক্রমে উত্তীর্ণ করেছে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্প ভাবনায়। একটি সর্ব সংশ্লেষী শিল্প-আঙ্গিকই এই শিল্পীর অন্বিত ছিল। তাঁর PvKv, ^heZx Kb¨vi gb I niMR নাটক বাংলার বৃহত্তর লোকসমাজের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম তথা দলিত মানুষদের জীবনচর্চার নানাদিক স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত PvKv নব্বই-এর গণ আন্দোলনের পাটভূমিতে রচিত। এছাড়া তাঁর নির্মিত c_bvUKগুলো স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। PvKv নাটকে উত্তরবঙ্গের কৃষি জনপদের জীবনধারা এবং নাগরিক জীবনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন গুরুত্ব পেয়েছে। ^heZx Kb¨vi gb নাটকে নারীর বাঁচার সংগ্রাম এবং অবহেলিত নারীসত্তার সামাজিক অবস্থান রূপায়িত হয়েছে। niMR নাটকে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এক কৃষি জনপদের ধ্বংসের কাহিনি অনুপমভাবে চিত্রিত হয়েছে। এ পর্বে নাট্যকার নাটকের বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে আসতে তৎপর হন। তাঁর এমন প্রতীতি জন্মে যে, একটি মহৎ পাঠে সব শিল্প আঙ্গিকের অবস্থান সম্ভবপর করে তোলা যায়। তাই কথানাট্য পর্বে তাঁর নাটকে সংযোজন হয়েছে কথা, কাহিনি, উপাখ্যান, নৃত্য, গীত, নাট্য, রাগরাগিণী ইত্যাদির বিচিত্র সমাহার। wKËb‡Lvjv থেকে niMR পর্যন্ত নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের মানসপ্রবণতা সম্পর্কে নিজের ভাষ্য স্মরণীয় :

Dhaka University Institutional Repository

> wKËb‡Lvjv থেকে niMR পর্যন্ত আমি সজ্ঞানে বাংলা নাটকের চিরাচরিত রুগ্নবাস্তবতা রীতি পরিহার করতে চেয়েছি। জীবন, জগৎ ও মানবিক বোধের যে সকল নতুন স্পর্শে বাংলা গান, কবিতা, উপন্যাস দুই শতবর্ষে ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে, তার তুলনায় ক্লিশে সমাজচিন্তনের অতিগুরুভার বহন করতে গিয়ে বাংলা নাটক বহুক্ষেত্রে শিল্প পথবিচ্যুত হয়েছে। পাশ্চাত্যে প্রায় পরিত্যক্ত বিস্মৃত উনিশ শতকীয় রিয়ালিজমের বাংলা নাটক বা উপন্যাস এখনও যাকে বলে দোর্দণ্ড বা মধ্যাহ্নের প্রতাপে বিদ্যমান। wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j ও nvZ n‘vB এই ত্রয়ী নাটকের অনুপ্রেরণার স্থল চিরায়ত এপিক ও ধর্ম বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনচেতনা এমনকি আঙ্গিক পর্যন্ত সে সকল কাব্যে, এপিক বা মহাকাব্যে প্রায় এক শীর্ষবিন্দুতে মিশে গেছে। এপিক বা প্রাচ্য ধর্মদর্শন আমাকে ত্রয়ীতে অনুপ্রাণিত করেছে, একালের জীবনের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার প্রেরণা দিয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে বৌদ্ধ জাতকের গল্প, ওভিদের মেটামরফসিস পাপ ও কর্মফলের শ্লাঘ্য শিল্প লেখা, কোরান, ডিভাইন কমেডিয়া ও মহাভারতের নরক কল্পনা একালের সঙ্গে মিলানো যায়। আমার কাছে মনে হয়েছে, ওডিসি, ইনিড, সিন্দাবাদের সমুদ্র ভ্রমণ কোথাও অদ্বৈতের টঙ্কার দেয় অন্তরে। এই ত্রয়ী রচনা শেষে এও মনে হয়েছে বাস্তবতা আমার লক্ষ্য নয়, এমনকি বর্তমান অবলম্বন মাত্র। আমি বরং wKËb‡Lvjv, †KivgZg½j, nvZ n‘vB এর মধ্যে চিরায়ত বাঙালি তথা প্রাচ্য মানবের আকার অঙ্কনে প্রয়াসী ছিলাম।[৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বলা যায় যে, প্রাচ্যের আঙ্গিক তাঁর অনুধ্যানের বিষয় হলেও তিনি আন্তর্জাতিকতা বিমুখ ছিলেন না। পাশ্চাত্য থেকে অধিত জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন নাট্যপ্রতিমায়। নাটক রচনায় উনিশ শতকীয় রিয়ালিজম সেলিম আল দীনের কাছে গ্রহণীয় বলে মনে হয় নি। এপিকধর্মী কাজের মধ্যে তিনি নাটক রচনার কাঠামো বা রীতির অন্বেষণ শুরু করেন। প্রথম পর্বের নাটকে যে বাস্তবতার চিত্র পাওয়া যায়, পরবর্তী পর্যায়ে তা লেখকের মতে মহাকাব্যিক বা ধ্রুপদী বাস্তবতা। ফলে কোনো একটি আঙ্গিক তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় নি এবং একটি আঙ্গিক লোপ পেয়েছে সমান্তরাল বা অগ্রবর্তী অন্য একটি শিল্প আঙ্গিকের কাছে। আঙ্গিকের ভেতরেই নাট্যকার আঙ্গিক বিনাশী শক্তি দেখেছেন। সেলিম আল দীন মনে করেন, 'আঙ্গিক থেকে আঙ্গিক ভাঙার মরমী খেলা হচ্ছে উঁচুদরের শিল্পকর্ম'।[৯] তাঁর নাটকে কাহিনির প্রয়োজনে চরিত্র সংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। বলা যায়, নিজের ক্রমাগত আত্মপ্রকাশের কাঠামো অন্বেষণ করেন তিনি। সেলিম আল দীনের প্রস্তুতি পর্বের দৃশ্য বিভাজনরীতি আর বিকাশ পর্বে অনুসৃত হয় নি। PvKv নাটকে লম্বক ও তরঙ্গ বিভাজনরীতি আবার wKËb‡Lvjvয় ছিল সর্গ বিভাজন প্রক্রিয়া। †KivgZg½j খণ্ড ও বৃত্ত পরিকল্পনায় রচিত। nvZ n‘vB-

এর অঙ্ক বিভাজন একেবারেই অন্যরকম উপকূলবাসীর জীবনযাত্রার বয়ান বলে জোয়ার-ভাটার অনুকরণে নাট্যপর্ব বিভাজিত হয়েছে। মূলত এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, ইউরোপীয় নাটকের ধাঁচ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে দেশীয় নাট্যরীতির অন্বেষণ ও প্রয়োগে একাগ্রতা প্রদর্শন করেছেন। নাটকের আঙ্গিক নির্মাণ প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্য: 'আমি এই প্রত্যয়ে বদ্ধমূল যে হাজার বছরের বাঙলা নাটকের আঙ্গিক সাধনাতেই আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রকৃত উজ্জীবন সম্ভব। পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের প্রকৃত ও কর্মমুখর ভাষাতেই রচিত হবে আগামী দিনের মহানাটক।'[১০] সেলিম আল দীন তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের নিরলস প্রচেষ্টায় স্বকীয় শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিজস্ব তাঁর বলার ভঙ্গি। যথাযথ চরিত্র নির্বাচন ও তাকে ক্রমাগত পরিশীলিত করার মাধ্যমে ব্যক্তি হিসেবে তাকে একটি শৈল্পিক উৎকর্ষ দান নাট্যকারের ধ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। অনন্য শিল্পকুশলতায় তিনি এক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা থেকে চরিত্রকে তুলে এনে বিকাশের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেন। শ্রেণি বিভক্ত শোষণ-পীড়ন অধ্যুষিত সামাজিক জীবনে ব্যক্তি হিসেবে তার কোনো মর্যাদা না থাকা সত্ত্বেও শিল্পের ভুবনে সে ব্যক্তিত্ববান। wKËb‡Lvjv নাটকের সোনাই, ডালিমন, বনশ্রীবালা, †Kivg Zg½j-এর কেরামত, আফিম বুড়া, হিজড়া, চশমা ডাকাত, nvZ n'vB নাটকের আনার ভাণ্ডারি, মোদু, মালো হাফেজ, চুক্কুনি, অঙ্কুরি, niMR নাটকের বেসরকারি সংস্থার ত্রাণকর্মী এবং PvKv-এর বাহের গাড়োয়ান, পৌঢ় পৈরাত, সোনাফরের মা, ধরমরাজ প্রভৃতি চরিত্রের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'সেলিম আল দীন নাট্যভাবনার ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপ থেকে নয়, হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য থেকে বীজ সংগ্রহ করেই বেড়ে উঠেছে বাংলার নাট্যবৃক্ষ এমন মত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেলিম আল দীন'।[১১]

সেলিম আল দীন বিকাশ পর্যায়ে নাটকে গায়েন বা কথকরীতিকে প্রধান্য দিয়েছেন। আর প্রতিষ্ঠা পর্বে এসে তা পূর্ণতা পায় পাঁচালিরীতিতে। পাঁচালির আঙ্গিকে তিনি লিখেছেন ebcvsïj, cvP¨, wbg¾b, avegvb, ¯Y-‡evqvj, GKwU gvigv i/cK_v এবং cÎ। এসব নাটকে পাঁচালির দিশা, বোলাম, নাচাড়ি, শিকলি, পদ, কথাপ্রভৃতি পরিভাষা অনুসৃত হয়েছে। মধ্যযুগে দীর্ঘ কাহিনিমূলক কাব্যকে পাঁচালি বলা হত। পৌরাণিক, লৌকিক অথবা সমসাময়িক যে কোনো বিষয় উপজীব্য করে পাঁচালি রচিত হয়ে থাকে। পাঁচালির প্রকরণ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> প্রথমত ঃ পা-চালী অর্থাৎ পদচারণা করিয়া সম্প্রদায়ের অধিকারী আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদগান ও ব্যাখ্যা করিতেন। দ্বিতীয়ঃ ভাব-কালি ব্যাখ্যায় ও গানে-পদ, চক্ষু, মুখ এবং কণ্ঠের সুরে অভিনয় ভঙ্গিতে ভাবের সঞ্চালন করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইতেন। তৃতীয়তঃ নাচাড়ি হস্তছন্দ

> বিশেষ রচিত পদনৃত্য করিতে করিতে আবৃত্তি ও গান চলিত। চতুর্থতঃ বৈঠকে কখনও কখনও বসিয়া ভাল রাগ-রাগিণীতে গানের আলাপ হইত এবং পঞ্চমতঃ দাঁড়া কবি অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া সমস্বরে গান গাহিত।[১২]

সেলিম আল দীনের নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়, সংলাপের বাইরে চরিত্ররা নিজেদের উদ্দেশ্য করে কথা বলে। পাঁচালির আঙ্গিকে রচিত নাটকে রয়েছে দৃশ্য পরিসরের বর্ণনা। তাই নাট্যকার এ পর্বে রচক থেকে উত্তীর্ণ হন কথকে। আর এভাবেই তিনি তাঁর জনপদের মানুষদের আখ্যানে প্রবেশ করে সেই আখ্যানের বাচন দাঁড় করান। ebcvsï j-এ তিনি বাংলাদেশের এক লঘু নৃ-গোষ্ঠীর (মান্দাই) কথা বর্ণনা করেছেন। cvP¨ নাট্যে সমতলের মানুষদের জীবনপরিসর, সাংস্কৃতিক মনোভাব ও দর্শন তুলে ধরেছেন। পাঁচালির আঙ্গিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে নিজস্বতা। 'সেলিম আল দীন নাট্যবৃত্ত রচনায় মধ্যযুগীয় বাংলা পাঁচালি রীতির মৌল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে তাতে আধুনিক জীবনবোধ বিষয়বস্তু এবং দার্শনিক অভিপ্রায় সমন্বিত করেন।'[১৩] এ পর্বে গায়েন যেভাবে পাঁচালি বা পালাসমূহে আখ্যান বলেন তিনিও সেইভাবেই বলেছেন। মূলত পাঁচালিতে রয়েছে অদ্বৈতের ঝঙ্কার। নাট্যকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

> বাঙলা নাটকের অজস্র আঙ্গিক সহস্র বছরের ধারায় বাহিত হয়েছে কিন্তু আদ্যন্ত তার দেহমনে অদ্বৈতের ঝঙ্কার বিদ্যমান। নাটক হয়েও আমাদের নাটক গান থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নি, নৃত্যকে করেছে তার ধমনী, কাব্যের গড়নটাকে প্রায় সর্বত্র করেছে আপন আঙ্গাভরণ তার প্রাণের নিখিল লোকায়ত জীবন ও ধর্মকেই অবলম্বনপূর্বক আসর থেকে আসরে ঘুরেছে নেউরালঙ্কারে।[১৪]

সেলিম আল দীন সর্বদা নাট্যচর্চায় বহুমুখী নিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। নিজের নাট্যভুবনে নিজেই নিজেকে অতিক্রম করেছেন বারবার। একটি পর্যায় থেকে তিনি আঙ্গিকের আরেকটি পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁর নাটকে শহর ও গ্রামজীবনের কলকোলাহল রয়েছে, তবে গ্রাম-বাংলার মানুষজন ও জন মানুষের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি নাটক রচনায় স্বচ্ছন্দ অনুভব করতেন। নাটকের আঙ্গিক নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক ধারায় প্রচলিত বহু চর্চিত গল্পকথনের ধরনকে পাল্টে দিয়েছেন। সব সৃষ্টিশীল প্রতিভার মতোই তিনিও খোঁজেন মৌলিকতা, স্বকীয়পন্থা ও হতে চান স্বাবলম্বী। এক্ষেত্রে তিনি শেকড় সন্ধানী নাট্যকার। আখ্যান বয়নে ও গড়নে তিনি গ্রহণ করেন কথকের ভূমিকা। মধ্যযুগীয় কথানির্ভর মৌখিক শিল্পরীতির ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টিতে পাওয়া যায়। এই মৌখিক রীতির দিকে তাকালে প্রথমে দেখতে পাব যে, প্রতীচ্য নাট্যরীতির দৃশ্য, অঙ্ক বিভাজন, ঘটনা ও সময়ের ঐক্য বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে তিনি এনেছেন মহাকাব্যিক সর্গ বিন্যাস, উপন্যাসের পরিচ্ছেদ পর্ব, ঘটিয়েছেন সংলাপে বর্ণনা ও কথনের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই

মৌখিক বয়ান ও উপস্থাপনায় বিভিন্ন মাধ্যমকে মঞ্চে দৃশ্যমান করার যে পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়, তা রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে বিরাজমান ছিল। তাঁর সংযোগ এই পরম্পরার সঙ্গেই রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> শিল্পী জীবনের প্রারম্ভে নগরজীবনের জটিল দ্বান্দ্বিকতা তাঁর নাটকের উপজীব্য রূপে প্রত্যক্ষ করি। আঙ্গিকেও পাশ্চাত্য নাটকের বিশেষত ব্রেখটীয় জগতে পৌঁছবার প্রয়াস লক্ষণীয়। শিল্পীসত্তার উদ্বোধনকালে দেশীয় আঙ্গিকের প্রতি আত্যন্তিক ঝোঁক প্রায় মন্ত্রসিদ্ধির স্তরে পৌঁছে দেয় তাঁকে। ঘটনাদৃষ্টে বলা যায়, তিনি কতকটা মধুসূদন দত্তের মতোই পাশ্চাত্য শিল্পরীতির নানা বাঁক সাঁতরে পার হয়ে বঙ্গজননীর চরণামৃত পান করেন। রীতির বিরুদ্ধে রীতিহীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এবং তাঁর এ যুদ্ধের সূচনা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে। এ ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি জাতির নিজস্ব শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বোধপ্রসূত সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামের অংশ। অন্য অনেকের সঙ্গে সেলিম আল দীন এই যুদ্ধের অন্যতম সাগ্নিক।[১৫]

সেলিম আল দীনের নিজস্বতা নাটকের বিষয়বৈচিত্রেও কম নয়। তাঁর আখ্যানের চরিত্ররা বর্তমান সময়ের বিচিত্র মানুষ। কেউ শোষক নির্যাতনকারী, কেউ শোষিত প্রতিবাদী, কেউবা সংসার উদাসীন প্রান্তিক। আর আছে নারী চরিত্রের রহস্যময়তা। আঙ্গিকের দিক থেকে নাট্যকার টাইপ, গায়কী ঢং, কথকী গিটকারি যুক্ত করেন। নাট্যকার মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষণা করে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলা নাটক সম্পর্কে স্বতন্ত্র এক ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> তিনি নিবিষ্ট গবেষকরূপে প্রমাণ করেন বাংলা নাটক ২০০ বছরের অর্বাচীন নয় হাজার বছরের প্রাচীন। তিনি তাঁর ga¨h‡Mi ev0jv bvU¨ গ্রন্থে দেখালেন বাঙালির রয়েছে বহুবর্ণিল বিষয়ের অজস্র নাটকের আঙ্গিক। ঔপনিবেশিক মানসিকতাপুষ্ট ইতিহাসকারের উপেক্ষায় তা শুধু আখ্যান, উপাখ্যান, কিচ্ছা, কাহিনী এবং গল্প হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে।[১৬]

পশ্চিমারীতির পরিবর্তে তিনি খুঁজেছেন দেশীয় নাট্যরীতি, হাজার বছরের লোকজীবনকে অঙ্গীকার করে দেশীয় রীতিতে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আরাধ্য ফর্ম। ঔপনিবেশিক নাট্যরীতিকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। নিরলস সাধনায় নির্মাণ করেছেন ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের এক নবরূপ। একটি সাহিত্যকর্মের মধ্যে কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি আঙ্গিকের উপস্থিতি তাঁর উদ্ভাবিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের মূলকথা। তাঁর কাছে সাহিত্যের বর্গ-বিভাজন বা শাখা-বিন্যাস ছিল গুরুত্বহীন। তাঁর মতে, সাহিত্যে বর্গ-বিভাজন ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত। তিনি দৃঢ়ভাবেই উচ্চারণ করেছেন আমাদের শিল্পরুচি চিরকালই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মেও দ্বৈতাদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

শেকড়স্পর্শী শিল্পকর্মের দীক্ষা মূলত তিনি পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। একই সঙ্গে তিনি অস্বীকার করতেন চিত্রকলা, সংগীত ও নৃত্যের ভেদকেও। দেশজ নাট্যরীতি পুনরুত্থানে তিনি আজীবন আন্তরিক প্রয়াসী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে নাট্য গবেষকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> দর্শক কিংবা শ্রোতা বাড়ির উঠোনে শুয়ে-বসে এই গল্প শোনে। শ্রবণের মধ্য দিয়ে যে দৃশ্যময়তা তৈরি হয়েছে, সেলিম আল দীন সম্পূর্ণ নতুন করে এই বিষয়টাকে তাঁর কথানাট্য পর্বে (PvKv, ^heZx Kb¨vi gb, niMR) এনে দর্শকের কল্পনা ও বোধে আধুনিক ভাব-ভাবনাকে দৃশ্যমান করলেন। নতুন করে দেখালেন যে গল্পের ভুবন থেকে চরিত্রগুলো উঠে আসে আধুনিক ভাবনা এবং আধুনিক জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে। আধুনিক শিল্পবিশ্বাস নিয়ে বাঙালির হাজার বছরের শিল্পরীতির ইতিহাস আমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কাজটি করলেন সেলিম আল দীন।[১৭]

সেলিম আল দীনের নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাঁর নাটকে প্রকৃত অর্থে দর্শকদের মধ্যে এক একজন শ্রোতাও জন্ম নেয়। তাঁর নাটক মঞ্চে উপস্থাপনের জন্য তিনি আলো নিভানো, অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রবেশ, প্রস্থান ইত্যাদি সংযুক্ত করে কোনো নির্দেশনা দেন নি। এ ক্ষেত্রে মঞ্চে পরিচালকের মৌলিকতা ও সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সেলিম আল দীন নাটকের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। গদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণ রয়েছে তাঁর নাটকের ভাষায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গদ্য হয়ে উঠেছে সুরের বাহন আবার তৎসম শব্দের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে। খণ্ড খণ্ড পরিচয়ের মধ্যে জগৎ ও জীবনের যে অখণ্ড রূপাভাস, তাঁর রচনায় সেই রূপেরই উন্মোচন প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর আখ্যানে থাকে নিপীড়িত, প্রান্তিক ব্রাত্যজনের কথা, অথচ বয়ানের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত শব্দবহুল। তাঁর শিল্প প্রয়াসের মূলমন্ত্র লোকজীবনের অকিঞ্চিৎকরতাকে মহাজীবনের শাশ্বত উপলব্ধির দুয়ারে উপনীত করা। অর্থাৎ রোমান্টিক মনের সঙ্গে ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সেতুবন্ধ রচনা। আর এক্ষেত্রে তিনি আশ্রয় করেছিলেন মূলত ভাষার। সেলিম আল দীন স্বতন্ত্র এক ভাষারীতির আশ্রয়ে গল্প বা আখ্যান রচনা করেন। তাঁর ভাষার বাক্য গঠনরীতি ভিন্ন, ক্রিয়াপদের প্রয়োগ কৌশল একেবারেই নিজস্ব। তিনি সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দ নয়, নির্বাচন করেন এমন শব্দ, যার অন্তর্গত ব্যঞ্জনা বচনাতীত মহিমায় উদ্ভাসিত। তাঁর নাটকের ভাষা কথকের ভাষা। তিনি সাধনা করেন এ ভাষারীতির। লোকায়ত জীবনকে ধ্রুপদী পর্যায়ে রূপান্তরকরণের প্রচেষ্টা তাঁর রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় PvKv নাটকের কথা। PvKv নাটকে লাশ বহনকারী একটি গাড়ির সঙ্গে গল্প এগিয়ে যায়। আর দর্শকের দৃষ্টি সীমায় বৃত্তাকার মঞ্চে অবস্থান করে অথচ দর্শক ঘুরে আসে উত্তর বঙ্গের বিশেষ একটি অঞ্চলের খয়ের গাছ,

শিরীষ গাছ, ছাতিম গাছের ছায়াময় আঁকা-বাঁকা পথ ধরে কাকেশ্বরী নদীর পর উদাত্ত মাঠ পেরিয়ে নয়ানপুর, নবীনপুরের বিচিত্র জনপথে। PvKv নাটকের গল্প বুনন রীতি এর উপস্থাপনাকে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আর সবচেয়ে নিরীক্ষাপ্রবণ নাটক ^heZx Kb¨vi gb। এখানে বয়ানের ক্ষেত্রে লেখক তৈরি করলেন মহাবিপর্যয়। কোনটি লেখকের বর্ণনা, কোনটি চরিত্রের সংলাপ আর কোনটি কালিন্দী বা পরীর কথা সব একাকার করে তুলে ধরলেন পাঠকের সামনে। পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপ ভিত্তিক গড়নটা তাঁর অপছন্দ ছিল। সংলাপের মাধ্যমে ঘটনা বর্ণনা তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে, তাই সে স্থলটি বর্ণনা দিয়ে সম্পূর্ণ করেছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অনুকরণতত্ত্বের বদলে অভিনয়কে জীবনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে বর্ণনা এবং সংলাপ ক্রমেই তাঁর নাটকে অদ্বৈত হয়ে উঠেছে। সেলিম আল দীনের নাট্যচর্চার মূল প্রবণতা প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য: 'এপিকের বাঙালিয়ানা কিংবা বাঙালিয়ানার এপিক-অনুসন্ধানই সেলিম আল দীনের নাটকগুলোর এক নিগূঢ় উদ্দিষ্ট। আর তাই তাঁর নাটক সর্বত্রই হয়ে ওঠে সহস্রবর্ষের আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শিল্পরসে জারিত।'[১৮]

শত প্রতিকূল ও ঝড়-জলের মধ্যেও বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের একটি দীর্ঘকালীন স্থির অবস্থান আছে। সে অবস্থান থেকেই গ্রামীণ জীবন নিজের সুখ দুঃখকে অনুভব করে। সে অনুভবটাই হল বাংলাদেশের মৌলিক জীবনবোধ। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় সেই মৌলিক জীবনানুভূতির সন্ধান আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন সেলিম আল দীন। সেই অনুভূতির সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার স্বরূপ নির্দেশিত হয়ে আছে। তাঁর নাট্য প্রয়োগের সঙ্গে হাজার বছরের গ্রন্থিবন্ধন আছে। সেলিম আল দীন আমাদের গৃহের অভ্যন্তরে আঙিনায় আপন ভঙ্গিতে উচ্চারিত সেই ঐতিহ্যকে নাটকে সংরক্ষণ করেছেন। বাংলার মৌলিক নাট্যশক্তির সন্ধানের জন্য তিনি ফিরে গেছেন সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহে। জীবন ঘনিষ্ঠতার জন্য নতুন করে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করা যায় তাঁর নাট্যভুবনের বাঁকে বাঁকে। নাট্যকার মমতাজ উদ্দীন আহমদের মতে– '১৯৭২ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশের নাটকের বয়স খুব সামান্য। কিন্তু এ অল্প সময়েই আমাদের নাটকের পরিমণ্ডল ও সম্ভাবনা অনেক বিস্তৃত ও গভীর হয়েছে। এখনকার নাটক এতই দারুণভাবে জীবন নির্ভর যে, জীবন ও মূল্যবোধ সন্ধানের জন্য তা প্রতিনিয়ত অগ্রগামী।'[১৯]

সেলিম আল দীনের নাটক gbZwmi থেকে প্রায় সব নাটকে রয়েছে গানের ব্যবহার। এ সম্পর্ক তাঁর ভাষ্য ছিল– আমি এক অন্তর্গত সংগীতের বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যরচনায় অভিলাষী। তাঁর

নাট্যপ্রয়াসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে অবিরত। তাঁর নাটকের আঙ্গিক বৈচিত্র্য এবং চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব সম্পর্কে সমালোচকের ভাষ্য :

> সেলিম আল দীন নিজের তৈরি শিল্পরীতির একই পথে দুইবার হাঁটেন নি। তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তিনি হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের বাংলা নাটকের স্বতন্ত্র রূপ-রীতির নির্মাতা। শুধু রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কেন বিশ্বনাটকেও তিনি নতুন রীতির সংযোজন করেছেন সংলাপ রচনায়। আমরা জানি একাধিক অভিনেতার সংলাপ ও প্রতি সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটক অগ্রসর হতে থাকে পরিণতির পথে। এই সংলাপ প্রতি সংলাপের ধারাটি হাজার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে বিশ্বসাহিত্যে। সেলিম আল দীন কিন্তু সংলাপ রচনার এই ধারাটি ভেঙে দিলেন। এবং তিনি বললেন, এ রকম সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি চরিত্রকে খণ্ডিতভাবে দেখা যায়।[২০]

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সেলিম আল দীন বাংলা নাটকের নিজস্ব আঙ্গিকের বিষয়ে খুব বেশি সোচ্চার ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে রক্ষণশীল নাট্যকার বলেছেন। তবে তাঁদের এই অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> রক্ষণশীল নাট্যচর্চার প্রতি তিনি মোটেই সহনশীল ছিলেন না, যে জন্য ফর্ম ভাঙতে ভাঙতে এগিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সচেতন ছিলেন অপসংস্কৃতি সম্পর্কেও। সেলিম লিখেছেন, আমরা দেখেছি পরজীবী নাট্যচর্চা আধুনিকতার নামে জাতীয় আঙ্গিকের ঐতিহ্যকে অবহেলা করেছে। এর জন্য নাট্যচর্চায় তৃতীয় পথের অন্বেষণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। (রচনাসমগ্র ২ পৃ. ৩৬২) তৃতীয় নয়, একে বোধ করি বিকল্প ধারা বলাই সঙ্গত। রাজনীতিতে যেমন আজ বিকল্প গণতান্ত্রিক ধারা অত্যাবশ্যক, নাটকেও তাই। এই ধারা বুর্জোয়া নাট্যচর্চা ও নীতিকে প্রত্যাখ্যান করবে, তার বদলে জাতীয় আঙ্গিকে গ্রহণ করবে। কিন্তু 'জাতীয় আঙ্গিক' আবার আন্তর্জাতিকতা বিমুখ হবে না। সেলিম নিজে এই বিকল্প রীতিই গড়ে তুলতে চেয়েছেন; এ রীতিতে যেমন স্থানীয় উপাদানগুলো রয়েছে, তেমনি আছে ব্রেখট, ভার্জিল, দান্তে ও গ্রিক সাহিত্য ও শেক্সপিয়রীয় নাটক পঠন থেকে সঞ্চয় করা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।[২১]

'ঢাকা থিয়েটার' গোষ্ঠী জাতীয় নাট্য আঙ্গিক বলতে তাদের উদ্ভাসিত কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকের কথা বলে নি। বরং প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্ম ও লোকাচারসহ নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে যে সকল উপাখ্যান ও কৃত্যের জন্ম হয়েছিল, সে সকল বিষয়ই হচ্ছে জাতীয় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য। তিনি নাটকের প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙে একটি সম্পূর্ণ নতুন নান্দনিক ভূমিতে তাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা

সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ ও তার নব রূপায়ণ করেছেন। সেলিম আল দীনের নাট্যচর্চার আদর্শে সমন্বয়ের প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য: 'বাইবেল, কুরআন, হিন্দু পুরাণ, গ্রীক, রোমক পুরাণ, বাংলা লোকগাথা, বৌদ্ধদর্শন, বিভিন্ন উপজাতীয় পুরাণ, নৃত্য-সংগীত ইত্যাদি ধর্ম-বর্ণ-জাতি সংস্কার সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে সেলিম আল দীনের নাট্যশরীরে। এজন্য তাঁর শিল্পতত্ত্ব দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শিরোনামে অভিহিত।'[২২] উপর্যুক্ত মতামতকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমর্থন করা যায়। কেননা স্বদেশ, স্বকাল, ইতিহাস ও সময়ের নিরন্তর প্রবাহের ভেতর দিয়ে সেলিম আল দীনের নাট্য ভাবনার অন্বেষণ। একই সঙ্গে তাঁর নাটকে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সমন্বয় ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> রবীন্দ্র-উত্তর কালে সেলিম আল দীন নাটকের আঙ্গিক চর্চায় নিজেকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রূপে ঘোষণা করেছেন। যে ঘোষণা বক্তব্য সর্বস্ব মাত্র নয়- তাঁর 'কিত্তনখোলা,' 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই,' 'চাকা', 'যৈবতী কন্যার মন' এবং 'হরগজ' প্রভৃতি নাটকে আঙ্গিক বিশেষের বৃত্তাবদ্ধতা অনুপস্থিত। কথকতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং মহাকাব্যের প্রচলিত আঙ্গিক উল্লিখিত রচনায় একাকার। অর্থাৎ মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা নাট্যমূলক গেয়কাব্যের আঙ্গিক পাঁচালির কিন্তু পাঁচালির পয়ার, ত্রিপদী, নাচাড়ি, শিকলি, দিশা প্রভৃতি আধুনিক জীবনকে ধারণ করতে সক্ষম নয় বলেই একালের শিল্পতত্ত্ব রূপে তাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী অভিধায় চিহ্নিত করার পক্ষপাতি।[২৩]

মূলত বাংলাদেশের আধুনিক ও গণমুখী নাট্য আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সেলিম আল দীন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও সাফল্য দেশের গণ্ডি ছেড়ে স্থান করে নিয়েছে দেশের বাইরে। সেলিম আল দীনের সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা নাটকে তুলে এনেছে এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের মননভূমি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়: 'বাঙালির হাজার বছরের অতীত ঘেটে তিনি শেকড়সন্ধানী এক সবল প্রাচ্য তত্ত্বের সন্ধান করেছেন তাঁর নাটকের পর নাটকে। তিনি আঙ্গিক বিলুপ্তি রীতি চালু করে একই শিল্প আঙ্গিকে গান- কবিতা ও নাটকের অনাস্বাদিত এক শিল্পরূপ তৈরী করেন'।[২৪] বাংলাদেশের সমৃদ্ধতম সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে নাট্যধারা অন্যতম। এর প্রাণবন্ত প্রবাহ সেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে চলমান। সেলিম আল দীনের হাতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা নতুন রূপ পেয়েছে। কবিগান থেকে বিচার গান, ঢপকীর্তন থেকে ঢপ যাত্রা; লীলানাট্য থেকে যাত্রা ইত্যাদি নাট্যধারার উদ্ভব হয়েছে কালের বিবর্তনের সূত্রে। এদেশে নাট্যধারা অনুশীলনের কোনো বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না। এর সুর, তাল, নৃত্য, অভিনয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। তবে নাট্যকার তাঁর নাটকে এগুলোর সার্থক ব্যবহার করেন। তিনি নতুনভাবে PvKv, wbg¾b নাটকে তারকা চিহ্নের

ব্যবহার করেন। সেলিম আল দীনের নাটকে ব্যবহৃত যতি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে তাঁরই নিজস্ব ভঙ্গিমায়। তাই তাঁর নাটকের ভাষারীতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের গঠনরীতিও বদলে গেছে। "আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখলাম কী চমৎকারভাবে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার 'এক দাঁড়ি', 'তারকা চিহ্ন' এবং 'দুই দাঁড়ি' আধুনিক বাংলা বাক্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও অনিবার্য হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে।"[২৫] PvKv কথানাট্যে কমা, সেমিকোলন, আশ্চর্যবোধক ও প্রশ্নবোধক ইত্যাদি যতি চিহ্ন ব্যবহার করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির পাশাপাশি তারকা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত বটতলার পুঁথিতে যতিচিহ্ন হিসেবে দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির পাশাপাশি যে তারকা চিহ্ন ব্যবহৃত হতো সেলিম আল দীন তাঁর avegvb ও wbg¾b নাটকেও সেই রীতিই ব্যবহার করেছেন। এদেশের নাট্যধারার গবেষণা করে সেলিম আল দীন দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা সাধারণ গীত প্রধান ও বর্ণনাত্মক অভিনয়ের আশ্রয়েই পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর ইউরোপীয় নাট্যে সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ই প্রধান। এছাড়া পাশ্চাত্য নাট্যে বর্ণনাত্মক অভিনয় এবং আখ্যান ও চরিত্রের মর্ম ব্যাখ্যামূলক অর্থপূর্ণ গানের ব্যবহারও নেই। এই বিবেচনায় আমাদের নাট্যচর্চার ধারাকে সেলিম আল দীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধতম নাট্যধারা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> সেলিম আল দীন নাটকের আঙ্গিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমাগ্রসর হয়ে তাঁর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী দর্শনের চূড়ান্তে পৌঁছে যান শেষ বেলায়। তাঁর রচনায় বর্ণনা, নৃত্য, সংলাপ, সংগীত এই উপাদানসমূহ ভাষ্যকে দৃশ্যযোগ্য চিত্রে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইউরোপীয় নাটকের ঘটনাগত পরিস্থিতির পরিবর্তে সেলিম আল দীন তাঁর নাটকে দ্বন্দ্বমূলক ভাষ্য রচনা করেন। ফলে মূল আখ্যানের সঙ্গে পরিবেশের অন্তর্গত প্রবহমান জীবনস্রোত ও জগৎ-সত্তার চিত্ররূপের সাক্ষাৎ মেলে। প্রতিটি চিত্রের রেখায় রেখায় মহাজীবনের সংখ্যাতীত চিত্র অভিনয় শিল্পীর বর্ণনাকুশলতা, নৃত্যনৈপুণ্য, সংগীত-প্রতিভা, চরিত্র-সৃজনদক্ষতা এবং নাট্য-পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিনবত্বে মঞ্চ-পরিসরে সচল হয়।[২৬]

সবশেষে বলা যায়, আঙ্গিক নিরীক্ষায় ঐতিহ্যবাহী ধারাকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণপূর্বক তিনি যথাযথভাবে তা আধুনিক বিষয়ে প্রয়োগ করেছেন। এদেশের নাট্যচর্চা ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাটকের অনুগামী হবে এবং বিশ্বের বুকে স্বতন্ত্র নাট্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাবে এমনই প্রত্যাশা ছিল তাঁর। সেলিম আল দীনের উদার নাট্যমানস প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয় :

> বাংলা নাটকের হাজার বছরের লোক ঐতিহ্য অন্বেষণ করে ফেরেন নিজস্ব গৌরবদীপ্ত পরিচয়সীমা। আর এভাবেই পেয়ে যান তিনি নতুন প্রকরণ: কথানাট্য, নতুন দর্শন: 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী' শিল্পপ্রকরণ। বাঙালি ঐতিহ্যের অনুসন্ধান সেলিম আল দীনের নাট্যচিন্তার কেন্দ্রাতিগ বিষয়। বাঙালির অতি পরিচিত, চেনা বাস্তবতাকে তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন বাঙালিরই নিজস্ব নাট্যরীতির যথোচিত প্রয়োগে। কিন্তু তা পশ্চাদ্ভিসারি আঞ্চলিক-সংকীর্ণতায় থেমে থাকা নয়। আর তাই, বাঙালির মধ্যযুগীয় নাট্য-ঐতিহ্যের সন্ধানে নেমেও সেলিম আল দীন সচেতনভাবে অবিচল উদারভাবে ব্যবহার করেন বিশ্বভুবনের বিচিত্র সংস্কৃতি হতে আহরিত পুরাণ কিংবদন্তি লোকজ উপাদান। এবং তাঁর চেতনার খোলা জানালা দিয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য নৈসর্গিক বেগে প্রবেশ করে শিল্পের যে অবয়ব নির্মাণ করে, তার তল নিহিত ঐশ্বর্য একান্ত দেশীয়, যার পূর্ণায়ত রূপ আধুনিক স্বদেশ।[২৭]

সেলিম আল দীন গোটা সমাজকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তার যাবতীয় বৈশিষ্ট, সমস্যা, শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম সমেত উপস্থাপন করেন তাঁর নাটকে। বাঙালির মাতৃভাষা, বাঙালির নাচ, গান, বাঙালির বচন, বাচন, প্রতিভঙ্গির সমন্বয়ে তাঁর নাটকের কায়া নির্মিত হয়েছে। বাংলার গ্রাম, নগর, নদ-নদী, সমুদ্র, ফসলের মাঠ, নীলাকাশ, ষড়ঋতুর লীলা তাঁর নাটকে এক বিশেষ জায়গা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই মর্মে তিনি তাই বাঙালির নাটক নির্মাণ করেছেন। তাঁর নাটকে যেমন আছে বিষয়বৈচিত্র্য তেমনি রয়েছে আঙ্গিক বৈচিত্র্য।

তথ্যনির্দেশ

১. হোসনে আরা জলী, bvU¨ weIqK KwZcq ceÜ (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১২) পৃ. ১০৫

২. সেলিম আল দীন, "পরিশিষ্ট", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2 (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স ২০০৬), পৃ. ৩৬১

৩. নরেন বিশ্বাস, cm½: mwnZ¨-ms¯‹Z (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯), পৃ. ১৫৪

৪. Avb›‘ evRvi, ৩ জানুয়ারি, ২০০০

৫. আফসার আহমদ, "সেলিম আল দীন তাঁর আকাশ ও পৃথিবী", ^‘wbK c_g Av‡jv, ২২ আগস্ট, ২০০৮, পৃ. ৩

৬. সেলিম আল দীন, "কেরামতমঙ্গল", সাইমন জাকারিয়া সম্পা., †mwjg Avj ‘xb iPbvmgM-2, পৃ. ৩০১

৭. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK (ঢাকা, নান্দনিক, ২০১২), পৃ. ৩৩-৩৪

৮. সেলিম আল দীন, "কথাপুচ্ছ", ^heZx Kb¨vi gb (ঢাকা: গ্রন্থিক, ১৯৯২), পৃ. ১৪১-১৪২

৯. ঐ, "দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব-২", g½j mÜ¨v, জুলাই ১৯৯৫, পৃ. ২০

১০. ঐ, wZbwU gÂbvUK (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২) ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, evsjv‡‘‡ki mwnZ¨ (ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ৩৫২

১২. কুমুদ বন্ধু সেন, wMwikP›‘ (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৩৬), পৃ. ৬৪

১৩. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১৭

১৪. সেলিম আল দীন, "শ্রী চৈতন্য ভাগবতের নাট্য প্রসঙ্গ", w_‡qUvi ÷wWR- 1992, পৃ. ১০

১৫. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ১১

১৬. আফসার আহমদ, পৃ. ৩

17. Z‡‘e

১৮. আহমেদ আমিনুল ইসলাম, "গৌড়জনের সেলিম আল দীন", মফিদুল হক ও অরুণ সেন সম্পা., mvZ mI‘v (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ২১০

১৯. মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, Avgvi bvU¨ fvebv (ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০০), পৃ. ২৮২

২০. আফসার আহমদ, পৃ. ৩

২১. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ২৪৬

২২. লুৎফর রহমান, "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক থিয়েটার চর্চা: প্রসঙ্গ হরগজ", ‘B evsjvi w_‡qUvi, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২০ মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৩৩১

২৩. ঐ, "মধ্যযুগের নাট্যমূলক গেয়কাব্যের আঙ্গিক; দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব", w_‡qUvi ÷wWR, ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৯৫, পৃ. ১১৫

২৪. evsjv GKv‡Wgx cwÎKv, ৫৩বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬৬

২৫. আফসার আহমদ, "সেলিম আল দীন তাঁর আকাশ ও পৃথিবী", পৃ. ৩

২৬. লুৎফর রহমান, evsjv bvUK I †mwjg Avj ‘x‡bi bvUK, পৃ. ২৯৩

২৭. সেলিম মোজাহার, স্বাধীনতা- উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

সেলিম আল দীনের নাটকের তালিকা

রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো :

নাটকের নাম	মাধ্যম	প্রচারের সময়
১. wecixZ Zgmvq	রেডিও	১৯৬৯
২. Ng †bB	টেলিভিশন	১৯৭০
৩. bxj bxj hšYv	বাংলাদেশ টি.ভি. ও বাংলাদেশ বেতার	১৯৭২
৪. gkvwi	বাংলাদেশ টি.ভি. ও বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৩
৫. gwbiv gd¯‡j	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৩
৬. Avlj FZcwZ	বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৪
৭. AkæZ MvÜvi	বাংলাদেশ টি.ভি. ও বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৫
৮. Pv‘ †e‡b	বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৫
৯. k¨vgj Qvqvq	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৬
১০. †kKo Kv‡‘ RjKYvi Rb¨	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৭
১১. nj‘ cvZvi Mvb	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৭
১২. bvZvkv ev‘kvi msmvi	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৬
১৩. i‡³i AvOijZv	বাংলাদেশ টি.ভি ও বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৬
১৪. In†‘e‘Z!	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৯
১৫. †kl eskai	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৭৯
১৫. gwQ	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮০
১৬. Mí wb‡q Mí	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮২
১৭. cRvcwZ	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮২/৮৩
১৮. kh¨v	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮২
১৯. GKw‘b GKiwÎ	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮২
২০. fv½‡bi kã ïwb (Avqbv wmwiR)	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮২/৮৩

২১. jvjgwU Kv‡jv †avqv (Avqbv wmwiR)	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৯৩
২২. AvZZvqx	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৮৩
২৩. wKËb‡Lvjv	আকাশবাণী, কলকাতা	১৯৮৫
২৪. MwšKMY K‡n (AvU c‡ei avivewnK)	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৯০-৯১
২৫. AbZ iwÎ	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৯৩
২৬. Qvqv-wkKvix (bq c‡ei avivewnK)	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৯৪-৯৫
২৭. wnZ¼i	বাংলাদেশ টি.ভি.	১৯৯৯
২৮. B”QvciY (iex›‘bv‡_i †QvUM‡íi bvU¨iƒc)	বাংলাদেশ টি.ভি.	২০০১
২৯. mvZk mvZvËi	বাংলাদেশ টি.ভি.	২০০২
৩০. Rjvb I kvjbv	বাংলাদেশ বেতার	১৯৭৪-৭৫
৩১. bxj kqZvb: ZwmnwZ BZ¨w‘	বাংলাদেশ বেতার	১৯৭২

দেশে-বিদেশে মঞ্চস্থ উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো :

নাটকের নাম	প্রথম মঞ্চায়ন
১. mc welqK Mí	বহুবচন, ১৯৭২
২. RwÛm I wewea †ejb	ডাকসু, ১৯৭২
৩. G·‡cøwmf I gj mgm¨v	নাট্যচক্র, ১৯৭২
৪. Kwig evIqvjxi kÎæ A_ev gj gL †‘Lv	নাট্যচক্র, ১৯৭৩
৫. g¨vmvKvi	নাট্যচক্র, ১৯৭২
৬. mOev‘ KvUb	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৭৩
৭. gbZwmi d¨v›Uvmx	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৭৬
৮. Pi KvKovi WK‡g›Uwi	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৭৭
৯. kKšÍjv	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৭৭

১০. AvZi Avjx‡'i bxjvf cvU	অরিন্দম, ১৯৭৮
১১. wKËb‡Lvjv	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৮১
১২. mqdjgjK ew'D¾vgvj	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৮৩
১৩. evmb	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৮৩
১৪. AvZZvqx	তীর্যক নাট্যগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম ১৯৮৩
১৫. †KivgZg½j	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯৫
১৬. nvZ n'vB	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৮৯
১৭. PvKv	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯১
১৮. *The Wheel*	Antioch theatre, Colombia University U.S.A 1991
১৯. ^heZx Kb¨vi gb	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯৩
২০. GKwU gvigv i¡cK_v	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯৩
২১. ebcvsïj	ঢাকা থিয়েটার, ১৯৯৮
২২. cvP¨	ঢাকা থিয়েটার, ২০০০
২৩. niMR	ঢাকা থিয়েটার, ২০০১
২৪. cÎ	বুনন থিয়েটার, ২০১০
২৫. avegvb	ঢাকা থিয়েটার, ২০১০
২৬. wbg¾b (2004)	ঢাকা থিয়েটার
২৭. ¯Y‡evqvj (2007)	-
২৮. Dlv Drme I ¯c igYxMY	-
২৯. weï Kgv‡ii cZj bvP (1985)	-

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাথমিক উপকরণ

১.১. আলোচিত নাটক

দীন, সেলিম আল। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫।

————। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-২। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।

————। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৩। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

————। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯।

————। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৫। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০।

————। সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৬। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

২. মাধ্যমিক উপকরণ

২.১. সহায়ক গ্রন্থ

আউয়াল, সাজেদুল। evsjv bwU‡K bvix, ci¤l I mgvR। ঢাকা: অনন্ত প্রকাশন, ১৯৯৯।

আনিসুজ্জামান। মুনীর চৌধুরী। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০০।

আহমদ, আফসার। মঞ্চের ট্রিলোজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ঢাকা: গ্রন্থিক, ১৯৯২।

আহমদ, মওদুদ। শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৭।

আহমদ, মমতাজউদ্দীন। আমার নাট্য ভাবনা। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০০।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল। হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা। ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫।

ইব্রাহিম, নীলিমা। বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা। ঢাকা: জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৭২।

ইমাম, জাহানারা। একাত্তরের দিনগুলি। পু.মু.। ঢাকা: ৩৯, সন্ধানী প্রকাশনী, ২০১৫।

ইলিয়াস, মাহবুব। লোকসাহিত্য, ছড়া, নাট্য ও লোকসঙ্গীত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০।

ইসলাম, রফিকুল। বাংলাদেশ: সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯২।

ইসলাম, সাইফুল। রবীন্দ্রনাথের নাটক চেতনালোক ও শিল্পরূপ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

উমর, বদরুদ্দীন। সামরিক শাসন ও বাংলাদেশের রাজনীতি। ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোঃ, ২০০৩।

কায়সার, শান্তনু। কাব্যনাটক। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

খান, রফিকউল্লাহ । বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭।

খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (মানিকগঞ্জ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪।

গালিব, সোহেল হাসান ও নওশাদ জামিল (সংক.)। কহন কথা। ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০০৮।

ঘোষ, অজিতকুমার। বাংলা নাটকের ইতিহাস। পু.মু.। কলকাতা: জেনারেল পাবলিশার্স, ২০০১।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। বাংলাদেশের সাহিত্য। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

চৌধুরী, কবীর। প্রসঙ্গ নাটক। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৭।

চৌধুরী, দর্শন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, ১৯৯৫।

চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী। রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটক। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

চৌধুরী, রাহমান। রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা মঞ্চনাটক। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

জলী, হোসেন আরা। বাংলাদেশের নাটক: বিষয়চেতনা ১৯৪৭-১৯৮২। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনালয়, ২০১২।

জাকারিয়া, সাইমন। বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

জাহান, সৈয়দা খালেদা। বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা। পু.মু.। কোলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ।

দীন, সেলিম আল। মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

পারভিন, শাহনাজ। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নারীর অবদান। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

বাগচী, তপন। বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

বানু, নিলুফার (সম্পা.)। প্রসঙ্গ নাট্য এবং বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০০৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস, নরেন। প্রসঙ্গ: সাহিত্য-সংস্কৃতি। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

বিশ্বাস, সুকুমার। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (১৯৪৭-১৯৭১)। পু.মু.। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। ৪র্থ সং.। কলিকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৫।

মজুমদার, রামেন্দু (সম্পা.)। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬।

————। বিষয়: নাটক। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭।

————। বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ১৯৯৯।

————। বাংলা নাটক ও সেলিম আল দীনের নাটক। ঢাকা: নান্দনিক, ২০১২।

মজুমদার, সমীরণ (সম্পা.)। অ্যাবসার্ড নাটক। ২য় সং.। কলকাতা: অমৃত লোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৬।

মুরশিদ, খান সারওয়ার (সম্পা.)। সমকালীন বাংলা সাহিত্য। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

মুহম্মদ, ইউসুফ (সম্পা.)। অ্যালবাম : গণ আন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খণ্ড। চট্টগ্রাম: তোলপাড়, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ, আনু। বাংলাদেশের কোটিপতি মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। ঢাকা: চলন্তিকা বইঘর, ১৯৯২।

মোজাহার, সেলিম। স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮।

রহমান, আতাউর। নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

রহমান, লুৎফর। কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯।

রহমান, সাঈদ-উর (সম্পা.)। বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য (১৯৭২-৯৭)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

————। মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্য চিন্তা। ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

————। পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ব: প্রকাশনা, ১৯৮৩।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.)। স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

রোজী, অরাত্রিকা। বাংলাদেশের নাটক। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

শাইখ, আসকার ইবনে। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি। ঢাকা: সাতরং প্রকাশনী, ১৯৮৬।

সামাদী, সফিকুন্নবী ও অন্যান্য। সাহিত্য-গবেষণা বিষয় ও কৌশল। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১০।

সাহা, নৃপেন্দ্র (সম্পা.)। বাংলাদেশের থিয়েটার। কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ২০০২।

হক, মফিদুল ও অরুণ সেন (সম্পা.)। সাত সওদা। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

হক, মো: জাকিরুল। দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

হাবীব, হারুণ। মুক্তিযুদ্ধের দুই যুগ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

হায়দার, জিয়া। থিয়েটারের কথা (চতুর্থ খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

————। নাট্যকলার বিভিন্ন ইজম ও এপিক থিয়েটার। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

————। নাটক, তত্ত্ব ও শিল্পরূপ। ঢাকা: সোসাইটি ফর এডুকেশন ইন থিয়েটার, ১৯৯৭।

————। নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ। ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮১।

————। বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯১।

হারুণ, রশীদ। সেলিম আল দীনের নাট্য নির্দেশনা নন্দনভাষ্য ও শিল্পরীতি। ঢাকা: ইছামতি প্রকাশনী, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

হাসান, মঈদুল। মূলধারা '৭১। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯।

হুমায়ুন, রাজীব। নাটক রচনা: রূপ ও রীতি। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

হোসেন, মোবারক (সম্পা.)। একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৭৭-১৯৭৯)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬।

২.২. সহায়ক প্রবন্ধ

আজগর, সৈকত। "বাংলাদেশের নাটক (১৯৯১-৯৫)"। evsjv GKv‡Wgx cwÎKv, (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৫)।

আহমদ, আফসার। "ঢাকা থিয়েটারের নতুন নাটক চাকা"। মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পা., m›'ig, গ্রীষ্ম সংখ্যা ৫ম বর্ষ (মে-জুলাই, ১৯৯১)।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল । "থিয়েটার কী"। রামেন্দু মজুমদার সম্পা., w_‡qUvi bvU, অষ্টাদশ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা।

কামাল, বেগম আকতার। "সেলিম আল দীনের মঞ্চের ট্রিলজি: শিল্পদর্শনের তিন সূত্র"। সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা., DjLvMov, দশম সংখ্যা বর্ষা (আগস্ট, ২০০৮)।

খান, ফৌজিয়া। "যৈবতী কন্যার মন: দুই নামে দুই কায়া"। DjLvMov, দশম সংখ্যা বর্ষা (আগস্ট, ২০০৮)।

চৌধুরী, দর্শন। "তৃতীয় বিশ্বের থিয়েটার, থার্ড থিয়েটার এবং পথনাটক"। Abóc, ২য়-৩য় যুগ্ম সংখ্যা (২০০০)।

জলী, হোসনে আরা। "বাংলাদেশের নাটক: মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ"। Rvbvj Ae AvUm LÐ-1, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কলা অনুষদ, ঢাকা।সংখ্যা-১ (জানু-জুন-২০১১)

দীন, সেলিম আল। "বাঙলা নাট্য নির্দেশনা শিল্পরীতি: নাসির উদ্দীন ইউসুফ"। w_‡qUvi ÷vwWR, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম সংখ্যা (জুন ২০০০)।

প্রামানিক, মো: আব্দুল হালিম। "কৃতমূলক পাঁচালি গাজীর গান: আঙ্গিক ও পরিবেশনা রীতি"। প্রফেসর মো: হারুণ-অর-রশীদ সম্পা., mvwnwZ¨Kx, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৪৩ (জুন, ২০১৩)।

বাগচী, তপন। "সেলিম আল দীনের গবেষণাসত্তা"। হাসান শাহরিয়ার সম্পা., w_‡qUvi Iqvjv, দশম বর্ষ ১-২ যৌথ সংখ্যা (জানু-জুন, ২০০৮)।

রহমান, আতাউর। "বাংলাদেশে রবীন্দ্র নাট্যচর্চা"। শামসুজ্জামান খান সম্পা., gwmK DËivwaKvi, ঢাকা: বাংলা একাডেমী (বৈশাখ ১৪১৮)।

রহমান, মোঃ হাবিবুর। "লোকনাট্যের আসর: শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ভিন্ন মঞ্চ"। শামসুজ্জামান খান সম্পা., evsjv GKv‡Wgx cwÎKv, ৫৪ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-ডিসে., ২০১০)।

রহমান, লুৎফর। "বাঙলার লোকনাট্য সঙ"। সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ সম্পা., evsjv GKv‡Wgx cwÎKv, ৫১ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা (জানু-জুন, ২০০৭)।

————। "এথনিক থিয়েটার; একটি মারমা রূপকথা"। bvU¨Kjv, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (জানু-মার্চ, ১৯৯০)।

রহমান, সাইদুর। "শহর কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় লোকনাট্যরীতি"। w_‡qUvi Iqvjv, সপ্তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন, ২০০৫)।

শাহীন, ইস্রাফিল। "বাংলাদেশের পথনাটক"। ce cwðg প্রথম বষ প্রথম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০০০)।

সেন, অরুণ। "সেলিম আল দীন: নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র"। রামেন্দ্র মজুমদার সম্পা. 'B evsjvi w_‡qUvi, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা (২০০০)।

হাসান, অনুপম। "সেলিম আল দীন এর নাটকে প্রান্তিক মানুষ ও সমাজ জীবন"। হাসান শাহরিয়ার সম্পা., w_‡qUvi lqvjv, দশম বর্ষ: ১-২ যৌথ সংখ্যা (জানু-জুন, ২০০৮)।

২.৩. সহায়ক অভিধান ও কোষগ্রন্থ

আশফাক-উল-আলম ও অন্যান্য সম্পা.। evsjv GKv‡Wgx †jLK Awfavb। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

ইসলাম, সিরাজুল সম্পা.। evsjwcwWqv। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩।

চৌধুরী, কবীর। mwnZ¨‡Kvl। ৪র্থ পরিবর্ধিত সং.। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

চৌধুরী, জামিল সংক. ও সম্পা.। evsjv evbvb-Awfavb। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪।

বাংলা একাডেমী। evsjv‡'‡ki †jLK cwiwPwZ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

রহমান, মনজুরুর সম্পা. ও মোহাম্মদ মতিওর রহমান সঙ্ক.। ৩য় মু.। evsjv GKv‡Wgx HwZnvwmK Awfavb। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪।

হক, মুহম্মদ এনামুল সম্পা.। evsjv GKv‡Wgx e¨envwiK evsjv Awfavb। ১২শ পু. মু.। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০।